ঘি
রক্তচাপাধিক্য
ও
হৃদরোগ
ড: শচীন্দ্র নাথ সাহানা
T. MUKHERJI

রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগ

১৩৭২ সালে রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্ত

ডঃ শচীন্দ্রনাথ সাহানা
এম. বি. বি. এস., পি-এইচ. ডি.

নিবেদিতা পাবলিশার্স
৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

নিবেদিতা পাবলিশার্স
৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯-এর পক্ষে
শ্রীমতি লীলা সাহানা কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম সংস্করণ ৯ই পৌষ ১৩৯২
ইং ২৫-১২-৮৫

পরিবেশনায় :
(১) নিউ বুক স্টল
৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯
(২) পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৯

চিত্র কলায়
শ্রীতপন মুখার্জী
চিরন্তনী পাড়া
হাওড়া-৯

মূল্য : ২৫·০০ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩/ডি মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

প্রয়াত পিতামাতাকে স্মরণ-মনন ক'রে তাঁদের
উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করিলাম।

পুস্তক পরিচিতি

'রক্ত চাপাধিক্য ও হৃদরোগ' মূলতঃ বাংলা ভাষায় মানব দেহে রক্ত চলাচল তন্ত্রের শারীর সংস্থান ও শারীর বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনাকে ভিত্তি ক'রে কতকগুলি বিধ্বংসী হৃদরোগ যথা কার্ডিয়াক ইসকিমিয়া, অ্যানজাইনা পেকটোরিস, কার্ডিয়াক ইনফার্কসন, হার্ট ফেলিওর এবং রক্ত চাপাধিক্য রোগ সম্বন্ধে একটি সহজ সরল পুস্তক যা সকলেরই উপকারে লাগবে।

বইটিতে রক্ত চলাচল তন্ত্রের 'সে-কাল ও এ-কাল' সম্বন্ধে ধ্যান-ধারণা থেকে আরম্ভ করে হৃৎপিণ্ডের বিবর্তন, ভ্রূণতত্ত্ব ও কার্ডিভ্যাসকুলার সিস্টেমের যাবতীয় মূল বিষয় বস্তু সংক্ষেপে মাতৃ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে। কার্ডিয়াক ইসকিমিয়া, অ্যানজাইনা পেকটোরিস, কার্ডিয়াক ইনফার্কসন, হার্ট ফেলিওর প্রভৃতি বিষয়গুলি সাধারণ জ্ঞানের মানুষদের পাঠোপযোগী ও সহজ বোধ্য করা হয়েছে। ঐ ব্যাধিগুলির সাধারণ পরিচিতি, তথ্যানুসন্ধান, রোগ নির্ণয়, ঔষধ প্রয়োগ, ঔষধ মাত্রা, ঔষধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'য়েছে। রক্ত চাপাধিক্য সম্বন্ধে যতেষ্ঠ আলোকপাত করা হ'য়েছে এবং ঐ ভয়াবহ রোগগুলির সম্বন্ধে খাদ্য নির্বাচন, ব্যবহারিক জীবন যাত্রা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে যতেষ্ঠ আলোক পাত করা হ'য়েছে যা সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ ক'রে সমাজ বিজ্ঞানী, সমাজ সেবী, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, জীব বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী প্রভৃতি সকলেরই উপকারে লাগবে। আগ্রহী জনসাধারণ উক্ত ভয়াবহ রোগগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবাহাল হয়ে উপযুক্ত প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু বোঝার সুবিধার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে পরিভাষা থাকা সত্ত্বেও ইংরাজী নাম রাখা হয়েছে।

বেশ কিছু ছবি দেওয়া হয়েছে কিন্তু অবস্থার বিপাকে যথেষ্ট সংখ্যায় ছবি দেওয়া সম্ভব হয় নাই যার জন্য পাঠক-পাঠিকার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী।

সত্তর-পঁচাত্তর কোটি মানুষের ভারতে জন সংখ্যা অনুযায়ী চিকিৎসকের আনুপাতিক হার কম। এই কারণে বহু ব্যক্তি যারা শারীর সংস্থান ও শারীর বিজ্ঞান সম্বন্ধে পঠন-পাঠনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারেননি অথচ ব্যবহারিক চিকিৎসায় নিজ চেষ্টায় যোগ্যতা অর্জন ক'রে চিকিৎসকের পেশা গ্রহণ করেছেন এবং চিকিৎসকের পরিপূরক হিসাবে কাজ ক'রে চলেছেন এবং চাহিদার

বহুলাংশ পরিপূরকের স্থান গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য আমাদের ভাবনা চিন্তার অবকাশ রয়েছে এবং দেখতে হবে এদের কিভাবে শারীর সংস্থান ও শারীর বিজ্ঞানকে সামনে রেখে রোগের সঙ্গে শরীরের সম্পর্ক ও পরিবর্তন বিজ্ঞানের আলোকে আলোকিত ক'রে, বিজ্ঞানকে জন সেবায় নিযুক্ত করা যায়। বহু সেবক-সেবিকা এবং বিভিন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের শাখা প্রশাখায় যে সমস্ত প্যারামেডিকেল কর্মীবৃন্দ নিযুক্ত রয়েছেন অথচ অল্প কিছু বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ ছাড়া শারীর সংস্থান ও শারীর বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রয়েছেন তাঁদের পেশাগত যান্ত্রিক কর্মঅভ্যাসকে জ্ঞানের আলোকে সুদীপ্ত করার একান্ত প্রয়োজন যা এনে দেবে তাঁদের মানসিক তৃপ্তি এবং আরও এনে দেবে উন্নতমানের সেবা। এই কথা মনে রেখে বিচ্ছিন্নভাবে হ'লেও বিজ্ঞানকে তাঁদের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি কতকগুলি রোগের আলোচনাকে সামনে রেখে।

বিবিধ প্রকার রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা, অর্থ নৈতিক দৈন্যতার জন্য, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। এমত অবস্থায় নিজে নিজে রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা পঠন-পাঠনের মাধ্যমে গড়ে তুলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। আজকের দুনিয়ায় যে রোগটি (করনারী হার্ট ডিজিজ) সারা পৃথিবীতে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে তার জন্য জনসাধারণকে ঐ রোগ সম্বন্ধে সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ও নিজে নিজের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য আমি এই পুস্তকটি রচনা করেছি। আমার চেষ্টা ফলবতী হ'লে আমি সুখী হ'তে পারব।

ইতি—

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সাহানা

সূচীপত্র

রক্ত চাপাধিক্য ও হৃদরোগ

(প্রতিকার ও প্রতিরোধ)

প্রাক কথন ঃ

সকালে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় আমার বহুদিনের এক বন্ধু, হরিপদ (হালদার), আমার সামনের চেয়ারে এসে বসল। বললাম—কি খবর, কেমন আছ ? দু-একটা কথা আদান প্রদানের পর, হরিপদ বলল—আরে শুনেছ—অনিল সরকার, যে আমাদের সঙ্গে পড়ত, সে কয়েক দিন আগে হার্ট ফেল ক'রে মারা গেছে। আগে থাকতেই ব্লাড প্রেসারে ভুগত—কিছুই কেয়ার করেনি, তারপর হঠাৎ শুনি, হার্ট ফেল ক'রে মারা গেছে। খবরের কাগজ খুললেই রোজই দেখতে পাচ্ছি, কোন-না-কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি হার্ট অ্যাটাক হ'য়ে মারা গেছেন। নিজেও তাই ভয় খেয়ে যাচ্ছি।

কথাবার্তা চলছে এমন সময় খবরের কাগজটা (আনন্দবাজার পত্রিকা) একটি ছেলে টেবিলে দিয়ে গেল। বন্ধু হরিপদ কাগজটা নিয়ে চোখ বুলিয়েই যেন আঁতকে উঠলেন, বললেন, ডাক্তার এই দেখ—সি. পি. এম-এর সংসদ দলনেতা ডঃ শরদীশ রায় হার্ট অ্যাটাক হ'য়ে বেশ কয়েক দিন হাঁসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। ব্যাপারটা কি কিছুই বুঝছি না—শুধু ভয় খেয়ে যাচ্ছি।

ডাক্তারী পেশায় নিযুক্ত রয়েছি দীর্ঘ দিন ধরে। চোখের সামনে অনেকেরই মৃত্যু হতে দেখেছি, মৃত্যুর কথা শুনতে শুনতে যেন পাষাণ হয়ে গেছি কিন্তু শরদীশ বাবুর মৃত্যু সংবাদ কাগজে দেখে সত্যই খুব আঘাত পেলাম। একটা অমূল্য প্রাণ চলে গেল। ডাক্তারদের সামনেই তাঁর মৃত্যু ঘটল অথচ আমরা, ডাক্তাররা কিছুই করতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম—হার্ট অ্যাটাক হ'লে চিকিৎসা বোধ হয় কিছুই করার থাকে না—যারা বাঁচে আপনিই বাঁচে। এই অক্ষমতার আঘাত খুবই মর্ম পীড়া দিচ্ছিল। দুঃখের বিষয় আজও এমন কিছু আমরা আবিষ্কার করতে পারিনি যা দিয়ে এই মুমূর্ষু রোগীদের অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচান যেতে পারে। তবে বিজ্ঞান আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে

যার সাহায্যে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আগে আমরা হার্টের অবস্থা সঠিক নির্ণয় করে কিছু কিছু ব্যবস্থা নিতে পারছি, যেমন হার্টের বাইপাশ অপারেশন, রুগ্ন ভালবের পরিবর্তন, পেটেন্ট ফোরামেন ওভেলের সংশোধন, সংকুচিত ভালবের অপারেশন প্রভৃতি রোগের অনেকটা কিনারা করতে সক্ষম হচ্ছি এবং বহু লোককে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে।

পৃথিবীতে প্রতি বৎসর নানা রোগে ভুগে পাঁচ কোটী লোক মারা যায়।[১] পশ্চিমী দেশগুলিতে অকাল মৃত্যুর পঞ্চাশ ভাগ লোক[২] কার্ডিওভ্যাসকুলার রোগে আক্রান্ত হ'য়ে মারা যায় এবং এই পঞ্চাশ ভাগের মধ্যে ১০-২০ ভাগ লোক সরাসরি হাইপার টেনসনে বা হাইপার টেনসনের উপসর্গে মারা যায় ও ২৫ ভাগ লোক ইসকিমিক হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। হাইপারটেনসনের বিষম প্রতিক্রিয়া করনারী, রেনাল ও মস্তিষ্ক ধমনীর উপর প্রতিফলিত হয় এবং হৃৎপিণ্ড নিজেও রোগগ্রস্থ হ'য়ে পড়ে এবং এই কারণেই ঐ বিরাট সংখ্যক লোক এই ব্যাধিতে অকাল মৃত্যুর কবলে পতিত হয়।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমরা, ডাক্তাররা, যতটুকু সম্ভব এই রোগ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য জন সমাজে তুলে ধরে তাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে এই রোগের ক্ষতিকারক দিকটি উন্মোচন করতে সক্ষম হ'তে পারি। রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা, রোগ প্রতিরোধে একটি কার্য্যকরী হাতিয়ার।

হরিপদ : আচ্ছা ব্যাপারটা কি? অ্যাটাক হ'লেই বেশির ভাগ লোকই মারা যায়—হাঁসপাতালে থাকতে থাকতেই মারা যায়। রোগটা একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। ভাই ডাক্তার, এই বিষয়ে খবরের কাগজে কিছু লেখ না—অনেকই উপকৃত হ'তে পারবে।

ডাক্তার : নিজেই বুঝতে পারি না—তা তোমায় বোঝাব কি? অনেক দিন ধরে হার্টের রোগী চিকিৎসা করে আসছি—নিজেরই একটা অ্যাটাক হয়ে গেল—বেঁচে গেছি কোন রকমে। এই সমস্ত হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে কি হয় বুঝি, কি ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে তাও জানা আছে—প্রয়োগ করাও হয় কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় না। চিকিৎসা জগতে চিকিৎসকদের কাছে এর থেকে দুঃখের আর কি হতে পারে? যে-টুকু আমরা জানি তা বোধ হয় সম্পূর্ণ নয়,

---

১। WHO Technical report Series, 632, Geneva, 1979

২। D. G. Julion, Cardiology, Fourth edition, 1980, English Language Book Society and Baillary Tindell, London.

যা-করি সেটাও বোধ হয় সব নয়। আরও কিছু জানার আছে এবং এই জানার জন্য আরও ব্যাপক ভাবে গবেষণার দরকার।

আমাদের শরীরটা কেমন—যদি জানতে চাও দেখবে, এটা একটি অতি উচ্চমানের স্বয়ংক্রিয় সমবায়ী প্রতিষ্ঠান। কাজ সব ভাগ করে দেওয়া আছে, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্বন্ধযুক্ত, একের বিচ্যুতি অন্যের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সব অঙ্গগুলি মিলে মিশে এমন ভাবে কাজ করে যার তুলনা নাই। মনুষ্যসৃষ্ট কোন কিছুই এর ধারে কাছে আসতে পারে না। সমস্ত অঙ্গগুলির মিলিত প্রয়াসের একমাত্র লক্ষ্য হল—শরীরটাকে সুস্থ, সবল ও সচল রাখা।

হার্ট, ব্রেন, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, অন্তর্মুখী গ্রন্থিগুলি, খাদ্য ও পুষ্টি নালী প্রভৃতি আমাদের প্রধান অঙ্গ। এদের মধ্যে হার্ট রক্ত পরিবেশনের মাধ্যমে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ ক'রে অন্য সমস্ত অঙ্গগুলিকে সক্রিয় রাখে। তাই আমাদের শরীররূপ সমবায় প্রতিষ্ঠানে হার্টের ভূমিকা মুখ্য। হার্ট খারাপ হয়ে গেলে অন্য সমস্ত অঙ্গেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে যায়। হার্ট অত্যন্ত কর্মনিপুণ অঙ্গ, হঠাৎ করে কদাচিৎ বিকল হয়ে যায়। ক্রমাগত অত্যন্ত বিরূপ অবস্থায় কাজ করতে করতে তবেই অপারক হয়ে পড়ে অর্থাৎ হার্ট ফেলিওর শুরু হয়ে যায়।

এই মুখ্য অঙ্গটির উপর যে গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত আছে সেই দায়িত্ব পালনে হার্ট নিষ্ঠা সহকারে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করে যায়। আর এই কাজ করার জন্য হার্টেরও পুষ্টি ও অক্সিজেন একান্ত দরকার। স্নেহময়ী জননীর মত অন্য সব অঙ্গকে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করার পর নিজের খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে। এইখানে তোমার একটু বোঝার অসুবিধা হতে পারে। আমি তোমায় বোঝাবার চেষ্টা করছি :

একটা সাধারণ কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে, তোমার নিজের পালস্‌টা অনুভব করলে। হার্টের সংকোচনের সাথে সাথে ধমনীর যে স্ফীতি হয় তাকেই আমরা পালস্‌ বলি। হার্টের সংকোচনকে আমাদের ডাক্তারী মতে সিস্টোল (systole) বলা হয়। হার্ট এই সিস্টোলের মাধ্যমে রক্ত সঞ্চালন করিয়ে শরীরের অন্য সমস্ত টিসুকে খাদ্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে থাকে। দুটো পাল্‌সের মধ্যে যে সময়টা সেই সময়ে হার্ট বিশ্রাম করে—হার্টের এই বিশ্রামের সময়টাকে ডায়াস্টোল বলা হয়। এই ডায়াস্টোলের সময়ই হার্ট তার নিজস্ব ধমনীর (করনারী ধমনী) মাধ্যমে খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করে থাকে।

সিস্টোলের সময় অন্য সব টিস্যুকে আগে খাইয়ে পরে ডায়াস্টোলের সময় নিজে খায় তাই হার্টকে স্নেহময়ী জননীর সঙ্গে তুলনা করলাম। আশা করছি এখন পর্য্যন্ত যা বললাম তা নিশ্চয়ই বুঝেছ।

হরিপদ : কিছু কিছু বুঝলাম ঠিকই কিন্তু হার্ট নামক অঙ্গটি মাঝে মাঝে বিনা নোটিশে যে একেবারে বিগড়ে যায় তার ত কোন প্রতিকার তোমরা আজ-পর্য্যন্ত কিছু বার করতে পারলে না—আমরা তোমাদের দিকে তাকিয়ে থাকি বাঁচার তাগিদে কিন্তু তোমরা ভরসা দিতে না পারলে আমরা যাই কোথায়!

ডাক্তার : দেখ কোন কোন ক্ষেত্রে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হতে পারে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আপাত দৃষ্টিতে হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হয়েছে মনে হলেও এটা ঠিক যে ধারাবাহিক চাপের মধ্যে কাজ করতে করতে তবেই হার্ট বিগড়ে যায়। সব ঠিক ঠিক চললে হার্টের কর্মশক্তি ও কর্ম পরিমিতি খুবই বিশাল।

আমাদের জানা আছে[১] প্রতি সঙ্কোচনে হার্ট ৭০ মিলি লিটার রক্ত নিক্ষেপ করে থাকে, তা হলে যদি কোন লোক ৭০ বৎসর বাঁচে—জন্ম থেকে ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হার্ট ১,৫০,০০০ টন রক্ত নিক্ষেপ করে থাকে, আর এই সময়ের মধ্যে হার্ট কতটা কাজ করে তার পরিমাপ যদি করি—আমরা দেখতে পাব ১০ টন ওজনের কোন বস্তুকে ১০ মাইল উর্দ্ধে বহে নিয়ে যেতে যতটা খাটতে হয় ততটা কাজই হার্ট এই সময়ের মধ্যে করে থাকে। এটাও জানা আছে একজন ভারতীয়ের গড় জীবন সীমার মধ্যে হার্ট ১,৯১,২১,৮৪০০০ বার সঙ্কোচন প্রসারণ করে থাকে। এ-থেকেই বোঝা যায় হার্টের কি অসাধারণ কর্মশক্তি। কিন্তু এই অসাধারণ কর্মশক্তি হার্ট কেমন ক'রে পেয়ে থাকে, কোথা থেকে পেয়ে থাকে বা এই শক্তির উৎস কি, কোন পথ দিয়ে এই শক্তির যোগান পেয়ে থাকে এই সমস্ত ব্যাপার সাধারণের জানার পক্ষে অসাধারণ ব্যাপার। তবে তোমাদের মত শিক্ষিত লোক একটু চেষ্টা করে জানতে চাইলে, কষ্ট সাধ্য হলেও অসম্ভব নয়।

একারণে এই রোগকে বুঝতে হ'লে রক্ত চলাচল তন্ত্রের গোড়ার কথা যথা অ্যানাটমি, ফিজিওলজি যতটা সম্ভব জানতে হবে। অ্যানাটমি ফিজিওলজি জানা থাকলে এই রোগের বিকার তত্ত্ব (Pathology) জানতে অসুবিধা হবে না এবং এই রোগের গুরুত্ব সহজভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

১। চক্রবর্তী ঘোষ সাহানা, হিউম্যান ফিজিওলজি, দ্বিতীয় সংস্করণ, নিউ বুক স্টল, কলিকাতা, ১৯৮৪।

হার্টের এত কর্মশক্তি থাকা সত্ত্বেও হাইপারটেনসন, অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস, আর্টারিওস্ক্লেরোসিস প্রভৃতি রোগে নানান প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করতে করতে হার্ট কর্ম ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে যার ফলে বাম নিলয়ের হাইপারট্রফি (বড় হয়ে যাওয়া) ইস্‌কিমিয়া (নিজ শরীরে অংশ বিশেষে রক্ত স্বল্পতা), ইনফার্কসন (অংশ বিশেষ শুকিয়ে যাওয়া), করনারী থ্রমবোসিস (করনারী ধমনীতে রক্ত জমে যাওয়া) ও হার্ট ফেলিওর প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কিড্‌নি (বৃক্ক), ব্রেন (ঘিলু) প্রভৃতি অঙ্গগুলি হাইপারটেনসনের ধাক্কায় হৃদরোগের সঙ্গে সঙ্গে নানা ভাবে কাবু হয়ে পড়ে যা আমরা পরে জানতে পারব।

সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছু কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি ঐ রোগগুলির নাম শুনেছেন, পরিণতি দেখেছেন, আতঙ্কিত হয়েছেন বা হচ্ছেন কিন্তু বেশির ভাগ লোকই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং একটা কল্পিত ভয় ছাড়া তাদের চিন্তা করার কিছুই থাকে না।

হাইপারটেনসন (রক্ত চাপাধিক্য) কেন হয়, এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া কি, লবণ ও খাদ্যের ভূমিকা, বর্জনীয় খাদ্য, প্রতিরোধ ব্যবস্থা, জীবন ধারায় করনীয় আচার আচরণ কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়, প্রতিকার আমরা কতটা করতে পারি এই সমস্ত বিষয় চিকিৎসকরা জানেন, কিছু কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি কিছু কিছু বোঝেন, কিন্তু বেশির ভাগ সমাজের লোক কিছুই জানেন না। এই রোগের প্রকোপ যে-ভাবে আমাদের দেশেও বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয় আমাদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে ঐ প্রাণঘাতী রোগের সম্বন্ধে কিছু তথ্য সহজ, সরল মাতৃভাষায় পরিবেশন করা দরকার।

হরিপদ : ভাই ডাক্তার, খবরের কাগজে এই বিষয়ে কিছু লেখ না ? অন্তত মানুষ অনেকটা সাবধান হ'তে পারবে। আচ্ছা ভাই, একটু কাজ আছে। আজ উঠি, পরে আবার দেখা হবে। একটু কিছু লেখ ? কেমন, আজ আসছি —বলে বন্ধু হরিপদ চলে গেল।

হরিপদ চলে যাওয়ার পর, মনে মনে ভাবতে লাগলাম, সাধারণ মানুষের ঐ রোগগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু জানার দরকার নাই কিন্তু তাদের শরীরের গঠন সম্বন্ধে, শারীরবৃত্ত সম্বন্ধে একটু কিছু জানা না থাকলে বিষয়বস্তুগুলি বোঝার অসুবিধা হবে। আবার চিকিৎসকদেরও যাতে কিছু উপকারে লাগে সেটাও দেখতে হবে।

বেশ কিছু দিনের চেষ্টায় লেখা শেষ হয়ে গেল এবং পুরোদস্তুর একটা বইই হয়ে গেল।

লেখা শেষ করার পর পুরো বিষয়বস্তুগুলি যখন পর্য্যালোচনা করে দেখি—রক্ত চলাচল তন্ত্রের (**circulatory system**) গোটা ফিজিওলজি লেখা হয়ে গেছে উপরন্তু রক্ত চাপাধিক্য, এর কারণ, প্রতিরোধ, প্রতিকার প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে। কার্ডিয়াক ইসকিমিয়া, অ্যানজাইনা পেকটোরিস, কার্ডিয়াক ইনফার্কসন ও হার্ট ফেলিওর সম্বন্ধেও বেশ কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

পুস্তকের বিষয় বস্তুগুলি কি বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী, অতি কর্মব্যস্ত চিকিৎসক, আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা, সমাজসেবী, সমাজ বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ সকলেরই বোধগম্য হবে ও উপকারে লাগবে এই আমার ধারণা।

উন্নত দেশে রক্তচাপাধিক্য রোগ ও এই রোগের উপসর্গ বহু জীবনের অকাল মৃত্যুর কারণ হয়ে রয়েছে এবং আমাদের দেশেও প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই রোগ বৃদ্ধির পথে চলেছে। ইংরাজীতে এই সম্বন্ধে অনেক বইই আছে। যারা আগ্রহী এবং যাদের ইংরাজী পড়া ও বোঝার সামর্থ আছে তাঁরা অনায়াসেই ঐসকল বিষয় সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারেন কিন্তু বাংলা ভাষায় এই রকমের পুস্তকের খুবই অভাব রয়েছে। এই অবস্থায় বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থে এই রোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু দিয়ে একটু কিছু ধ্যান-ধারণার জন্য তাদের মধ্যে প্রচার করার উদ্দেশ্য নিয়েই বাংলায় এই ছোট্ট পুস্তকটি রচনায় ব্রতী হয়েছি। যদি আমার এই প্রচেষ্টা সফল হয়, যাদের জন্য লিখেছি তাঁরা উপকৃত হন, আজকের বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশন ক'রে যদি তাঁদের সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি তবেই আমার চেষ্টা সফল হয়েছে জেনে আনন্দ উপভোগ করতে পারব।

আমার এই প্রচেষ্টায় যে মানুষটি, আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট, আমার এই বইটি রচনা করার জন্য যথেষ্ট প্রেরণা যুগিয়েছে সেই মানুষটির নাম শ্রীআভাস মজুমদার, সম্পাদক সাহিত্য বাণী। আমি তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, হাওড়া শাখার সভাপতি, ডাঃ প্রসাদ বন্দোপাধ্যায় বিভিন্ন ভাবে আমায় সাহায্য করেছেন যার জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। শ্রীধ্রুব বিকাশ দাস, শ্রীঅমূল্য ভূষণ পাল, অধ্যাপক অরুণ ঘোষ, অধ্যাপক ধ্রুব মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক তপেন মৌলিক (বি. ই. কলেজ), এঁরা সকলেই নানান ভাবে আমায় এই পুস্তক রচনায় উৎসাহ প্রদান করেছেন যার জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার বন্ধু শ্রীহরিপদ হালদারই আমায় এই বিষয়ে কিছু লেখার জন্য প্রেরণা জুগিয়েছিল তাঁর কথা স্মরণ না করলে তাঁর কাছে আমি চির অপরাধী থেকে যাব।

কিছু নীরস বৈজ্ঞানিক তথ্য রসগ্রাহী ব্যক্তি ছাড়া অন্যের পক্ষে সুখ পাঠ্য না হওয়াই স্বাভাবিক যার জন্য পাঠক-পাঠিকাদের উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। তবে সাধারণ বিষয়-বস্তুগুলি, বিশেষ ক'রে এই সমস্ত রোগের প্রতিরোধের বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি তাঁদের উপকারে লাগবে।

৯ই পৌষ ১৩৯২ (ইং ২৫-১২-৮৫) ইতি—লেখক।

রক্ত চলাচলের ধারণা সে-কাল ও এ-কাল

অতি প্রাচীন কাল থেকে অর্থাৎ প্রস্তর, লৌহ ও ব্রোঞ্জ যুগ থেকেই রক্ত চলাচল সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান-ধারণা না থাকলেও তখনকারের আদিম অধিবাসীরা হৃৎপিণ্ডের অবস্থান, স্পন্দন এবং এই স্পন্দনের সহিত জীবনের সম্পর্ক রয়েছে এ কথা বুঝত এবং এটাও বুঝত যে রক্ত বেশ গরম। সেকালে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, যুদ্ধ প্রায়
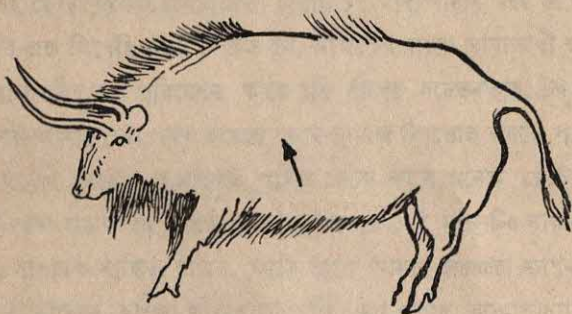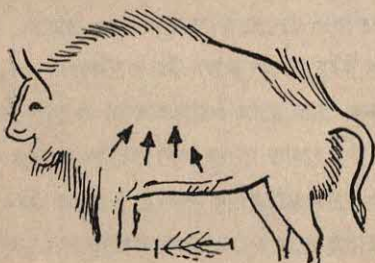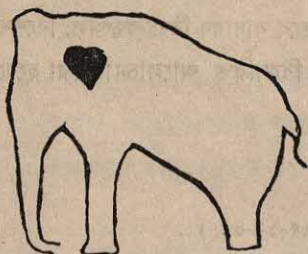
কতিপয় জন্তুর প্রধান অঙ্গের স্থান নির্দেশ।

লেগেই থাকত যার ফলে, ক্ষত-বিক্ষত রোগীর অবস্থা দেখার সুযোগ তাদের যথেষ্ট ছিল এবং ঐ সমস্ত রোগীদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করে তাদের এ-ধারণা ছিল যে জীবনের অস্তিত্ব রক্তের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

অ্যাজটেক্সরা জানত যে হৃৎপিণ্ডকে শরীরের বাহিরে নিয়ে এলেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেশ কিছুক্ষণ চলতে থাকে।

নে চিং (Nei Ching) নামে প্রখ্যাত চীনা পণ্ডিত বলেছিলেন পাল্‌সের স্ফীতি হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। তিনি একথাও বলেছিলেন যে বুকের উপরও হৃৎপিণ্ডের প্রভাব রয়েছে। তিনি আরও বলেছিলেন হৃৎপিণ্ড রক্তের আধার এবং পাল্‌সের স্ফীতি হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং মুখাবয়বের ভাবের পরিবর্তনের উপর হৃৎপিণ্ডের প্রভাব রয়েছে। তিনি একথাও বলেছিলেন রক্তের ধমনী হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত এবং হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও ধমনীর স্পন্দন সমকালীন যুগপৎ ঘটনা। এই থেকে মনে হয় তখনকার দিনে বিজ্ঞানসম্মত সঠিক ধারণা না থাকলেও রক্ত চলাচল সম্বন্ধে, হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে রক্তবাহের যোগাযোগ, রক্তের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক, পাল্‌সের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সম্পর্ক প্রভৃতি রক্ত চলাচল তন্ত্রের বিবিধ ঘটনা তৎকালীন চীন দেশীয় লোকেদের সম্যকভাবে না হলেও বিচ্ছিন্নভাবে জানা ছিল।
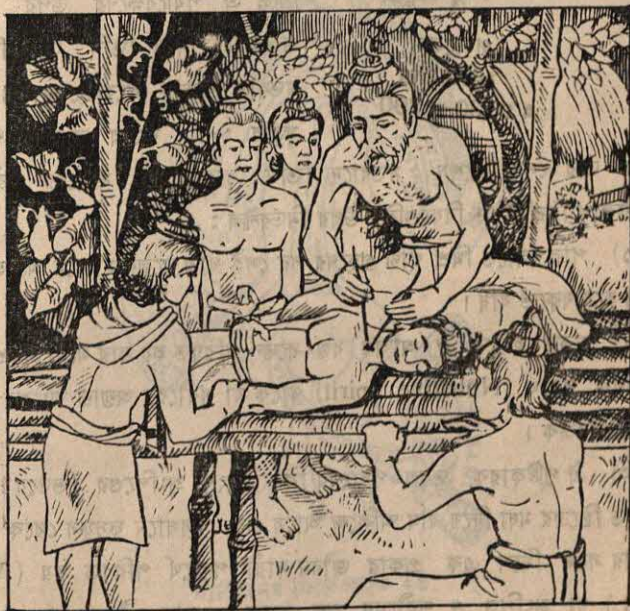
শিক্ষাদান রত শুশ্রুত

খৃষ্টপূর্ব ৬০০ সময়কালে বিখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসক ও **সার্জন শুশ্রুত** কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কব্জির উপর পাল্‌সের গুরুত্ব রোগ

নির্ণয়ে একটি বিশেষ হাতিয়ার একথা বলেছিলেন এবং পাল্‌সের সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের সম্বন্ধ রয়েছে এ ধারণাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

গ্যালেন
(GALEN)
A D130—200

খৃষ্টপূর্ব ৩০০-২৫০ সময়কালে অ্যালেকজেনড্রিয়ার শারীর বিশেষজ্ঞ **ইর‍্যাসিসট্রেটাসের** মতামত ছিল যে রক্তবাহের মধ্যে বায়ু থাকে এবং এই ধারণার মূল কারণ তিনি মৃত্যুর পরে রক্তবাহগুলি খালি থাকতে দেখেছিলেন।

খৃষ্টপূর্ব ২০০—১০০ সময়কালে বিখ্যাত গ্রীক চিকিৎসক **গ্যালেন** দেখিয়েছিলেন ধমনীর মধ্যে রক্ত থাকে কিন্তু ঐ পর্য্যবেক্ষণের উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে তিনি তাঁর নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন যা তাঁর মৃত্যুর ১০০০ বৎসর পর পর্য্যন্ত স্বীকৃত ছিল। তাঁর সেই বিশেষ মতবাদে তিনি বলেছিলেন মানুষের শরীরের ক্রিয়াকলাপ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল :

(১) পাকস্থলীতে মিশ্র খাদ্য গ্রহণের পর সেই খাদ্য নলের মাধ্যমে অন্ত্র হইতে আত্মস্থ হয়ে যকৃতে যায়।

(২) যকৃত হইতে ঐ আত্মস্থ বস্তু রক্তে পরিণত হয় যার মধ্যে একপ্রকার পুষ্টিকারক পদার্থ (Nutritive spirit) থাকে যা শরীরের অন্যান্য অংশের পুষ্টির জন্য অত্যাবশ্যক।

(৩) ঐ পুষ্টিকারক তরল পদার্থের কিছু অংশ হৃৎপিণ্ডের ভিতরে পর্দায় অবস্থিত ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বাম অলিন্দে আসে এবং সেখানে ফুসফুস থেকে আসা হাওয়ার সঙ্গে মিশে এক প্রকার জীবন দায়ী পদার্থে পরিণত হয় (Vital spirit) যা হৃৎপিণ্ড ও শরীরের অন্য সকল অংশের জীবন ধারনের জন্য অত্যাবশ্যক এবং এই পদার্থ ধমনীর মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য অংশে বাহিত হয়ে থাকে।

(৪) ঐ জীবন দায়ী পদার্থের (Vital spirit) কিছু অংশ কিত্রিফরম

আচ্ছাদনের ছিদ্র মধ্য দিয়া মগজে যায় সেখানে ঐ পদার্থ অ্যানিম্যাল স্পিরিটে রূপান্তরিত হয় যা শরীরের সমস্ত অংশের গতির (motion) জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং এই অ্যানিম্যাল স্পিরিট স্নায়ুর মাধ্যমে বন্টিত হয়।
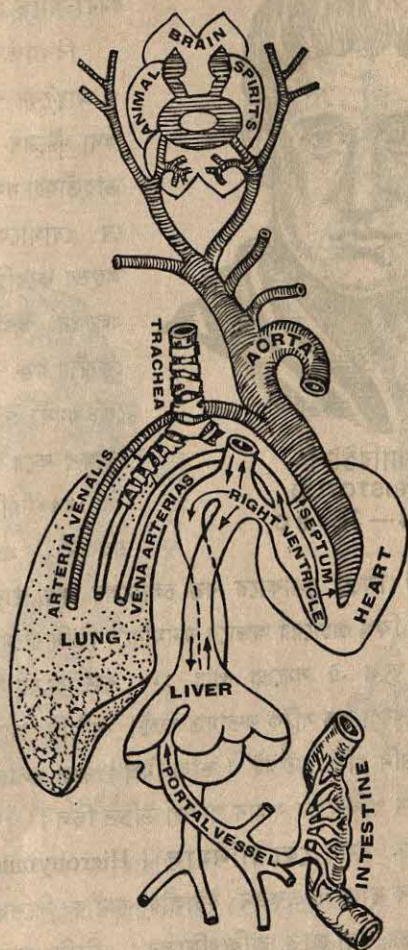
গ্যালেনের ফিজিওলজি তন্ত্র

খৃষ্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ সময়ে **অ্যারিসটটল** বলেছিলেন যে ভ্রূণ অবস্থায় মুরগীর হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হতে দেখা যায়।

১০০-২০০ এ. ডি. সময়ে ভারতীয় বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক **চড়ক** পাল্স

অনুভব করার পদ্ধতি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে পাল্‌সের সম্বন্ধে নানা তথ্য সকলকে অবহিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মনুষ্য দেহের মধ্যে ৭০০ ভেন ও ২০০ ধমনী আছে।

এ্যারিস্টটল
(ARISTOTLE)
384 — 322 B C

বিখ্যাত হিন্দু শাস্ত্র ভাগবতে ও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে রক্ত চলাচলের কথা উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতীয়রা ধমনী ও শিরার মধ্যে যে যোগাযোগ আছে একথা অনুভব করেছিলেন এবং তাঁরা বলতেন হৃৎপিণ্ড হল একটি কেন্দ্রীয় রক্ত নিক্ষেপকারী অঙ্গ যেটি ধমনী ও শিরার মধ্যে রক্ত নিক্ষেপ করে থাকে।

১৫৫০ এডি সময়কালে আর একজন প্রখ্যাত ভারতীয় চিকিৎসক **ভাবা মিশ্র** বৃত্তাকারে রক্ত চলাচলের কথা তাঁর লিখিত পুস্তকে উল্লেখ করেছিলেন কিন্তু প্রচারের অভাবে জনমানসে তিনি তেমন সাড়া জাগাতে পারেন নি যার ফলে ঐ সময়ের প্রায় ১০০ শত বৎসর পরে হার্ভের রক্ত চলাচল সম্বন্ধে গবেষণা লব্ধ সঠিক মতামত যতটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তাঁর বেলায় ততটা হয়নি যদিও তাঁরই (ভাবা মিশ্র) রক্ত চলাচল সম্বন্ধে সঠিক মতামতের জন্য প্রথম পথিকৃতের সম্মান পাওয়া উচিত ছিল।

১৫৩৭ এ. ডি. সময়ে **হেরোনিমাস** (Hieronymus Fabricius), ফ্যালোফিয়াসের এক ছাত্র ও একজন ইটালীয় শারীর বিশেষজ্ঞ, শিরার মধ্যে কপাটিকার উপস্থিতির কথা জ্ঞাত করিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন— কপাটিকাগুলি এমন ভাবে বিন্যস্ত থাকে যে রক্ত কেবল হৃৎপিণ্ডের দিকেই যেতে পারে আর ঐ রক্ত একবার উঠে গেলে আর ফিরে আসতে পারে না।

১৫৭৮-১৬৫৭ এ. ডি. এই সময়ে ফ্যালোফিয়াসের ইংরাজ ছাত্র **উইলিয়াম হারভে,** গ্যালনের উক্তি, যা তাঁর মৃত্যুর ১০০০ বৎসর পর পর্যন্ত প্রামাণ্য বলে সকলে মেনে নিতেন, তা ভুল বলে প্রমাণিত করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন

যে রক্ত শিরার মধ্য দিয়ে, হৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়ে শুধু একদিকেই ধাবমান থাকে কারণ এদের উভয়ের মধ্যে (শিরা ও হৃৎপিণ্ড) কপাটিকাগুলি একমুখী অর্থাৎ তারা শুধু একদিকেই রক্ত চলতে দেয়, একবার কপাটিকা পার হয়ে গেলে আর ফিরে আসতে পারে না।

উইলিয়াম হার্ভে
(WILLIAM HARVEY)
A D 1587 — 1657

হার্ভের ফিজিওলজি পরীক্ষা

ধমনীকে বেঁধে তিনি দেখিয়েছিলেন যে ঐ ধমনীর হৃৎপিণ্ডের দিকের অংশ ফুলে উঠছে এবং পরে শিরাকে বেঁধে দেখিয়েছিলেন যে শিরাটি হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিকে ফুলে উঠেছে। এই থেকে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে রক্ত শিরা দিয়ে হৃৎপিণ্ডে যায় এবং হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনীতে প্রবাহিত হয়।

হারভে হিসাব করে আরও বলেছিলেন—যে হৃৎপিণ্ড এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে একটা মানুষের ওজনের প্রায় তিনগুণ পরিমাণ রক্ত নিক্ষেপ করে থাকে। এত অল্প সময়ের মধ্যে এতটা পরিমাণ রক্ত কি করে তৈরি হতে পারে এটা তাঁর নিজেরই সন্দেহ জাগায় তিনি ধারণা করেছিলেন যে খুব সূক্ষ্ম সংযোগকারী

পথ রক্তকে ধমনী থেকে শিরায় নিয়ে যায় এবং এত সূক্ষ্ম এই সংযোগকারী পথগুলি যে আদৌ তাদের চোখে দেখা যায় না।

১৬২৮ সালে **ডি মটু কর্ডিস** (De Motu cordis et sanguines) **এট স্যানগুইনস**, যার বাংলা অর্থ হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও রক্তের গতি, নামক একটি ৭০ পাতার পুস্তক হল্যাণ্ডে ছাপিয়ে তাঁর গবেষণামূলক তথ্য প্রকাশ করেছিলেন। হারভে পাডুয়ায় অধ্যাপক ছিলেন এবং এর পর তিনি একজন বিজ্ঞানের মহান ব্যক্তি হিসাবে লণ্ডনে ফিরে আসেন এবং রক্ত চলাচলের আবিষ্কারক হিসাবে সম্মানিত হন। এই আবিষ্কারের পর রক্ত চলাচল সম্বন্ধে পূর্বের ধারণা সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় এবং বিজ্ঞানের এক নূতন দিগন্তের সূচনা হয়ে যায়।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে **ম্যালপিজি** (Malpighi) ভেকের ফুসফুসীয় ক্যাপিলারির মধ্যে রক্ত চলাচল নিয়ে কাজ করেন। ইবন-অল-নাফিস (Ibn-al-Nafis) ফুসফুসের মধ্যে রক্ত চলাচল নিয়ে কাজ করেন এবং মিগুয়েল সারভেট (Miguel servet) ফুসফুসের শারীরবৃত্ত নিয়ে কাজ করেন। বিশ্ববিখ্যাত অঙ্কন শিল্পী **লিওনার্ডো দা ভিন্সি** (Leonardo da Vinci) হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও রক্তের গতি অঙ্কন শিল্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

১৭৩৩ সালে **স্টিফেন হেল্স** (Stephen Hales) রক্তের চাপ মাপার জ্ঞান অধিগত করেছিলেন।

১৮২৮ সালে জিন এম পয়সিউলি (Jean M. poiseuille) রক্ত প্রবাহ সম্বন্ধে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

১৮৯৬ সালে রিভা-রকি (Riva-Rocci) রক্ত চাপ মাপার জন্য মারকারি স্ফিগমোম্যানোমিটার ব্যবহারের কথা বর্ণনা করেছিলেন।

এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে নূতন নূতন তথ্য আসা শুরু হয়ে যায়। **অ্যান্টনিয়ই এল লাভয়সিয়ার** (Antonei L. Lavoisier) শরীরে অক্সিজেনের ক্রিয়াকলাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর অল্প পরেই রবার্ট বয়েল (Robert Boyle) অক্সিজেনের বিবিধ ক্রিয়া কলাপ যথা শ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেনের গুরুত্ব, জ্বালানী হিসাবে প্রয়োগ ও ব্যবহার ও রক্তের সঙ্গে গতিবিধি প্রভৃতি বিষয়ে নানা দিক থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন।

ম্যাজেনডি (Magendie) রক্তই যে পুষ্টি বহন করে তা বুঝেছিলেন এবং ক্লড বার্ণাড (Claude Bernard) যিনি ম্যাজেনডিরই একজন ছাত্র ছিলেন ধমনী ও শিরার স্নায়ু সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। পরে, অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়ায় কাজেরও বহুবিধ সুযোগ সুবিধা সহজ লভ্য হয়েছিল।

লাডউইগ (Ludwig) তার কাইমোগ্রাফ ও স্ট্রুর যন্ত্রের সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকারিতার পরিমাপ ও রক্ত প্রবাহ সম্বন্ধে কাজ করেছিলেন।

করনেলি হেম্যানস (Corneille Heymans) স্নায়ুর ব্যারোসেপটর ও কেমোসেপটরের কার্য্যকারিতা বর্ণনা করেছিলেন।

অ্যাডলফট ফিক (Adolpt Fick) হৃৎপিণ্ডের রক্ত নিক্ষেপের পরিমাপ ও পরিমাণ (Cardiac output) সম্বন্ধে মূল তথ্য বর্ণনা করেছিলেন।

অগাসটাস ওয়েলার (Augustus Weller) ইলেকট্রোকার্ডিয়োগ্রাফী সম্বন্ধে তার ধারণা আই এম থোভেনের গ্যালভ্যানোমিটারের সাহায্যে প্রকাশ করেছিলেন এবং পরে **জেমস ম্যাকেনজি** (James Mackenzie) এবং **থোমাস লুইস** (Thomas Lews) ঐ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেছিলেন।

এডওয়ার্ড প্লাজার (Edward Pflugger) ও **যোশেফ বারকর্ফট** (Joseph Barcroft) বিস্তারিত ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছিলেন।

গ্যাসকেল (Gaskell) হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু বিষয়ে এবং হারম্যান স্টানিয়াস (Herman Stannius) হৃৎপিণ্ডে আকস্মিক শক্তি (Impulse) প্রবাহের

অনুক্রম (Sequence) ও ইহার ছন্দপূর্ণ স্পন্দন (Rhythmicity) বর্ণনা করেছিলেন।

বর্তমানে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে বহু তথ্য যান্ত্রিক উপায়ে জানা সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে, কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা হৃৎপিণ্ডের উপর অস্ত্রপ্রচারের সফলতায় প্রভূত সহায়ক হয়েছে তা হল **কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেসন** (Cardiac Catheterization), বহুদিন ধরে জন্তুর শিরার মধ্য দিয়ে ক্যাথিটার হৃৎপিণ্ডে পাঠান সম্ভব হয়েছে কিন্তু মাত্র ১৯২৯ সালে **ফরসম্যান** (Forssmann) সর্ব প্রথম মানুষের শিরার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ অলিন্দে ক্যাথিটার পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর নিজের পুরোবাহুর শিরার মধ্যদিয়ে ক্যাথিটার হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করিয়েছিলেন এবং তিনি যে কৃতকার্য্য হয়েছেন তা এক্সরে দ্বারা প্রমাণিতও করেছিলেন। ঐ সমসাময়িক কালে তাঁর এই কৃতিত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ১৯৪১ সালে **কোড়নানড** এবং **রেনজেস** (Cournand and Ranges) কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেসনের ব্যবহারিক উপযোগিতা সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য হাতে কলমে পরিবেশ করে-ছিলেন যা আজকে হৃৎপিণ্ড শল্য চিকিৎসকদের কাছে রোগ নিরাময়ে একটি প্রধান হাতিয়ার বলে প্রমাণিত হয়েছে।

মানুষের হৃৎপিণ্ড (Heart)

সাধারণ পরিচিতি (সংক্ষেপে) :

হৃৎপিণ্ড, রক্ত চলাচল তন্ত্রের পেশীগঠিত একটি ফাঁপা রক্ত নিক্ষেপক যন্ত্র (pump) যা বক্ষের মধ্যে অবস্থিত থেকে শরীরের সকল জায়গায় রক্ত সরবরাহ ক'রে সমস্ত কোষকে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে এবং দূষিত রক্তকে বিশুদ্ধ করণের জন্য ফুসফুসে পাঠায়।
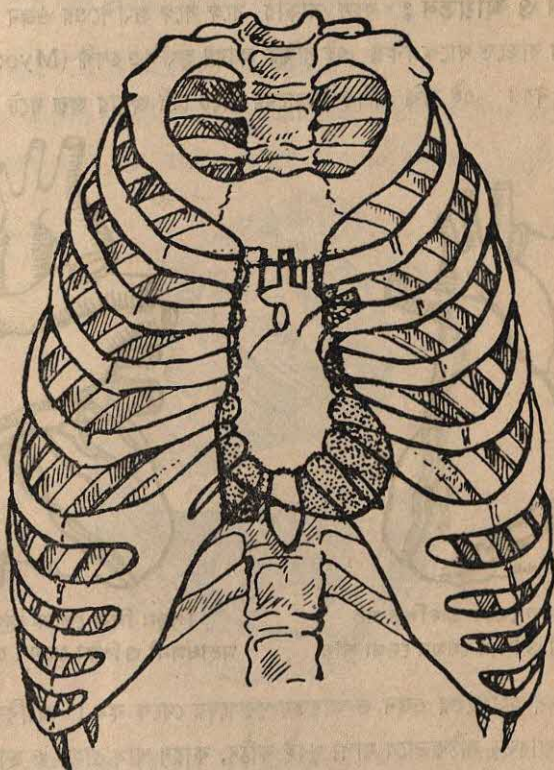
বক্ষীয় কাঠামোর মধ্যে হৃৎপিণ্ডের অবস্থান

আকার প্রকার : হৃৎপিণ্ড দেখতে কতকটা মোচার মত (conical)। এর একটি ভিত (base), একটি চূড়া (apex) ও তিনটি তল (surface) যথা সামনের তল (sternocostal surface), নিচের তল (Diaphragmatic

surface) ও বাম দিকের তল (left surface) আছে। বুকের আকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অবস্থানের জন্য হৃৎপিণ্ডের আকার ভিন্ন ভিন্ন রূপের হয়ে থাকে।

অবস্থান ঃ হৃৎপিণ্ড, বক্ষ গহ্বরে, দুই ফুসফুসের মাঝখানে, মধ্যম মিডায়স্টাইনামের মধ্যে পেরিকার্ডিয়াম দ্বারা আবৃত হয়ে তির্যকভাবে অবস্থিত থাকে; সামনের দিকে ঠিক স্টারনামের পশ্চাতে এবং সংলগ্ন পাঁজড়া-তরুনাস্থির আবরণে মধ্যরেখার দুই পাশে অসমান ভাবে অবস্থান ক'রে থাকে। হৃৎপিণ্ডের $\frac{2}{3}$ অংশ শরীরের মধ্যরেখার বাঁদিকে এবং $\frac{1}{3}$ অংশ মধ্যরেখার ডান দিকে থাকে।

ওজন ও আয়তন ঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ওজন ও আয়তন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে কিন্তু এই বৃদ্ধির কারণ হৃৎপিণ্ড পেশী (Myocardium) বৃদ্ধির জন্য নয়। এই বৃদ্ধি এপিকার্ডিয়ামের নিচে চর্বি জমার জন্য ঘটে থাকে।

সামনে দিক থেকে হৃৎপিণ্ড সহ মহাধমনী ও শিরা যেমন দেখা যায়
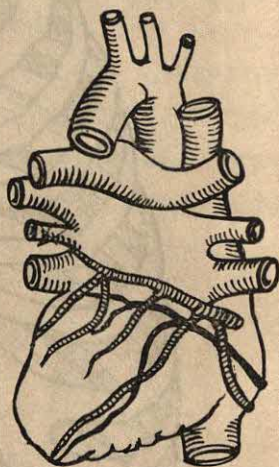
পিছন দিক থেকে হৃৎপিণ্ড সহ মহাধমনী ও শিরা যেমন দেখা যায়

মেয়েদের হৃৎপিণ্ডের ওজন ও আয়তন পুরুষদের থেকে কম। জীবিত অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের আয়তন সঠিকভাবে মাপা খুবই কঠিন, কারণ শ্বাস গ্রহণ ও ছাড়ার সময় হৃৎপিণ্ডের আকারের পরিবর্তন হতে দেখা যায়। সাধারণত সামনের দিক থেকে নেওয়া এক্সরে ছবির আয়তন মেপে হৃৎপিণ্ডের আয়তন ধরা হয়ে থাকে। আমাদের দেশের লোকের হৃৎপিণ্ডের আয়তন ও ওজনের উপর সুনির্দিষ্ট ও মৌলিক নথিভুক্ত কোন নিবন্ধ না থাকায় নিম্নে ইউরোপীয় দেশের লোকের ক্ষেত্রে, একজন প্রাপ্ত বয়স্কের যে পরিমাপ ও ওজন পাওয়া যায় তাহাই দেওয়া হইল:

আয়তন :

প্রস্থ (সব থেকে চওড়া যেখানটা)—৮-৯ সেন্টিমিটার
সামনে থেকে পিছন— ৬ „
উল্লম্ব বা উর্দ্ধাধঃ (বেস থেকে এপেক্স)—১২ „

ওজন :

প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের ক্ষেত্রে—২৮০—৩৪০ গ্রাম
প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে—২৩০—২৮০ „

হৃৎপিণ্ড প্রকোষ্ঠ ও প্রকোষ্ঠ প্রাচীর :

মানুষের হৃৎপিণ্ড চারিটি প্রকোষ্ঠে (chamber) বিভাজিত থাকে তাদের মধ্যে দুইটি রক্ত গ্রহণ করার জন্য যাদের অলিন্দ (atrium) বলা হয় যথা দক্ষিণ ও বাম
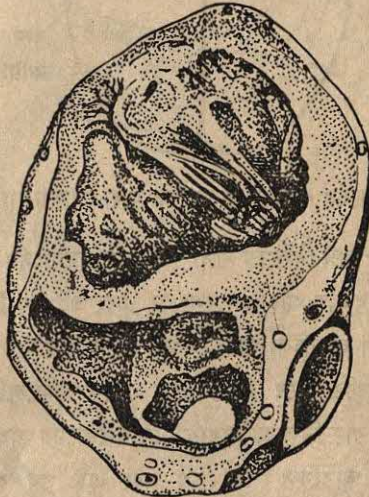
নিলদ্বয়ের প্রস্থচ্ছেদ

অলিন্দ এবং দুইটি রক্ত সরবরাহ করার জন্য যাদের নিলয় (ventricle) বলা হয় যথা দক্ষিণ নিলয় ও বাম নিলয়। দুইটি অলিন্দ, জন্মাবার পর থেকে, একটি দেওয়াল দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথক থাকে যাকে ইণ্টারঅ্যাট্রিয়েল সেপটাম বলা হয় এবং ইহা সংযোজক কলা দ্বারা গঠিত। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন এই ইণ্টার-অ্যাট্রিয়েল সেপটামে একটি ফুটো থাকে যাকে ফোরামেন ওভেল বলা হয় কিন্তু জন্মাবার পর এই ফুটোটি বন্ধ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে দুইটি নিলয়ও একটি দেওয়াল বা

পার্টিশান দ্বারা সম্পূর্ণ পৃথক করা থাকে। এই পার্টিশানকে ইনটারভেনট্রিকুলার সেপটাম বলা হয়। এই ইণ্টারভেনট্রিকুলার সেপটামের নিচের দিকের ৩/৪ অংশ হৃৎপিণ্ড পেশী দ্বারা গঠিত এবং উপরের ১/৪ অংশ সংযোজক কলা দ্বারা গঠিত। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ ইণ্টারঅ্যাট্রিয়াল ও ইণ্টারভেণ্ট্রিকুলার সেপটামের উভয় পার্শ্বই এণ্ডোথিলিয়াম দ্বারা আবৃত থাকে।
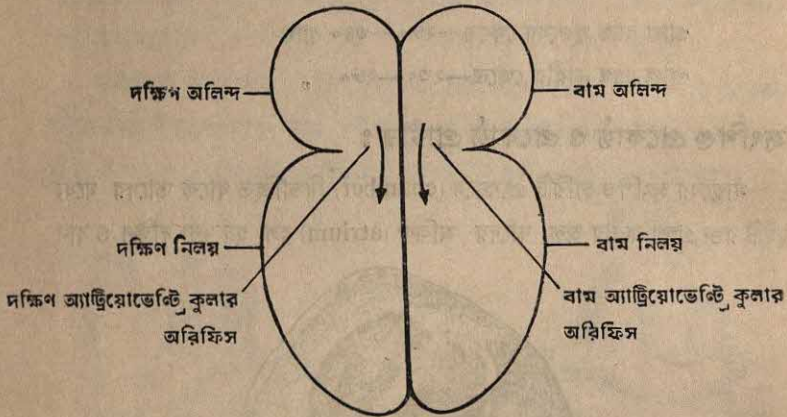
হৃৎপিণ্ডের প্রকোষ্ঠ ও তাদের মধ্যে যোগাযোগ

দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ের মধ্যে একটি যোগাযোগের পথ আছে যাকে দক্ষিণ অ্যাট্রিয়োভেণ্ট্রিকুলার অরিফিস বলা হয় এবং এই পথ ট্রাইকাসপিড ভালব অর্থাৎ তিনটি কাসপ বা কপাটিকা দ্বারা রক্ষিত থাকে যার মধ্য দিয়া রক্ত কেবল অলিন্দ থেকে নিলয়ে যেতে পারে কিন্তু নিলয় থেকে অলিন্দে আসতে পারে না। এইরূপ বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের মধ্যে যে যোগাযোগের পথ আছে তাকে বাম অ্যাট্রিয়োভেণ্ট্রিকুলার অরিফিস বলা হয় এবং এই পথ বাইকাসপিড (দুটি কপাটিকা) ভালব দ্বারা রক্ষিত থাকে। ডানদিকের মতই রক্ত বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে যেতে পারে কিন্তু বাম নিলয় থেকে বাম অলিন্দে যেতে পারে না।

দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয় হৃৎপিণ্ডের ভেনাস সাইড অর্থাৎ শরীরের যাবতীয় শিরার রক্ত ডান অলিন্দে আসে এবং সেই রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে যায় (দক্ষিণ অ্যাট্রিয়োভেণ্ট্রিকুলার অরিফিস দিয়ে) এবং দক্ষিণ নিলয় বিশুদ্ধ করণের জন্য সেই রক্তকে ফুসফুসে পাঠায়। ঐরকম বাম অলিন্দ বিশুদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে পাঠায় এবং বাম নিলয় মহাধমনীর মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র পাঠিয়ে দেয়।

হৃৎপিণ্ড অভ্যন্তরে রক্ত চলাচল

আগেই আমরা হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্ত কিভাবে ঘোরাফেরা করে তার বিষয় কিছু কিছু জেনেছি এখন সেই সম্বন্ধে আরও নির্দিষ্টভাবে কিছু আলোচনা করছি।

আমাদের শরীরের যাবতীয় দূষিত রক্ত উর্দ্ধ মহাশিরা (**Superior vena cava**) ও নিম্ন মহাশিরার (**Inferior vena cava**) মাধ্যমে এবং হৃৎপিণ্ডের নিজের শরীর থেকে দূষিত রক্ত করনারী সাইনাস, অ্যানটিরিয়র কার্ডিয়াক শিরা
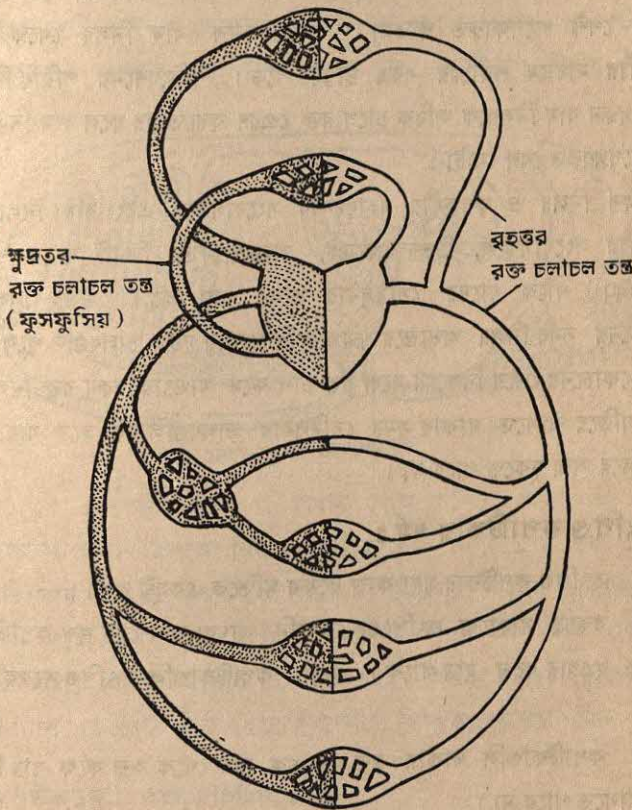
বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রক্তচলাচল

ও ভেনী কর্ডিস মিনিমির মাধ্যমে দক্ষিণ অলিন্দে এসে জমা হয়। সমভাবে ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত (**Oxygenated blood**) চারটি ফুসফুসীয় শিরার (দুটি বাম ও দুটি দক্ষিণ) মাধ্যমে বাম অলিন্দে আসে। রক্তে পূর্ণ হওয়ার পর দুটি অলিন্দ এক

সঙ্গে সংকোচিত হয় এবং রক্ত দক্ষিণ অলিন্দ থেকে দক্ষিণ অ্যাট্রিয়ো-ভেন্ট্রিকুলার অরিফিসের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ নিলয়ে এবং বাম অলিন্দ থেকে বাম অ্যাট্রিয়ো ভেনট্রিকুলার অরিফিসের মাধ্যমে বাম নিলয়ে যায়। নিলয় দুটি পরিপূর্ণ হওয়ার পর ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড ভালবগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং নিলয় দুটি যুগপৎ সংকোচনের দ্বারা রক্ত নিক্ষেপ করে। দক্ষিণ নিলয় থেকে ফুসফুসীয় মহাধমনী ও ধমনীর মাধ্যমে দুই ফুসফুসে বিশুদ্ধকরণের জন্য প্রেরিত হয়। অপেক্ষাকৃত কম চাপে এই রক্ত ফুসফুসে প্রেরিত হয়ে থাকে যার জন্য দক্ষিণ নিলয়ের পেশী অপেক্ষাকৃত পাতলা। অনুরূপভাবে বাম নিলয় থেকে রক্ত মহাধমনীর মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরিবেশনের পরিধি বিস্তৃত হওয়ার দরুন বাম নিলয়কে অধিক চাপে রক্ত প্রেরণ করতে হয় ফলে বাম নিলয়ের পেশী অপেক্ষাকৃত বেশ মোটা।

দক্ষিণ নিলয় ও ফুসফুসীয় মহাধমনীর সংযোগস্থলে এবং বাম নিলয় ও মহাধমনীর সংযোগস্থলে, উভয় ক্ষেত্রেই, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতির তিনটি ক'রে ভালব (কপাটিকা) থাকে যাদের সেমিলুনার ভালব বলা হয়। উভয় নিলয়ের সংকোচনের সময় নিলয় অভ্যন্তরে চাপ বেশি থাকার দরুন ভালবগুলি খুলে যায় এবং সংকোচনের শেষে নিলয়ের মধ্যে রক্ত চাপ কমে যাওয়ার দরুন রক্ত নিলয়ের দিকে গড়িয়ে আসতে থাকার সময় সেমিলুনার ভালবগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং রক্ত নিলয়ে আর ঢুকতে পারে না।

হৃৎপিণ্ড কপাটিকার ধর্ম :

(১) হৃৎপিণ্ড কপটিকার মুখ্য কাজ রক্তের গতিকে একমুখী রাখা।

(২) বকযন্ত্র সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের যে ধ্বনি আমরা শুনি সেই শব্দ কপাটিকা-গুলি বন্ধ হওয়ার দরুন হয়ে থাকে। অর্থাৎ কপাটিকাগুলি হৃৎপিণ্ড-শব্দের সৃষ্টি করে।

(৩) কপাটিকাগুলি থাকার জন্য রক্ত এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যায় কিন্তু ফিরে আসতে পারে না।

হৃৎপিণ্ডের বিবর্তন

বিবর্তনের পথে মাছ থেকে (মাছ, উভচর, রেপটাইল, পক্ষী ও ম্যামেল বা স্তন্যপায়ী) স্তন্যপায়ী জীবের হৃৎপিণ্ড যদি পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা যায় তাহলে

দেখতে পাওয়া যাবে—শরীরের গঠন ও প্রয়োজন অনুযায়ী হৃৎপিণ্ডের গঠনেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। নিম্নে মাছ থেকে স্তন্যপায়ী জীবের বিবর্তনের গতিপথে কি প্রকার পরিবর্তনের ক্রমবিকাশ দেখা যায় তা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল :

মাছ (Fish) :

মাছের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী রক্ত চলাচল অতি সাধারণ ও সরল পদ্ধতিতে সম্পাদন হয়ে থাকে এবং সেই কারণে হৃৎপিণ্ডের গঠনও খুবই সরল। এদের হৃৎপিণ্ডে একটি সাইনাস ভেনোসাস, একটি অলিন্দ (অ্যাট্রিয়াম) ও একটি নিলয় (ভেনট্রিকল) মাধ্যমে রক্ত হিপাটিক ও যুক্ত ক্যার্ডিন্যাল শিরার সাইনাস
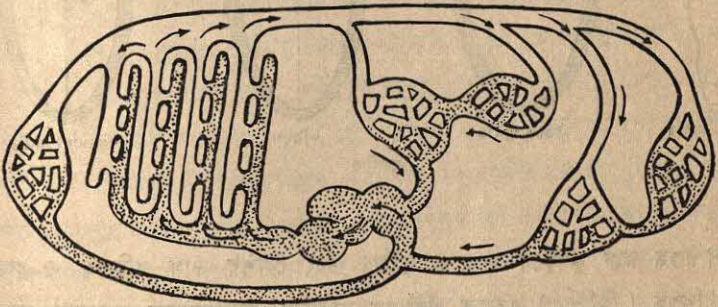
মাছের রক্ত চলাচল তন্ত্র

ভেনোসাসে এসে জমা হয় এবং সেখান থেকে অলিন্দে আসে এবং অলিন্দ সংকোচনের দ্বারা রক্তকে নিলয়ে পাঠায় এবং নিলয় সেই রক্ত কোনাস আর্টারিওসাস মাধ্যমে ফুলকোতে পাঠায়। ফুলকোর মাধ্যমে অক্সিজেন প্রাপ্ত হয়ে রক্ত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। শরীরে বিভিন্ন অংশ থেকে সেই রক্ত শিরার মাধ্যমে আবার অলিন্দে এসে জমা হয়। অতএব মাছের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড একটি পাম্প যার প্রধান কাজ রক্তকে ফুলকোতে বিশুদ্ধকরণের জন্য পাঠান।

ব্যাঙ (উভচর) Amphibian) :

ব্যাঙেদের উভচর প্রাণী বলা হয় কারণ এদের শৈশব জীবন জলের মধ্যে অতিবাহিত হয় এবং পরবর্তী জীবন স্থলে অতিবাহিত হয়। স্ত্রী ব্যাঙেরা ডিম ছাড়ার সময় পুনরায় জলে এসে ডিম ছেড়ে থাকে।

এদের হৃৎপিণ্ডে তিনটি গহ্বর থাকে—ছুটি অলিন্দ, ডান ও বাম, একটি নিলয়।

দূষিত রক্ত ভেনাকেভার মাধ্যমে ডান বা দক্ষিণ অলিন্দে আসে, ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত বাম অলিন্দে আসে। উভয় অলিন্দ থেকে যুগপৎ রক্ত একটি মাত্র নিলয়ে যায়। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে নিলয়ে অপরিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ দুই রকম রক্তই এসে জমা হয় এবং কিছুটা মিশ্রণ ঘটে থাকে। নিলয় বেশির ভাগ

হৃৎপিণ্ড
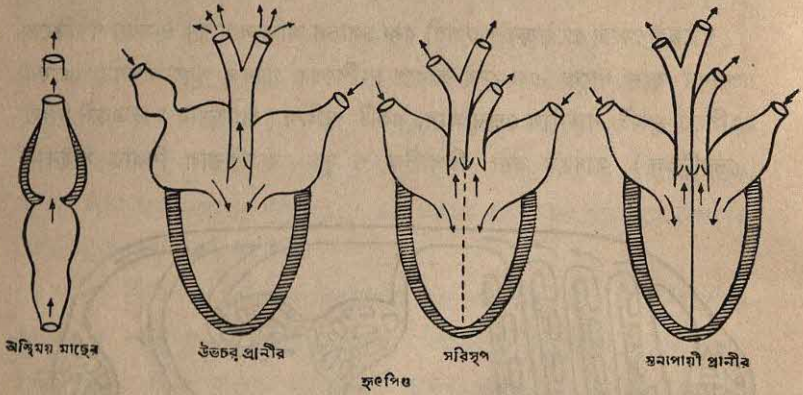
অপরিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসে ও ত্বকে পাঠায় এবং বেশির ভাগ পরিশুদ্ধ ও অল্প অপরিশুদ্ধ (মিশ্রিত) রক্তকে শরীরের যাবতীয় কলাসমুহকে সরবরাহ করে থাকে। কলাসমুহ থেকে অপরিশুদ্ধ রক্ত ভেনাক্যাভার মাধ্যমে দক্ষিণ অলিন্দে আবার ফিরে আসে। মহাধমনীর আরম্ভ ও ইহার বিভাজনের মধ্যবর্তী অংশকে বালবাস অ্যায়টি বলা হয় এবং এই বালবাস অ্যায়টির মধ্যে ঘোরান সিঁড়ির আকারের ভালব থাকে এবং এটা অনুমান করা হয় যে এই ভালব বা কপাটিকা পরিশুদ্ধ ও অপরিশুদ্ধ রক্তকে আংশিক ভাবে তফাৎ করে দেয়। অপরিশুদ্ধ রক্ত পালমনারী ধমনী দিয়ে ফুসফুসে যায় এবং অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ রক্ত কলাতান্ত্রিক ধমনীতে যায়।

সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী (Reptiles) :

বেশির ভাগ সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর, উভচরদের মত দুইটি অলিন্দ ও একটি নিলয় থাকে, কিন্তু তফাৎ হ'ল সরীসৃপদের নিলয় অসম্পূর্ণভাবে দুইটি অংশে, বাম ও দক্ষিণ ভাগে ভাগ হয়ে থাকে। যখন নিলয় সংকোচিত হয় অপরিশুদ্ধ কিছু রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে যায় এবং কিছু রক্ত বাম মহাধমনীর

মাধ্যমে ডরশ্যাল মহাধমনীতে যায়। বিশুদ্ধ রক্ত দক্ষিণ ধমনী চক্রের মাধ্যমে ডরশ্যাল মহাধমনীতে যায়। অতএব দেখা যাচ্ছে ডরশ্যাল মহাধমনীতে বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ রক্তের সংমিশ্রণ হয়ে থাকে।

কোন কোন সরীসৃপদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জন্তুদের মত চারিটি অংশে বিভক্ত থাকতে দেখা যায়, বাম ও দক্ষিণ অংশ সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকে এবং বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ রক্তের কোন সংমিশ্রণ হয় না।

পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জন্তু (Birds and Mammals) :

পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জন্তুদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডে চারটি গহ্বর থাকে, দুটি অলিন্দ—দক্ষিণ ও বাম, এবং দুটি নিলয়—দক্ষিণ ও বাম। এদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণভাবে দক্ষিণ ও বাম অর্দ্ধে ভাগ অবস্থায় থাকে এবং এই দুই অর্দ্ধের মধ্যে সরাসরি কোন যোগাযোগ থাকে না। শরীরের সমুদয় রক্ত ভেনাক্যাভার মাধ্যমে দক্ষিণ অলিন্দে এসে জমা হয় এবং সেখান থেকে দক্ষিণ অলিন্দ-নিলয় সংযোগ পথ দিয়ে দক্ষিণ নিলয়ে যায়। দক্ষিণ নিলয় ফুসফুসীয় মহাধমনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধকরণের জন্য ফুসফুসে পাঠিয়ে দেয়। ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে আসে এবং সেখান থেকে বাম অলিন্দ-নিলয় পথ দিয়ে বাম নিলয়ে যায়। বাম নিলয় সংকোচনের দ্বারা মহাধমনীর মাধ্যমে শরীরের সমস্ত কলাকে পুষ্টি ও অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে সরবরাহ করে থাকে।

হৃৎপিণ্ডের সংক্ষিপ্ত ভ্রূণতত্ত্ব

মুখবন্ধ :

পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা দেখা গেছে—১০০ জন নবজাতকের মধ্যে একটির ক্ষেত্রে কোন-না-কোন হৃৎপিণ্ডের জন্মগত ব্যাধি থাকে। এই আক্রান্ত শিশুদের মধ্যে প্রায় ৫০ ভাগ, যদি কোন চিকিৎসা করা না হয়, এক বৎসর বয়সের মধ্যে ঐ হৃদ্‌রোগেই মারা যায় কিংবা অন্য কোন জন্মগত রোগ যা হৃদ্‌রোগের সঙ্গেই থাকে তা থেকে মারা যায়। এদের মধ্যে যারা এক বৎসরের বেশি বাঁচে তাদের জীবন রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং যারা পাঁচ বৎসর বয়স থেকে প্রাপ্তবয়স্ক বয়স পর্য্যন্ত বাঁচে তাদের সংখ্যা প্রতি হাজারে মাত্র তিনজন। জন্মগত

হৃদরোগীদের মধ্যে আক্রান্ত রোগীরা চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ না হলে তাদের পক্ষে ৪০ বৎসর বয়সের বেশি বাঁচা সম্ভব নয়।

জন্মগত হৃদরোগ কি ধরণের দোষের জন্য হয়ে থাকে তা না জানলে চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। এবং এই বিষয় জানতে গেলে ভ্রূণ অবস্থায় হৃৎপিণ্ড কেমন করে গড়ে ওঠে তা জানার প্রয়োজন আছে। সেই কারণে নিম্নে ভ্রূণ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের গঠন প্রকৃতি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

ভ্রূণ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের গঠন

যেখানে হৃৎপিণ্ড গড়ে উঠবে সেই জায়গায় মেসোর্ডাম থেকে এণ্ডোথিলিয়াম কোষের উৎপত্তি হয় এবং শুরুতে এই এণ্ডোথিলিয়াম কোষগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে দুটি নলের বা টিউবের সৃষ্টি করে থাকে এবং এই টিউব দুটি পাশাপাশি সজ্জিত হয়ে থাকে। পরে প্রতিটি টিউব তাদের নিচের দিকে, আমবাইলিকেল ও ভাইটেলিন শিরা সংযুক্ত হয়ে যে প্রশস্ত শিরা আধার সৃষ্টি হয় (প্রিমিটিভ সাইনাস ভেনোসাস) তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। উপরের দিকে প্রতিটি টিউব ডরশ্যাল অ্যায়োটার সঙ্গে সংযুক্ত হতে দেখা যায়। তারপর ঐ দুটি টিউব উপরের দিক থেকে নিচের দিকে ক্রমশঃ একসঙ্গে জোড়া লেগে যায় এবং ঐ দুটি টিউব মিলিত হয়ে একটা টিউবের সৃষ্টি হয় যাকে **প্রিমিটিভ হৃৎপিণ্ড টিউব** বলা হয় (**Primitive heart tube**)।

এরপর ঐ প্রিমিটিভ হৃৎপিণ্ড টিউবটির বাহিরের দেওয়ালের উপর হৃৎপিণ্ড পেশী কোষের আবরণ (মায়োকার্ডিয়াম) দ্বারা পরিবৃত হয় এবং সাথে সাথেই কিছু কোষ পৃথক হয়ে মায়োকার্ডিয়ামের উপর একটি আবরণের সৃষ্টি করে যাকে **এপিকার্ডিয়াম** বলা হয়।

তারপর প্রিমিটিভ হৃৎপিণ্ড টিউবটি বাড়তে থাকে এবং জায়গার অভাবের দরুন ইংরাজী অক্ষর '**S**'-এর মত হয়ে যায়। তারপর চতুর্থ সপ্তাহ সময় বরাবর (ভ্রূণীয় জীবন) টিউবটির দু-পাশে সম-অন্তরালে খাঁজের আর্বিভাব হয় এবং টিউবটি পাঁচটি অংশে রূপান্তরিত পরস্পর সংযুক্ত একটি টিউবের আকার ধারণ করে। এই পাঁচটি অংশ নিচের দিক থেকে ভিন্ন নামে পরিচিত যথা—
(১) **সাইনাস ভেনোসাস** যার সঙ্গে পূর্বে উল্লিখিত শিরাগুলি সংযুক্ত থাকে.

(২) **যৌথ অলিন্দ,** (৩) **যৌথ নিলয়,** (৪) **বালবাস কর্ডিস** এবং (৫) **ট্রানকাস আর্টারিওসাস** যার সঙ্গে ডরশ্যাল অ্যায়োর্টা সংযুক্ত থাকে।

ভ্রূণীয় জীবন পাঁচ থেকে আট সপ্তাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় কারণ এ সময়েই যত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা হয়ে থাকে এবং এই সময়ে কোনরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি হ'লে ক্ষতিকারক জন্মগত হৃদ্‌রোগ হতে পারে। এই সময়ে যৌথ অলিন্দ ও যৌথ নিলয়ের ভিতরে পার্টিসান জন্মাতে দেখা যায় এবং সেই পার্টিসান সম্পূর্ণ হয়ে যৌথ অলিন্দ, বাম ও দক্ষিণ অলিন্দে বিভাজিত হয় এবং যৌথ নিলয়, বাম ও দক্ষিণ নিলয়ে বিভাজিত হয়। এর সাথে সাথেই দুইটি অলিন্দ, দুইটি নিলয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। এণ্ডোকার্ডিয়াল কুশন ও পার্টিসান দেওয়ালগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে উপরি উক্ত বিভাজন সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। ঐ এণ্ডোকার্ডিয়াল কুশণ থেকেই মাইট্রাল ও ট্রাইকাসপিড কপাটিকার সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটা ঘোরান সিঁড়ির মত পার্টিসান দেওয়াল বালবাস কর্ডিসের ভিতরে সৃষ্টি হয় এবং বালবাস কর্ডিস ফুসফুসীয় মহাধমনী ও মহাধমনীতে রূপান্তরিত হয়ে পরিবেশন নালী প্রবাহের সৃষ্টি হয়। ফুসফুসীয় মহাধমনী দক্ষিণ নিলয়ের সঙ্গে এবং মহাধমনী বাম নিলয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে।

আট সপ্তাহের শেষে হৃৎপিণ্ডের বাহির আকৃতি বেশ স্পষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রমশঃ জন্মের সময় পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট হতে থাকে। দক্ষিণ অলিন্দের শরীরের উপরের অংশ থেকে সুপিরিয়র ভেনাকেভা রক্ত নিয়ে আসতে থাকে এবং নিচের দিকে আমবাইলিকেল ও ভাইটেলিন শিরা যুক্ত হয়ে ইনফিরিয়র ভেনাকেভা হয়ে শরীরের নিচের অংশ থেকে রক্ত নিয়ে দক্ষিণ অলিন্দে ফেলে। সুপিরিয়র

ভেনাকেভা থেকে যে রক্ত আসে তা দক্ষিণ নিলয়ে চলে যায় (দক্ষিণ অলিন্দ-নিলয় পথ দিয়ে) এবং ফুসফুসীয় মহাধমনী ও ডাকটাস আর্টারিওসাস (যা ভ্রূণীয় জীবনে মহাধমনী চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে) দিয়ে নিম্নগামী অ্যায়োটায় চলে যায়। অল্প রক্ত (৫%) ফুসফুসে যায়।
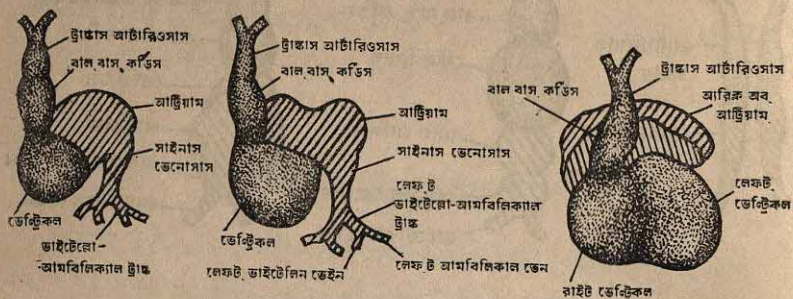
মায়ের ফুল থেকে অক্সিজেন প্রাপ্ত রক্ত ইনফিরিয়র ভেনাকেভা মাধ্যমে ফোরামেন ওভাল দিয়ে (ভ্রূণীয় অবস্থায় দুইটি অলিন্দের মাঝে পার্টিসানে যে ছিদ্র থাকে তাকে ফোরামেন ওভাল বলা হয়) বাম অলিন্দে ও পরে বাম নিলয়ে যায়। সেখান থেকে মহাধমনী দিয়ে বেশির ভাগ রক্ত মাথার দিকে চলে যায়।

জন্মাবার সাথে সাথে বা কিছু পরে ফোরামেন ওভাল ও ডাকটাস আর্টারিওসাস বন্ধ হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক রক্ত চলাচল হতে থাকে।

পেরিকার্ডিয়াম

পেরিকার্ডিয়াম একটি দুই পর্দার মোচাকার থলি যার মধ্যে হৃৎপিণ্ড অবস্থিত। ইহার বাহিরের পর্দাটি তান্তব (fibrous) বস্তু দ্বারা নির্মিত এবং একে **তান্তব পেরিকার্ডিয়াম** বলে। এই তান্তব স্তরের ভিতরের দিকটি সেরাস ঝিল্লী দ্বারা আবৃত এবং এই ঝিল্লীকে **সেরাস পেরিকার্ডিয়াম** বলে। ঐ একই সেরাস ঝিল্লী উপরের দিক থেকে ঘুরে এসে হৃৎপিণ্ড গাত্রকে নিবিড়ভাবে আবৃত করে। এই সেরাস ঝিল্লী যেটি নিবিড়ভাবে হৃৎপিণ্ডের গায়ে লেগে থাকে তাকে **এপিকার্ডিয়াম** বলে। হৃৎপিণ্ডের এপিকার্ডিয়াম এবং বাহিরের তান্তব স্তরের সেরাস ঝিল্লী, এই দুই ঝিল্লী আবরণীর মাঝখানে একটি গহ্বর থাকে যাকে **পেরিকার্ডিয়াল গহ্বর** বলে। এই পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরে এক প্রকার হরহরে তরল পদার্থ থাকে যাকে পেরিকার্ডিয়াল তরল পদার্থ (Pericardial

fluid) বলে। পেরিকার্ডিয়াল থলির মধ্যে থেকে হৃৎপিণ্ড যখন সংকোচন-প্রসারণ করে তখন এই পেরিকার্ডিয়াল তরল পদার্থ পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরের দুটি তলের মধ্যে ঘর্ষণকে নিবৃত্ত করে।

পেরিকার্ডিয়ামের সেরাস ঝিল্লী চ্যাপ্টা একটি কোষের স্তর দ্বারা নির্মিত যেটি একটি পাতলা বেসমেণ্ট স্তরের উপর অধিষ্ঠিত থাকে। এই বেসমেণ্ট স্তরটি সংযোজক কলাতন্তু ও স্থিতিস্থাপক কলা তন্তু দ্বারা গঠিত। তান্তব পেরিকার্ডিয়াম শুধু সংযোজক কলা তন্তু দ্বারা গঠিত।

পেরিকার্ডিয়ামের ক্রিয়াকলাপ :

১। এটা একটি হৃৎপিণ্ডের মোচাকার থলির আধার যেটি হৃৎপিণ্ডকে ধরে রাখে এবং বাহিরের অন্যান্য অঙ্গ থেকে তফাৎ করে রাখে।

২। পেরিকার্ডিয়াম হৃৎপিণ্ডের ডায়াস্টোলিক স্ফীতিকে সংযত রাখে।

৩। তান্তবীয় পেরিকার্ডিয়ামের স্থিতিস্থাপকতা না থাকায় হৃৎপিণ্ডের স্ফীতি হতে দেয় না।

৪। ইহা বাম নিলয়ে অতিরিক্ত রক্ত জমতে বাধার সৃষ্টি করে এবং ফুসফুসীয় রক্ত সংবহনে গুরুচাপ থেকে রক্ষা করে।

৫। ক্রমাগত অল্প চাপে পেরিকার্ডিয়াম স্ফীত হয়ে যেতে পারে যার ফলে পেরিকার্ডিয়ামের ধারণ শক্তি বেড়ে যায়।

যদি তরল পদার্থ পেরিকার্ডিয়াম গহ্বরে খুব তাড়াতাড়ি জমে যায়, হৃৎপিণ্ড পেষিত হয়ে যায় এবং শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে রক্ত আসা বাধাপ্রাপ্ত হয়। মাত্র কয়েক মিলিমিটার রক্ত হঠাৎ করে পেরিকার্ডিয়াম গহ্বরে জমে উঠলে গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আবার আস্তে আস্তে পেরিকার্ডিয়েল ইফিউসনের ক্ষেত্রে জল জমলে, হৃৎপিণ্ড আস্তে আস্তে বড় হয়ে ওঠে যেমন হৃৎপিণ্ড হাইপারট্রফির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, পেরিকার্ডিয়াম যথেষ্ট স্ফীত হতে পারে।

৬। পেরিকার্ডিয়াম অত্যাবশ্যক নহে। পেরিকার্ডিয়াম বাদ দিলেও প্রাণহানী হয় না এবং মানুষ বা জন্তু জানোয়ার পেরিকার্ডিয়াম বিহীন অবস্থায় বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। জন্মগত দোষের দরুণ পেরিকার্ডিয়াম নাও থাকতে পারে।[১]

১। R. L. Moore, Arch. Surg., Chicago, II : 756, 1925. H. South worth and C. S. Stevenson, Arch. intern. Med. 61 : 223, 1938. S. Sunder Land and R. J. Wright—Smith, Brit. Heart J. 6 : 167, 1944. Mentioned by Earnest Gardnar, J. Gray, Ronan O' Rahilly, Anatomy.

হৃৎপিণ্ডের গঠন (Structure of Heart)

হৃৎপিণ্ড একটি পেশী-গঠিত স্বয়ংক্রিয় পাম্প যার কাজ হ'ল, শরীরের সমস্ত কোষকে রক্তের মাধ্যমে তাদের বিপাকীয় প্রয়োজন মত পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করা। ঐ কার্য্য সম্পাদন করতে বিশ্রামের সময়, প্রতি মিনিটে অন্ততঃ ৫ লিটার রক্ত পাঠাতে হবে এবং পরিশ্রমের সময় হৃৎপিণ্ডের এমন শক্তি থাকা চাই যার দ্বারা হৃৎপিণ্ড অনায়াসে প্রতি মিনিটে অন্ততঃ ১৫ লিটার রক্ত সরবরাহ করতে সক্ষম হয়। প্রান্তীয় বাধা ও হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসা রক্তের পরিমাণের তারতম্য হলেও হৃৎপিণ্ডের ঐ সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সামলে নেওয়ার শক্তি থাকা চাই যাতে করে হৃৎপিণ্ড অভ্যন্তরের চাপ ও ধমনীর চাপ এই দুই-এর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম হয়।

উপরি উক্ত কার্য্যগুলি সুষ্টভাবে সম্পাদন করতে অপারগ হ'লে ঐ অবস্থাকে হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা বা হার্ট ফেলিওর বলা হয়ে থাকে।

সাধারণ ভাবে সব ঠিক ঠিক চললে হৃৎপিণ্ডের কর্মশক্তি ও কর্ম পরিমিতি অসাধারণ যা আমরা মুখবন্ধে আগেই আলোচনা করেছি। এই শক্তির উৎস কি তা জানতে হ'লে আমাদের জানতে হবে হৃৎপিণ্ডের মূল গঠন প্রকৃতি এবং তার বিশেষত্ব। নিম্নে হৃৎপিণ্ডের গঠন সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল :

হৃৎপিণ্ডের চাক্ষুষ গঠন (Gross structure of Heart)

হৃৎপিণ্ডকে প্রস্থচ্ছেদ করলে আমরা দেখতে পাব যে তিনটি প্রধান টিস্যু হৃৎপিণ্ড গঠনে প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে যথা সংযোজক কলা বা টিস্যু, মাসকুলার টিস্যু ও এণ্ডোথিলিয়েল টিস্যু এবং চোখে দেখলে আমরা দেখতে পাব ঐ টিস্যুগুলি সুবিন্যস্তভাবে গঠনের কাঠামোয় সজ্জিত আছে যা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে :

১। হৃৎপিণ্ডের বাহিরের তলগুলি (surfaces) একটা শক্ত অথচ খুবই পাতলা একটি আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে যাকে আমরা **এপিকার্ডিয়াম** বলি। এই এপিকার্ডিয়াম সংযোজক কলা দ্বারা গঠিত এবং পেরিকার্ডিয়েল গহ্বরের ভিতরের স্তর এবং হৃৎপিণ্ড শরীরকে আবরণের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের আকৃতিকে বজায় রাখে।

২। হৃৎপিণ্ড দেওয়ালের সব থেকে ভিতরের দিকে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড গহ্বর

দিকের তল, একটি মসৃণ পাতলা (এপিকার্ডিয়াম থেকে অনেক পুরু) স্তর দেখা যায় যাকে **এণ্ডোকার্ডিয়াম** বলা হয়। এই এণ্ডোকার্ডিয়াম হৃৎপিণ্ড গহ্বরের দেওয়ালকে আবরণ করে এবং রক্তের সংস্পর্শে আসে। এই স্তর এণ্ডোথিলিয়েল টিস্যু দ্বারা গঠিত।

৩। এণ্ডোকার্ডিয়াম ও এপিকার্ডিয়াম এই দুই স্তরের মাঝখানে সবার থেকে পুরু একটি স্তর থাকে যাকে **মায়োকার্ডিয়াম** বলে। এই স্তরটি বিশেষ পেশী কোষ অর্থাৎ কার্ডিয়াক পেশী কোষ দ্বারা গঠিত। এই স্তরটিই হৃৎপিণ্ডের সংকোচক অঙ্গ।

৪। হালকা অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখলে মায়োকার্ডিয়াম ও এণ্ডোকাডিয়াম স্তরের মাঝখানে একটি হালকা ঢিলেঢালা স্তর দেখা যায় যাকে **সাবএণ্ডোকার্ডিয়েল** স্তর বলা হয়।

অতএব হৃৎপিণ্ডের চাক্ষুস গঠনের সারাংশ নিম্ন প্রকার (বাহির থেকে ভিতরে) ঃ

১। এপিকার্ডিয়াম—সংযোজক কলা।

২। মায়োকার্ডিয়াম—কার্ডিয়াক মাসল (পেশী)।

৩। সাবএণ্ডোথিলিয়েল স্তর (যন্ত্র ছাড়া সঠিক দেখা না গেলেও বোঝা যায়)।

৪। এণ্ডোকার্ডিয়াম—এণ্ডোথিলিয়েল টিস্যু।

হৃৎপিণ্ড পেশীর আনুবীক্ষণীক গঠন ঃ

হৃৎপিণ্ড পেশীকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করলে দুই রকমের পেশী কোষ দেখা যায়।

১। সংকোচক পেশী কোষ

২। ইমপালস উৎপাদক ও ইমপালস পরিবেশক পেশী কোষ (পরে যথাস্থানে বর্ণনা করা হয়েছে)।

সংকোচক পেশী কোষ ঃ

ঐচ্ছিক পেশীর মত হৃৎপিণ্ড পেশীকোষ আকৃতিতে রুটি বেলা বেলুনের মত কিন্তু হৃৎপিণ্ড পেশীকোষের বিশেষত্ব পার্শ্ব শাখা থাকে যা ঐচ্ছিক পেশী কোষের থাকে না। ঐচ্ছিক পেশীর মত গঠন-একক (**structural unit**) মায়োফাইব্রিল

কিন্তু কার্ডিয়াক মায়োফাইব্রিলিগুলি আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি উভয় দিকেই রেখিত থাকে। প্রতিসরণ প্রকৃতির তারতম্যের জন্য ঐচ্ছিক পেশীকেষের মত প্রতিটি কার্ডিয়াক মানোফাইব্রিল এ, আই, এম, এইচ, এবং জেড অংশে বিভক্ত। প্রতিটি মায়োফারিল-এর ভিতরে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু দেখা যায় যেগুলিকে **মায়োফিলামেন্টস** বলা হয়।

প্রতিটি মায়োফাইব্রিল-এর জেড থেকে জেড অংশকে **সারকোমিয়ার** বলা হয়। এই সারকোমিয়ারই পেশীর **সংকোচন একক** (Cantraction unit)। প্রতিটি সারকোমিয়ার সম্পূর্ণ এ-ব্যাণ্ড এবং উপর-নিচু দুটি আই-ব্যাণ্ডের অর্দ্ধেক লইয়া গঠিত। সারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য ২.৩ μ যার মধ্যে এ-ব্যাণ্ডের অংশ ১.৫ μ এবং আই-ব্যাণ্ডের অংশ ০.৮ μ।

আগেই বলা হয়েছে মায়োফাইব্রিলের সূক্ষ্ম গঠনে মায়োফিলামেন্টস থাকে। দু-রকমের মায়োফিলামেন্ট দেখা যায় যাদের মধ্যে একটি **মায়োসিন** ও অন্যটি **অ্যাকটিন** এবং এদের রাসায়নিক গঠন আলাদা আলাদা এবং মাপেও এদের মধ্যে তফাৎ আছে।

মায়োসিন ফিলামেন্ট (Myosin filament) :

প্রতিটি মায়োসিন ফিলামেন্টের ব্যাস ১০ nm (১০০ Å) এবং এর দৈর্ঘ্য ১.৫ μm এবং এরা সমান্তরালে অবস্থিত থাকে এবং দুটি মায়োসিন ফিলামেন্টের মধ্যে ৪৫ nm ফাঁক থাকে। প্রতিটি মায়োসিন ফিলামেন্টের মাঝখানটা বলের মত মোটা এবং এর উভয় প্রান্তই ক্রমশঃ সরু হয়ে যায়। প্রতিটি মায়োসিন ফিলামেন্টে ১৮০টি প্রোটিন মলিকিউল থাকে যাদের **মায়োসিন মলিকিউল** বলা হয় এবং এদের মলিকুলার ওজন হ'ল ৫০০,০০০। এ-গুলি রডের মত দেখতে এবং এদের এক প্রান্ত হুকের মত বাঁকান। ট্রিপসিন দিয়ে পচনের পর প্রতিটি মায়োসিন মলিকিউলে দু-রকমের প্রোটিন পাওয়া যায়, **লাইট মেরোমাইসিন** ও **হেভি মেরোমাইসিন**।

অ্যাকটিন ফিলামেন্টস (**Actin filaments**) **:** অ্যাকটিন ফিলামেন্টগুলি মায়োসিন ফিলামেন্ট থেকে অনেক সরু এবং এদের এক-একটির ব্যাস ৫ nm এবং জেড-ব্যাণ্ড থেকে পরস্পর বিপরীত মুখ হয়ে অবস্থান করে এবং তারাই আই-ব্যাণ্ড গঠন করে। অ্যাকটিন ফিলামেন্ট, আই-ব্যাণ্ড যতটা লম্বা, ঠিক ততটা লম্বা নয়। তারা এ-ব্যাণ্ডের মধ্যে মায়োসিন ফিলামেন্টের আংশিক পার্শ্বচর

হিসাবে অবস্থান করে। অ্যাকটিন ফিলামেন্ট ও মায়োসিন ফিলামেন্টেস-এর মধ্যে ১০-২০ nm ফাঁক থাকে। পেশীর অবস্থা অনুপাতে তারা এ-ব্যাণ্ডের কতটা গভীরে থাকবে তা নির্ভর করে। বিশ্রামের সময় দু-দিক থেকে অ্যাকটিন ফিলামেন্ট এ-ব্যণ্ডের গভীরে ঢুকে থাকে কিন্তু মিলিত হয় না। একটা ফাঁক থেকে যায়—যে-ফাঁকটা এইচ-ব্যাণ্ডের দৈর্ঘ্য নিরুপণ করে এবং এইচ-ব্যাণ্ড, এ-ব্যাণ্ডের মধ্যবর্তী অংশ হওয়ায় এটা বোঝা যায় যে বিশ্রামের সময় অ্যাকটিন ফিলামেন্ট এইচ-ব্যাণ্ডকে ভেদ করে যায় না। যখন পেশী প্রসারিত হয় তখন এইচ-ব্যাণ্ড বড় হয়ে যায়। যখন পেশী সংকোচিত হয় তখন এইচ-ব্যাণ্ড খুব ছোট হয়ে যায় বা থাকে না।

অ্যাকটিন ফিলামেন্টের (এফ অ্যাকটিন) মলিকুলার গঠনে আমরা দেখতে পাই দুটি তন্তুর মত বস্তু নিজেদের মধ্যে জরাজরি ক'রে রয়েছে। ঐ প্রতিটি তন্তু জি-অ্যাকটিনের পলিমার যেগুলি জুড়ে জুড়ে একটি লম্বা তন্তুর মত আকার ধারণ করে। জি-অ্যাকটিনের মলিকুলার ওজন ৬০,০০০ এবং এদের প্রতিটির ব্যাস ৫·৫ nm। ট্রপোমায়োসিন-বি এবং ট্রপোনিন নামে আরও দুটি প্রোটিন ঐ অ্যাকটিন ফিলামেন্টের মধ্যে থাকে।

সারকোটিবিউলার সিসটেম (Sarcotubular System) : ঐচ্ছিক পেশী কোষের মত কার্ডিয়াক পেশী কোষের সারকোটিবিউলার রেটিকুলাম থাকে কিন্তু এখানে গঠনে জটিলতা কম এবং কোন প্রান্তীয় সিসটারনি (cisternae) বা সিসটারনি ট্রায়েড থাকে না কিন্তু এখানে টি-টিবিউল অপেক্ষাকৃত বড় দেখা যায়।

সারকোপ্লাজম : কার্ডিয়াক কোষে সারকোপ্লাজম বেশ বেশি থাকে এবং দেখতে দানাদার এবং এর মধ্যে মায়োফাইব্রিলস, সারকোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, মিটোকনড্রিয়া, গলজি-বডি প্রভৃতি থাকে। মিটোকনড্রিয়া গুলি খুবই লম্বা লম্বা এবং সংখ্যায়ও খুব বেশি থাকে। প্রতিটি লম্বায় সাধারণত ২·৫ μ এবং ৭-৮ μ পর্য্যন্ত লম্বা হ'তে পারে।

কার্ডিয়াক কোষের বিশেষত্ব :

প্রতিটি কার্ডিয়াক কোষ শাখা বিশিষ্ট এবং প্রতিটি কোষ অন্য কোষের সঙ্গে বিশেষ বন্ধনে (ডেসমোসোম, ফ্যাসা অ্যাডহেরেনস, নেক্সাস) যুক্ত থাকে। এই বন্ধনগুলি সিঁড়ির মত স্তবকে স্তবকে পরস্পর পরস্পরকে যুক্ত করতে দেখা যায় এবং সংযুক্তির জায়গাগুলিকে **ইন্টারক্যালেটেড ডিস্ক** বলা হয় যা হৃৎপিণ্ড পেশীর নিজস্ব বিশেষত্ব। তা ছাড়া আগেই বলা হয়েছে যে হৃৎপিণ্ড কোষ লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি ভাবে রেখিত। কোষের নিউক্লিয়াস হাঁসের

ডিমের মত এবং কোষের মাঝখানে থাকে। সারকোপ্লাজম দানাদার এবং মিটোকনড্রিয়াগুলি খুবই লম্বা। সারকোটিবিউলার রেটিকুলামের বিশেষত্ব উপরে বলা হয়েছে। এর প্রান্তীয় সিসটারনি ও সিসটারনি ট্রায়েড থাকে না এবং টি-টিবিউল অপেক্ষাকৃত বেশ বড়।

কার্ডিয়াক কোষের কার্য্যকরী সাবইউনিট
(সংকোচন-প্রসারণ যন্ত্র) :

সারকোমিয়ারই কার্ডিয়াক কোষের কার্য্যকরী অংশ : আগেই বলা হয়েছে প্রতিটি সারকোমিয়ারের মধ্যে অ্যাকটিন ও মায়োসিন ফিলামেণ্টস থাকে। মায়োসিন ফিলামেণ্ট মাঝখানে থাকে এবং দুই প্রান্তের জেড-ব্যাণ্ড থেকে প্রতিটি মায়োসিন ফিলামেণ্টের দুই পাশে অ্যাকটিন ফিলামেণ্ট লম্বালম্বি বিপরীতমুখী হয়ে সজ্জিত থাকে কিন্তু তারা মিলিত হয় না—কিছু ফাঁক থাকে। যখন সংকোচন হয় দুটি জেড লাইনের দূরত্ব কমে যায় এবং বিপরীতমুখী দু-জোড়া অ্যাকটিন ফিলামেণ্টস পরস্পর কাছাকাছি হয়ে একটি অপরটির পাশে কিছু অংশ পর্য্যন্ত যুগ্মভাবে অবস্থিত হয়। মায়োসিন ফিলামেণ্ট ও অ্যাকটিন ফিলামেণ্ট পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কিছু পর পর সেতু দ্বারা যুক্ত হয়ে যায়। এই সেতুগুলি মায়োসিন ও অ্যাকটিন ফিলামেণ্টের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় স্থান। এটা বলা হয়ে থাকে সেতুর সংখ্যা যত বেশি হবে
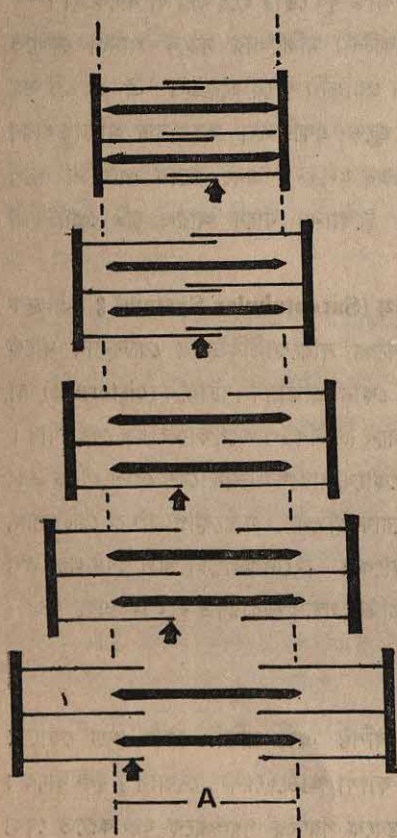
অ্যাকটিন মায়োসিন ফিলামেন্টের পেশী সংকোচনের ও শিথিলতার সময় অবস্থা।

ততই সংকোচক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। যখন সারকোমিয়ার ২-২·২ μ-এর মধ্যে থাকে তখন মায়োসিন ও অ্যাকটিন ফিলামেণ্টের মধ্যে সব থেকে বেশি কার্য্যকরী সম্পর্ক গড়ে উঠে। এই দৈর্ঘ্য যদি বেড়ে যায় কোন কোন জায়গায় সেতু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়—সংকোচন শক্তি কমে যায়। আবার এই দৈর্ঘ্য যদি কমে যায় অ্যাকাটিন ফিলামেণ্ট পরস্পর পরস্পরের সহিত আবরণবদ্ধ হয়ে যায়—সংকোচন বিঘ্নিত হয়।

স্টারলিং-এর সূত্র (Starling's Law)

স্টারলিং কার্ডিয়াক কোষের সংকোচন সম্পর্কে একটি সূত্রে বলেছিলেন সংকোচিত হওয়ার আগে হৃৎপিণ্ড কোষ-তন্তুর দৈর্ঘ্য কার্য্যকরী সীমার মধ্যে যত বড় হবে সংকোচন শক্তি তত বেশি হবে। যেমন ডায়াস্টোলের সময় রক্তের পরিমাণ যদি এমন হয় যা হৃৎপিণ্ড কোষের দৈর্ঘ্যকে বাড়িয়ে দেয় তাহলে সংকোচন শক্তি বৃদ্ধি পাবে। আবার খুব বেশি প্রসারিত হ'লে সংকোচন শক্তি কমে যায়। এখানে আমরা স্মরণ করব যে সারকোমিয়ারের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য ২·৩μ। ঐ স্বাভাবিক সীমার মধ্যে সংকোচনের আগে যত বেশি দৈর্ঘ্য থাকবে সংকোচন শক্তি তত বেশি হবে। উপরের স্তবকে সারকোমিয়ারের কার্য্যকারীতার কথা যা আলোচনা করা হয়েছে তা স্টারলিং-এর সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হৃৎপিণ্ড ও সংবহনতন্ত্রের উপর ব্যায়ামের প্রতিক্রিয়া :

ব্যায়ামের ফলে জৈব রাসায়নিক বস্তু যথা নরএড্রিনেলিন, এড্রিনেলিন অতিমাত্রায় ক্ষরিত হয় এবং তারা সিমপ্যাথেটিক নার্ভকে উত্তেজিত করে যার ফলে হৃৎপিণ্ডের গতিমাত্রা এবং সংকোচন শক্তি বেড়ে যায়। পেশীর রক্তবাহ প্রসারিত হয় কিন্তু বৃক্কের, পেটের অঙ্গসমূহের ও চামড়ার রক্তবাহগুলি সংকোচিত হয় যার ফলে বেশি রক্ত শিরা দিয়ে হৃৎপিণ্ড ফিরে আসে, ডায়াস্টোলিক রক্ত-পরিমাণ বাড়ে—কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়ে এবং পেশীতে রক্ত সরবরাহও বেড়ে যায়। সিস্টোলিক রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় কিন্তু ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ অপরিবর্তিত থাকে।

উত্তেজনা-সংকোচনের যুগ্ম প্রতিক্রিয়া (Excitation contraction coupling) :

বৈদ্যুতিক উত্তেজনা কোষকে প্রভাবিত করার জন্য কোষের মধ্যে পরপর কতকগুলি প্রতিক্রিয়া (Depolarization-repolarization) ঘটে যার ফলে

হৃৎপিণ্ড কোষ সংকোচিত হয়। ঘটনা যা ঘটে তা দেখতে পাওয়া যায় কিন্তু প্রকৃত তথ্য সম্বন্ধে আজও আমাদের সম্যক উপলব্ধি হয় নাই। আমরা জানি হৃৎপিণ্ড কোষ সারকোলেমা দ্বারা আবৃত থাকে। এই সারকোলেমা ভাঁজ খেয়ে কোষের গায়ে টিউবের জালক সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে কতকগুলি টিউব কোষের উপর লম্বালম্বি ভাবে থাকে, আর কতকগুলি আড়াআড়ি ভাবে (Transverse Tubles) থাকে। এটা ধারণা করা হয়—বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রথমে আড়াআড়ি টিউবের মাধ্যমে যায় তারপর লম্বালম্বি টিউবের উপর দিয়ে যায়, ফলে ক্যালসিয়াম, কোষ তন্তুর মধ্যে প্রবেশ করে এবং ট্রপোনিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়; ঐ ট্রপোনিন মুক্ত হয়ে মায়োসিন-অ্যাকটিন প্রস্থ সংযোগ (cross bridge) করে এবং এ-টিপেজকে কর্ম তৎপর করে দেয় যার ফলে সংকোচন ঘটে থাকে। আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দ্বারা ক্যালসিয়াম কোষ থেকে পাম্প হয়ে সারকোলেমিক রেটিকুলামে ফিরে যায়, পেশী শিথিল হয় এবং এই অবস্থাকে হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে ডায়াস্টোল বলে।

কার্ডিয়াক কোষের শক্তির উৎস :

প্রতি কার্য্য সম্পাদনের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয় এটা সর্বজনবিদিত। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনেও শক্তি লাগে এবং এই শক্তি গ্লুকোজ, ল্যাকটেট, ও ফ্যাটি এসিড অক্সিডেসন হয়ে এডিনোসিন ট্রাইফসফেট ও ক্রিয়েটিনিন ফসফেটে রূপান্তরিত হয়ে শক্তি সঞ্চারিত করে যার ফলে হৃৎপিণ্ড পেশী কলা সংকোচিত হতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে **অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেসন** বলা হয়।

ইমপালস উৎপাদক ও পরিবেশক পেশীকলা ও তাদের আণুবীক্ষণীয় গঠন :

প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের দক্ষিণ অলিন্দে দুটি বিশেষ স্থান রয়েছে যাদের সাইনু-অ্যাট্রিয়েল নোড (S. A. Node) ও অ্যাট্রিয়ো-ভেন্টিকুলার নোড (A-V Node) বলা হয়। এই সাইনু-অ্যাট্রিয়েল নোডে প্রথম ইমপালসের উৎপত্তি হয়। সেই ইমপালস অলিন্দের পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে তারপর এ-ভি নোডে যায় এবং এ-ভি নোড থেকে সেই ইমপালস অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার বাণ্ডল (His), তার দুই শাখা, বাম ও দক্ষিণ, ও পারকিনজি কোষ দ্বারা উভয় নিলয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

আমাদের জানা আছে অলিন্দের পেশীর সঙ্গে নিলয়ের পেশীর সরাসরি কোন

যোগ নাই। সে-কারণে অলিন্দ থেকে নিলয়ে ইমপালস যাওয়ার পথ হ'ল এ-ভি বাণ্ডল, তার দুই শাখা ও পারকিনজি কোষের নিলয়দ্বয়ে ব্যাপক পরিব্যাপ্তির মাধ্যমে। রোগে বা অন্য কোন কারণে এ-ভি বাণ্ডল নষ্ট হলে ইমপালস নিলয়ে যেতে পারে না। এই অবস্থাকে সম্পূর্ণ **হার্ট ব্লক** বলে এবং এই অবস্থায় অলিন্দ যে ইমপালস সৃষ্টি করে সেই ইমপালসের দরুণ অলিন্দের স্পন্দনের সংখ্যা এক রকম হয় (প্রতি মিনিটে ৬০-১০০) এবং নিলয় নিজস্ব শক্তি দ্বারা যে স্পন্দনের সৃষ্টি করে তার সংখ্যা অন্য রকম হয়। এই অবস্থায় নিলয়ের বিটের সংখ্যা খুব কম হয়ে যায় এবং সাধারণত প্রতি মিনিটে ৩০টি বা আরও কম হয়ে থাকে।

ইমপালস প্রথমে এস-এ নোডে সৃষ্টি হয় এবং সেই ইমপালস মেডালায় অবস্থিত ভ্যাসোমটর সেণ্টার দ্বারা প্রেরিত ইমপালস সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় একটা গড় সংখ্যায় নিয়মিত ভাবে ইমপালস আসতে থাকে এবং সেই অনুযায়ী অলিন্দ সংকোচিত ও প্রসারিত হয়ে থাকে। অলিন্দের ইমপালস এ-ভি নোডে এসে তারপর এ-ভি বাণ্ডল-এর মাধ্যমে নিলয়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং নিলয় অলিন্দ যে সংখ্যায় ইমপালস পাঠায়, সেই সংখ্যায় সংকোচিত প্রসারিত হতে থাকে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে স্নায়ু এস-নোডকে শাসন করে এবং এস-এ নোড এ-ভি নোডের মাধ্যমে নিলয় পেশীকে শাসন করে। অতএব দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ অলিন্দের এস-নোড, নিলয়ের গতিমাত্রার মান স্থির করে দেয় এবং হৃৎপিণ্ডে গতিবেগের মান বা মাত্রা ঠিক করে দেয় বলেই এস-এ নোডকে **পেস মেকার** (Pace Maker) বলা হয়।

হৃৎপিণ্ডের ঐ বিশেষ সংগঠনকে সঞ্চারক কলা (Conducting Tissue) বলা হয়ে থাকে। ঐ সঞ্চারক কলার অঙ্গগুলি পুনরায় নাম উল্লেখ করে তাদের বিশেষ পরিচিতি জ্ঞাপন করা হচ্ছে।

হৃৎপিণ্ড পেশীর ইমপালস সঞ্চারক কলার অঙ্গগুলি :

(১) সাইনু-অ্যাট্রিয়েল নোড (এস-এ নোড)।

(২) অ্যাট্রিয়োভেন্ট্রিকুলার নোড (এ-ভি নোড)।

(৩) হিজের (His) অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার বাণ্ডল (এ-ভি বাণ্ডল)

(i) বাম শাখা

(ii) দক্ষিণ শাখা

(iii) পারকিনজি ফাইবার্স (Purkinjee fibres)

(১) সাইনু-অ্যাট্রিয়েল নোড (এস-এ নোড) :

পরিচিতি : ১৯০৭ সালে কিথ ও ফ্ল্যাক (Keith and Flack) প্রথম এস-এ নোড সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় চিকিৎসক বিজ্ঞানীদের সামনে তুলে ধরেছিলেন সেই কারণে এস-এ নোডকে কিথ ও ফ্ল্যাকের সাইনু-অ্যাট্রিয়েল নোডও বলা হয়ে থাকে। আবার পেস মেকার (Pace maker) নামেও এই কেন্দ্রবিন্দুটি সবার কাছে বিশেষ ভাবে পরিচিত।

অবস্থান : নামের সঙ্গে অবস্থানের পরিচয় রয়েছে। হৃৎপিণ্ডের ভ্রূণীয় জীবনে দক্ষিণ অলিন্দ, সাইনাস ভেনেরামের কিছু অংশ প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়ামের সঙ্গে মিলনের দ্বারা গঠিত হয়। এই নোড, ভ্রূণীয় জীবনে, সাইনাস ভেনেরাম ও প্রিমিটিভ অ্যাট্রিয়ামের সংযোগ স্থলে উপস্থিত ছিল তাই এই নোডের সাইনু-অ্যাট্রিয়েল নোড নামকরণ সার্থক হয়েছে।

প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে এস-এ নোড সালকাস টারমিনেলিসের উপরের দিকে সুপিরিয়র ভেনাকেভা ও দক্ষিণ অলিন্দের সংযোগ স্থলে এপিকার্ডিয়াম ও এণ্ডো-কার্ডিয়ামের মধ্যে অবস্থিত। দক্ষিণ অলিন্দের ভিতরে এই নোডের অবস্থান ক্রিষ্টাটারমিনেলিসের উপরের দিকে সাইনাস ভেনেরামের দিকে থাকে।

আকৃতি ও মাপ : এস-এ নোডের আকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন এস-এ নোড মাকুর মত, কেউ বলেন গদার মত আবার কেউ কেউ বলেন এস-এ নোডের তিনটি অংশ আছে মাথা, ধর আর লেজ।

এর মাপের সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নাই। এর দৈর্ঘ্য ১০ থেকে ২০ মিলি-মিটার, প্রস্থ ৩ মিলিমিটার (সব থেকে চওড়া জায়গায়) এবং ১ মিলিমিটার পুরু।

আণুবীক্ষণীক গঠন : আণুবীক্ষণীক গঠনের প্রধান বৈশিষ্ট (১) এস-এ নোডের ধমনী এস-এ নোডকে লম্বালম্বি মাঝখান দিয়ে ভেদ করে যায়; এই ধমনীর ব্যাস, যতটুকু টিস্থকে ধমনী সরবরাহ করে, সেই তুলনায় আনুপাতিক হারে বেশ বড় মাপের এবং এর টিউনিকা অ্যাডভেন্টিসিয়া, দু-পাশের ঘন সংযোজক কলার জালকে মিশে যায়, যে জালক এস-এ নোডের কাঠামো তৈয়ার করে। এই ধমনী ডান কিম্বা বাম করনারী ধমনীর শাখা হয়ে থাকে।

(২) এস-এ নোডের সংযোজক কলার জালকের মধ্যে নোডাল ধমনীর গায়ে গায়ে ফ্যাকাশে বড় মাকুর মত শাখা বিশিষ্ট এক রকমের পেশীকোষ থাকে যাদের

পি-কোষ বলা হয়। পি-কোষের মাঝখানে নিউক্লিয়াস থাকে। এটা এখন সর্বজন স্বীকৃত যে পি-কোষই সংকোচক ইমপালস সৃষ্টি করে।

(৩) এক রকমের **পরিবৃত্তিকাল** (Transitional) **কোষ** এস-এ নোডে পাওয়া যায় যারা পি-কোষকে অলিন্দের পেশী কোষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

১৯৭৮ সালে জেমস নামে এক গবেষক বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এস-এ নোডে যে কোষ দেখেছিলেন তাদের নূতন ভাবে নামকরণ করেছিলেন। তাঁর মতে এস-নোডে চার রকমের কোষ থাকে যথা (১) নোডাল মায়োসাইট **(Nodal myocyte)**, পি-কোষ, **(ii)** পরিবৃত্তিকাল মায়োসাইট **(Transitional myocyte)**, **(iii)** পারকিনজি মায়োসাইট **(Purkinjee myocyte)** ও (iv) কারিগর মায়োসাইট **(Working myocyte)** বা সাধারণ পেশীকোষ।

(৪) স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্তু এস-এ নোডের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায় এবং স্নায়ু তন্তুগুলি ঐ-সমস্ত পেশী কোষের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

(৫) প্যারাসিমপ্যাথেটিক গ্যাংলিয়নও কিছু কিছু এস-এ নোডের ধারে কাছে ছড়ান ছিটান থাকতে দেখা যায় কিন্তু তারা নোডের মধ্যে থাকে না।

কার্য্যকারিতা : সাইনুঅ্যাট্রিয়েল নোড (এস-এ নোড) হৃৎপিণ্ডের পেসমেকার (**Pacemaker**) কারণ এস-এ নোড হৃৎপিণ্ডে স্পন্দনের সৃষ্টি করে এবং সমস্ত হৃৎপিণ্ডকে নিজের বিটের সঙ্গে তাল রেখে কাজ করিয়ে নেয়। এবং এই এস-এ নোডের সংকোচন তরঙ্গ থেকে যখন কার্ডিয়াক সাইকল চলতে থাকে তখন তাকে **সাইনাস রিথম** বলা হয়।

(২) অ্যাট্রিওভেনট্রিকুলার নোড—এ-ভি নোড (A-V Node of Tarawa, 1906)

এ-ভি নোড এস-এ নোড থেকে অপেক্ষাকৃত ছোট। এ-ভি নোড একদিকে দক্ষিণ অলিন্দে দুই নোডের মধ্যে ইমপালস পরিবহনকারী শাখা ও অলিন্দের পেশীর সঙ্গে যুক্ত এবং অন্য দিকে (নিলয়ের দিকে) হিজের বাণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত।

অবস্থান : এ-ভি নোড দক্ষিণ অলিন্দের এণ্ডোকার্ডিয়ামের তলে দুই অলিন্দের পার্টিসান দেওয়ালের নিচের দিকে করনারী সাইনাসের মুখের ঠিক উপরে থাকে।

মাপ : মাপে এ-ভি নোড লম্বায় ৬ মিলিমিটার প্রস্থে ৩ মিলিমিটার এবং ১ মিলিমিটার পুরু।

আণুবীক্ষণীক গঠন : এ-ভি নোডের গঠন প্রায় এস-এ নোডের মত কিন্তু তফাৎ হ'ল—পেশী কোষগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট এবং এই নোডের বিশেষ ধমনীটি এর মাঝখানে না থেকে এক পাশে থাকে। এর কাঠামোয় সংযোজক কলার জালক অপেক্ষাকৃত কম ঘন ও ঢিলেঢালা এবং জালকের মধ্যে মায়োসাইট আবদ্ধ থাকে। নোডাল মায়োসাইট বা পি-কোষ সংখ্যায় কম থাকে এবং পরিবৃত্তিকাল (Transitional) কোষই বেশি সংখ্যায় থাকে এবং মুখ্য কোষ গোষ্ঠি। এর চারিদিকেই পারকিনজি কোষ থাকে যারা এ-ভি বাণ্ডলের সঙ্গে মিশে যায়।

কার্য্যকারিতা : (i) এ-ভি নোড এস-এ নোড থেকে অলিন্দের পেশী কোষের মাধ্যমে এবং দুই নোডের মধ্যে সংযোগকারী বিশেষ পথের মাধ্যমে সংকোচন ইমপালস পায় এবং সেই ইমপালসকে এ-ভি বাণ্ডলের মাধ্যমে নিলয়ে পাঠিয়ে দেয়।

(ii) এ-ভি নোড নিজেও সংকোচন ইমপালস সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু এর সংখ্যা কম, ৪০-৬০ প্রতি মিনিটে। যখন কোন কারণে এস-এ নোড ইমপালস সৃষ্টি করতে পারে না তখন এ-ভি নোড নিজের শক্তি দ্বারা নিজের সংকোচন ইমপালস সৃষ্টি করে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে যে ইমপালস সৃষ্টি হয় তাকে **নোডাল রিথম** বলে।

(iii) এ-ভি নোড, এ-ভি বাণ্ডল, এর দুই শাখা এবং নিলয়ের পারকিনজি জালক এক রকম সংযোজক কলা আবরণ দ্বারা পরিবৃত থাকে যার দ্বারা ইমপালস সংবহন পথের স্বাতন্ত্র বজায় থাকে (insulation) এবং এই সংযোজক কলার আবরণ ইনসুলেটরের কাজ করে থাকে।

(iv) এ-ভি নোডে অধিক মাত্রায় পরিবৃত্তিকাল কোষ থাকার দরুন এটা ধারণা করা হয় এ-ভি বাণ্ডলে ইমপালস সঞ্চালন ধীরে চলতে থাকার কারণ, পরিবৃত্তিকাল কোষ ধীরে ইমপালস সঞ্চালনে অভ্যস্ত।

অ্যাট্রিওভেনট্রিকুলার বাণ্ডল বা এ-ভি ব্যাণ্ডল :

এ-ভি বাণ্ডল একটি কলাগুচ্ছ যা এ-ভি নোডের নিচের দিক থেকে উৎপত্তি হয়ে দক্ষিণ অ্যাট্রিও ভেনট্রিকুলার রিং অতিক্রম করে ইণ্টারভেনট্রকুলার সেপ্টামে আসে এবং তারপর উপরের দিকে উঠে ঐ সেপ্টামের পেশী অংশের ও অপেশী অংশের সংযোগ স্থলে যায় এবং দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে যায়—বাম ও দক্ষিণ।

বাম শাখা ইণ্টার ভেনট্রিকুলার সেপ্টামের অপেশী অংশকে ভেদ করে বাম নিলয়ে যায় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় বিভক্ত হ'য়ে যায় যেগুলি প্যাপিলারী মাসলে (Papillary muscle) যায় এবং পারকিনজি জালকে পরিণত হয়ে হৃৎপিণ্ড কোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। আগেই বলা হয়েছে এ-ভি বাণ্ডল ও তার শাখা খুব সূক্ষ্ম সংযোজক কলার আবরণ দ্বারা আবদ্ধ থাকে।

দক্ষিণ শাখা অ্যাট্রিওভেনট্রিকুলার সেপ্টামের ডান দিক দিয়ে নেমে গিয়ে সেপ্টোমার্জিনাল ট্রাবিকুলামে পৌছায় তারপর প্যাপিলারী মাসলের গোড়ায় পৌছায় এবং এর পর এণ্ডোকার্ডিয়ামের তলে ব্যাপক পারকিনজি কোষের জালকে পরিণত হয় যা দক্ষিণ নিলয়ে পেশীর সঙ্গে মিলে যায়।

পারকিনজি পেশী কোষ :

এই পেশী কোষ হৃৎপিণ্ডে ইমপালস সঞ্চালনের পথ সৃষ্টি করে এবং এরা এ-ভি বাণ্ডলের শেষ অংশ। এরা জালক আকারে বিস্তৃত হয় এবং এণ্ডোকার্ডিয়াম ও মায়োকার্ডিয়ামের মধ্যে থাকে এবং সেখানে থাকার কালে মায়োকার্ডিয়াম কোষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে।

পারকিনজি কোষগুলি দেখতে লম্বা লম্বা ও বেশ চওড়া এবং পরস্পর যুক্ত হয়ে চেনের আকার ধারণ করে এবং পরিশেষে হৃৎপিণ্ড কোষের সঙ্গে মিলে যায়। এদের সাইটোপ্লাজম বেশ দানাদার এবং প্রতিটি কোষের মাঝখানে দুটি ছোট ছোট নিউক্লিয়াস থাকে। মায়োফাইব্রিলি গুলি কোষের মধ্যে দু-পাশে থাকে এবং সংখ্যায় কম এবং হালকাভাবে প্রস্থ-রেখিত।

কার্য্যকারিতা :

(১) **ইমপালস সঞ্চালন :** ইমপালস এ-ভি বাণ্ডলের পথ ধরে অলিন্দ থেকে (এ-ভি নোড থেকে) নিলয়ে যায় এবং নিলয়দ্বয়কে ইমপালস পরিবেশন করে। অলিন্দের পেশীর সঙ্গে নিলয় পেশীর কোন সরাসরি সংযোগ না থাকায় এইটিই ইমপালস পরিবহনের একমাত্র পথ। সাধারণত হৃৎপিণ্ড কোষ-এর থেকে এ-ভি বাণ্ডলের সঞ্চালন শক্তি পাঁচ গুণ বেশী। হৃৎপিণ্ড কোষের ইমপালস সঞ্চালন শক্তি প্রতি সেকেণ্ডে এক মিটার।

(২) এস-এ নোড ও এ-ভি নোড ইমপালস সৃষ্টি করতে কোন কারণে অক্ষম হলে এ-ভি বাণ্ডল ইমপালস উৎপাদন করে থাকে কিন্তু সেই ইমপালসের সৃষ্টি অনেক দেরিতে দেরিতে হয়, গতিমাত্রা মিনিটে মাত্র ৩০ থেকে ৩৫।

ব্যাচম্যানের বাণ্ডল ও অন্য ইমপালস সঞ্চালনের পথ :

কোন কোন গবেষকের মতে উপরি উক্ত ইমপালস সঞ্চালন পথ ছাড়াও অন্য সঞ্চালন পথ আছে। তাঁরা দেখেছেন এস-এ নোড থেকে বাম অলিন্দে ও এ-ভি নোডে আরও সংযোগ পথ আছে। তাঁরা তিনটি পথের কথা বলেছেন যথা অ্যানটিরিয়র ইণ্টারনোডাল ট্রাক্ট, যার একটি শাখা বাম অলিন্দে যায় এবং এইপথকে ব্যাচম্যানের বাণ্ডল বলে, মিডল ইণ্টারনোডাল ট্রাক্ট এবং পসটিরিয়র ইণ্টারনোডাল ট্রাক্ট। এই সব পথের উপস্থিতি সম্বন্ধে সকলে একমত নন এবং এদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে মতানৈক্য রয়েছে।

মাপ অনুযায়ী হৃৎপিণ্ড কোষের শ্রেণী ও অবস্থান :

মাপ অনুযায়ী চার রকমের হৃৎপিণ্ডের কোষ পাওয়া যায় যা নিম্নে জানান হচ্ছে :

(১) **ক্ষুদ্রতম হৃৎপিণ্ড কোষ :** এ-ভি নোডে ও এস-এ নোডে ক্ষুদ্রতম হৃৎপিণ্ড কোষ পাওয়া যায় এবং এদের মধ্যে সব থেকে কম গ্লাইকোজেন থাকে।

(২) **অপেক্ষাকৃত চওড়া হৃৎপিণ্ড কোষ :** নিলয়ের কোষগুলি বেশ চওড়া এবং এদের মধ্যে গ্লাইকোজেনের পরিমাণ বেশি থাকে।

(৩) **নিলয়ের কোষ থেকে চওড়া কোষ :** অলিন্দের কোষগুলি নিলয়ের কোষ থেকে বেশি চওড়া এবং এদের গ্লাইকোজেন পরিমাণও বেশি।

(৪) **সব থেকে চওড়া হৃৎপিণ্ড কোষ :** পারকিনজি কোষ ও এ-ভি বাণ্ডলের কোষ সব থেকে চওড়া এবং হৃৎপিণ্ডের সকল কোষের মধ্যে এদের সব থেকে বেশি গ্লাইকোজেন থাকে।

হৃৎপিণ্ড কোষের নিয়ম বিধি :

উপরে বর্ণিত চার রকমের কোষ হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশে অবস্থান করে যা উপরে বলা হয়েছে। হৃৎপিণ্ডের নানা অংশে এদের অবস্থান ও এদের কার্য্য-কারিতা নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত।

হৃৎপিণ্ডের রিথমিসিটি, সিস্টোলের দৈর্ঘ্যতা ও ইমপালস সঞ্চালনের গতিবেগ, কোষের জ্যামিতিক মাপ ও কোষের অভ্যন্তরে গ্লাইকোজেন পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। যে সমস্ত কোষের জ্যামিতিক মাপ ও গ্লাইকোজেনের পরিমাণ বেশি সেই সমস্ত কোষের ইমপালস সঞ্চালনের গতিবেগ বেশি কিন্তু এদের রিথমিসিটি ও

সিস্টোলের দৈর্ঘ্যতা কম। হৃৎপিণ্ড কোষের ঐ নিয়ম-শৃঙ্খলাকে হৃৎপিণ্ড **কোষের নিয়ম বিধি** (Law of Cardiac muscle) বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে ইমপালসের গতিবেগ বেশি সেখানে সিস্টোলের সময় ও রিথমিসিটি কম। আবার যেখানে ইমপালসের গতিবেগ কম সেখানে সিস্টোলের সময় ও রিথমিসিটি বেশি।

হৃৎপিণ্ড পেশীর বৈশিষ্ট্য
(Properties of cardiac Muscle)

বহু গবেষণার ফলস্বরূপ আমরা জানতে পেরেছি হৃৎপিণ্ড পেশীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বতন্ত্র পরিচিতি আছে যা নিম্নে বিবৃত হইল। বৈশিষ্টগুলি এইরূপ:

(১) স্বয়ংক্রিয়তা (Automaticity)।

(২) উত্তেজনা প্রাপ্তিতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা (Exitability)

(৩) সংকোচন ও প্রসারণ শক্তি (Contractility and Distensibility)

(৪) ছন্দে ছন্দে স্পন্দিত হওয়ার শক্তি (Rhythmicity)

(৫) ইমপাল্স সঞ্চালন শক্তি (Conductivity)

(৬) টোনিসিটি (Tonicity)।

(১) **স্বয়ংক্রিয়তা (Antomaticity):** হৃৎপিণ্ড পেশী নিজে নিজেই ইমপালস সৃষ্টি করতে পারে কিন্তু এই ক্ষমতা এস-এ নোডেই সর্বাধিক যার ফলে এস-এ নোড বর্তমান থাকতে অন্য পেশী কোষ এই স্বয়ংক্রিয়তা অবলম্বন করতে দেখা যায় না। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এই ইমপালস সৃষ্টিকে প্রোপাগেটেড অ্যাকসন পোটেনসিয়েল (Propagated Action Potential) বলা হয়।

(২) উত্তেজনা প্রাপ্তিতে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা (Excitability):

অন্যান্য কিছু কলার মত যথা স্নায়ু, ঐচ্ছিক পেশী প্রভৃতি, হৃৎপিণ্ড পেশীকেও উত্তেজিত করা যায় এবং উত্তেজিত করলে বিবিধ ভাবে এরা সাড়া দিয়ে থাকে। তাপ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক বস্তু প্রয়োগে ও যান্ত্রিক উপায়ে হৃৎপিণ্ড কোষকে উত্তেজিত করা যায়। উত্তেজনা সৃষ্টি নিম্ন বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল:

(i) **অটুট স্নায়ু সংযোগ:** ঐচ্ছিক পেশীর ক্ষেত্রে পেশীতে অটুট স্নায়ু সংযোগ অবশ্যই থাকতে হবে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড পেশীতে স্নায়ু সংযোগ না থাকলেও উত্তেজিত করা যেতে পারে। স্নায়ু সংযোগ ঐচ্ছিক পেশীতে বিচ্ছিন্ন হ'লে পেশী

শুকিয়ে যায় ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। স্নায়ু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হ'লে হৃৎপিণ্ড পেশী শুকিয়ে যায় না বা নিষ্ক্রিয় হয় না। জীবিত অবস্থায় অ্যাসিটিলকোলিন ঔষধ প্রয়োগে বা ভেগাস স্নায়ুকে উত্তেজিত করলে হৃৎপিণ্ড পেশীর উত্তেজিত হওয়ার শক্তি কমে যায়। অপর পক্ষে সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুকে উত্তেজিত করলে বা অ্যাড্রিনেলিন ঔষধ প্রয়োগ করলে হৃৎপিণ্ড পেশী উত্তেজিত হয় এবং এর স্পন্দনের গতিমাত্রা ও সংকোচনের শক্তি বেড়ে যায়।

(ii) **নিকট পবিবেশের তাপের পরিবর্তন :** কম তাপের মধ্যে রাখলে হৃৎপিণ্ড কম উত্তেজিত হয় কারণ ডিপোলারাইজেসন ও রিপোলারাই-জেসনের মাত্রা কমে যায়। আবার বেশি উত্তাপে রাখলে (40°C) স্পন্দনগতি বেড়ে যায় কারণ ডিপোলারাইজেসন-রিপোলারাইজেসন মাত্রা বেড়ে যায়।

(iii) **অক্সিজেন ও পুষ্টি :** কোন জীবিত কোষকে বা কলাকে বা প্রাণীকে উত্তেজক রাখতে অক্সিজেন ও পুষ্টির একান্ত দরকার। এক সঙ্গে চার মিনিটের বেশি অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ রাখলে কোন প্রাণী বাঁচতেই পারে না। জল, পুষ্টি যথা কারবোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, মিনারেলস প্রভৃতি বস্তু সামগ্রী শরীরকে উত্তেজক রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

উত্তেজিত কোষের প্রতিক্রিয়া :

হৃৎপিণ্ড কোষকে উত্তেজিত করলে নিম্ন লিখিত প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা যায় :

(a) বৈদ্যুতিক পরিবর্তন।
(b) উত্তাপের পরিবর্তন।
(c) রাসায়নিক পরিবর্তন।
(d) যান্ত্রিক পরিবর্তন।

(i) **বৈদ্যুতিক পরিবর্তন :** যখন কোন হৃৎপিণ্ড কোষকে উত্তেজিত করা হয় তখন পর পর বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় এবং ঐ প্রতিক্রিয়া গ্যালভ্যানোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে গ্রাফ কাগজে ঢেউ-এর মত রেখা ওঠা-নামার মাধ্যমে ধরে রাখা যায়। যখন কোন জীবিত কোষের উপরে গ্যালভ্যানো-মিটারের দুটি ইলেকট্রোড রাখা যায় গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটার কোন পরিবর্তন হয় না। এ থেকে বোঝা যায়, ঐ কোষের বাহির তল আইসোইলেকট্রিক। যদি দুটো ইলেকট্রোডই একই সময়ে কোষের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তখনও কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। কিন্তু যখন একটা ইলেকট্রোড কোষের উপরে রেখে

অন্যটি কোষের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় তখন সঙ্গে সঙ্গে গ্যালভ্যানোমিটারের কাঁটা পজিটিভের দিক থেকে নেগেটিভের দিকে ঘুরে যায়। এতে করে বোঝা যায় **কোষের বাহিরের তলটি পজিটিভ** এবং **ভিতরটি নেগেটিভ**, গড় পোটেনসিয়েল তফাৎ –৮০ to –৯০ মিলিভোল্ট। একেই **মেমব্রেন পোটেনসিয়েল** বলে। উপরিউক্ত ভাবে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশের যেমন অলিন্দের, নিলয়ের, এস-এ ও এ-ভি নোডের, এ-ভি বাণ্ডলের এবং পারকিন্‌জি কোষের মেমব্রেন পোটেনসিয়েল ও অ্যাকসন পোটেনসিয়েল জানা যেতে পারে।

এই ইলেকট্রিক প্রতিক্রিয়া কোষের বাহিরে ও ভিতরে আয়নের আদান প্রদানের জন্য ঘটে থাকে। যখন কোন কোষকে উত্তেজিত করা হয় তখন সোডিয়াম আয়নের ভেদ্যতা বেড়ে যায় এবং কোষের ভিতরে সোডিয়াম আয়ন ঢুকে যায়। যে বিন্দুকে উত্তেজিত করা হয় সেই বিন্দুর সোডিয়াম আয়নের ভেদ্যতা বাড়ার কারণ অ্যাসিটিলকোলিন মুক্ত হওয়া যার ফলে সূক্ষ্ম ছিদ্রের ব্যাস বেড়ে যায়। এই প্রতিক্রিয়া, সংলগ্ন মেমব্রেনে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমশঃ এক কোষ থেকে অন্য কোষে বাহিত হ'তে হ'তে সমগ্র পেশীতে ছড়িয়ে পড়ে। অতএব দেখা যাচ্ছে উত্তেজনার ফলে কোষের ভিতরের স্বাভাবিক নেগেটিভ অবস্থা পরিবর্তিত হ'য়ে পজেটিভ হয়ে যায় ও বাহিরের কোষের মেমব্রেনের পজিটিভ অবস্থা বদলে নেগেটিভ হয়ে যায় যার ফলে কোষের ইলেকট্রিক অবস্থা বদলে যায় বা ডিপোলারাইজেসন হয়ে যায় এবং এরপর আবার রিপোলারাইজড হয়ে যায়। যে বিন্দুতে উত্তেজিত করা হয় সেই বিন্দু ক্যাথোড হ'য়ে যায় এবং পর পর ভিতরে পজিটিভ বাহিরে নেগেটিভ হ'তে হ'তে ইমপালসও পর পর সঞ্চারিত হ'তে থাকে এবং এই গতিমান ইমপালসকে **প্রোপাগেটেড অ্যাকসন পোটেনসিয়েল** বলা হয় এবং এরই ফলে পেশীর সংকোচন হয়।

(ii) **রাসায়নিক পরিবর্তন ঃ** রেখিত পেশীর মত যখন হৃৎপিণ্ড পেশীকে উত্তেজিত করা হয় তখন বৈদ্যুতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কারণ সঞ্চিত এডিনোসিনট্রাইফসফেট (ATP) ভেঙ্গে এডিনোসিনডাই-ফসফেট এবং ফসফোরিক এসিড হয়। এর ফলে সারকোমিয়ারের দৈর্ঘ্য কমে যায় কারণ মায়োফাইব্রিলের ভিতরের অ্যাকটিন ফিলামেণ্টগুলি মায়োসিন ফিলামেণ্টকে মাঝখানে রেখে ওপরের দিকে উঠে যায় এবং পরস্পর পরস্পরকে আংশিক অধিক্রমন করে ফলে পেশী সংকোচিত হয়।

(iii) **উত্তাপের পরিবর্তন ঃ** রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার সময় উত্তাপের সৃষ্টি হয় এবং পেশীও সংকোচিত হয়।

(iv) **যান্ত্রিক পরিবর্তন ঃ** উপরিউক্ত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পেশী সংকোচিত হয়ে ছোট হয়ে যায় এবং পেশীর মধ্যে চাপও বৃদ্ধি পায়।

(৩) **সংকোচন ও প্রসারণ শক্তি ঃ**

বৈদ্যুতিক উত্তেজনা কোষকে প্রভাবিত করার জন্য কোষের মধ্যে পর পর কতকগুলি প্রতিক্রিয়া ঘটে যা আগেই বলা হয়েছে।

আমরা জানি হৃৎপিণ্ড কোষ ঐচ্ছিক পেশী কোষের মত সারকোলেমা দ্বারা আবৃত থাকে। এই সারকোলেমা ভাঁজ খেয়ে কোষের গায়ে টিউবের জালক সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে কতকগুলি টিউব কোষের উপর লম্বালম্বি ভাবে থাকে আর কতকগুলি আড়াআড়ি ভাবে (Trnsverse tubules) থাকে। এটা ধারণা করা হয় বৈদ্যুতিক উত্তেজনা প্রথমে আড়াআড়ি টিবিউলের মাধ্যমে যায়। তার পর লম্বলম্বি টিবিউলের উপর দিয়ে যায়—যার ফলে ক্যালসিয়াম, কোষের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ট্রপোনিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং ট্রপোমাইসিন মুক্ত হয় এবং মায়োসিন অ্যাকটিন গ্রন্থ সংযোগ হয়ে এটি-পেজকে কর্মতৎপর করে দেয় যার ফলে সংকোচন ঘটে থাকে। আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়া দ্বারা ক্যালসিয়াম কোষ থেকে পাম্প হয়ে সারকোলেমায় ফিরে আসে ও পেশী শিথিল হয়, এই অবস্থাকে হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে ডায়াস্টোল বলে।

উত্তেজনা সক্রিয় করতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(১) **উত্তেজনার পরিমাণ ঃ** উত্তেজনার পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া চাই। থ্রেসহোল্ড পরিমাণ উত্তেজনা না হ'লে সংকোচন হয় না।

(২) **উত্তেজনা দেওয়ার সময় ঃ** পেশী যখন সংকোচন অবস্থায় রয়েছে তখন উত্তেজনা প্রয়োগ করলে কোন ফল হয় না। আবার একবার সংকোচন হওয়ার পর কিছু সময় পেশী নিষ্ক্রিয় থাকে, এই নিষ্ক্রিয়তার সময়কে রিফ্র্যাকটরী পিরিয়ড (Refractory period) বলে। এই সময়ে উত্তেজনা প্রয়োগ করলেও কোন ফল হয় না।

(৩) **অক্সিজেনের অভাব ঃ** অতি অল্প মাত্রায়ও অক্সিজেন কম হলে, বা কম থাকলে হৃৎপিণ্ড পেশীর সংকোচন গতি বেড়ে যায়।

(৪) **উত্তাপ :** অল্প উত্তাপ বাড়লে সংকোচন শক্তি বাড়ে। ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ পর্যন্ত অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের কাজের অসুবিধা হয় না। গবেষণা কাজের সময় সাধারণত ৪০°C নিচে উত্তাপকে রাখা হয়। ৪৫°C উত্তাপে পেশী সংকোচক প্রোটিন জমে যায় যার জন্য সংকোচন হ'তে পারে না।

(৫) **ক্যালসিয়াম :** রক্তে অল্প ক্যালসিয়াম আধিক্য থাকলে সংকোচন ভাল হয়—বেশি থাকলে কাঁপুনী বা রাইগড় হয়। অন্য লবণ জাতীয় পদার্থও যথা সোডিয়াম, পট্যাসিয়াম, সংকোচনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(৬) **ঔষধ প্রয়োগ :** অ্যাসিটিলকোলিন সংকোচনকে দমন করে, আবার এড্রিনেলিন ও অ্যাট্রপিন প্রভৃতি ঔষধ সংকোচনের শক্তি বৃদ্ধি করে।

(৭) **স্নায়ু প্রতিক্রিয়া :** জীবিত অবস্থায় সিমপ্যাথেটিককে উত্তেজিত করলে সংকোচন শক্তি বেড়ে যায় আবার ভেগাস নার্ভকে উত্তেজিত করলে সংকোচন শক্তি কম হ'য়ে যায়।

(৮) **সংকোচনের পূর্ব মুহূর্তে পেশীকোষের অবস্থা :** স্টারলিং এর সূত্র অনুযায়ী স্বাভাবিকতার মধ্যে পেশী কোষ টান টান থাকলে সংকোচন শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

(৪) **সমগ্র বা কিছুই না (All or Nothing phenomenon or All or none law) :**

উপযুক্ত বা থ্রেসহোল্ড মাত্রায় কোন পেশীকে উত্তেজিত করলে পেশী পূর্ণ মাত্রায় সংকোচিত হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া সমগ্র হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। উত্তেজনা পরিমাণ মত বা উপযুক্ত না হলে পেশীর বা কোষের কোন প্রতিক্রিয়াই হয় না আবার পরিমিত উত্তেজনা হ'লে সংকোচন হয় এবং যখন হয় পূর্ণমাত্রায়ই হয়।

স্টেয়ারকেশ ফেনোমেনন অথবা ট্রেপ্‌পি (Staircase Phenomenon or Treppe) :

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বাওডিচ (Bowditch) শরীর থেকে হৃৎপিণ্ডকে বাহিরে এনে তার উপর কাজ করে দেখিয়েছিলেন যে অনেক্ষণ বিশ্রাম দেওয়ার পর হৃৎপিণ্ডকে নিয়মিত উত্তেজিত করলে যে সংকোচন দেখা যায় সেই সংকোচনের যান্ত্রিক প্রকাশের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়তে বাড়তে একটা উৰ্দ্ধ সীমায় আসে এবং

তারপর একই মাত্রায় চলতে থাকে আর বাড়ে না। হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের এই চরিত্রকে **স্টেয়ারকেশ ফেনোমেনন বা ট্রেপ্‌পি বলে।** হৃৎপিণ্ডের এই চরিত্রের কি কারণ তা সঠিক আজও জানা নাই যদিও কেউ কেউ নিজস্ব চিন্তামত বক্তব্য রেখেছেন যা সর্বজন গ্রাহ্য নয়।

পেশীর দুর্গল অবস্থা (Refractory Periud) :

পূর্ণ দুর্গল অবস্থা (Absolute Refractory Period) : হৃৎপিণ্ড পেশী যখন সংকোচন করতে থাকে তখন উত্তেজনা অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ মেমব্রেন পোটেনসিয়েল ডিপোলারাইজড হয়ে রয়েছে—রিপোলারাইজড না হওয়া পর্য্যন্ত কোন প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের এই বিশেষ অবস্থাকে **পূর্ণ দুর্গল অবস্থা** (Absolute Refractory Period) বলা হয়।

আপেক্ষিক দুর্গল অবস্থা : একটা সংকোচনের পর পেশী যখন রিপোলারইজড হচ্ছে তখন উগ্র উত্তেজকের সাহায্যে পেশীকে সংকোচিত হতে দেখা যায়। এই অবস্থাকে **আপেক্ষিক দুর্গল অবস্থা** বলা হয় (Relative Refractory Period).

(৪) **হৃৎপিণ্ডের ছন্দবদ্ধ স্পন্দন (Rhythmicity) :** স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড পেশী ছন্দে ছন্দে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর নিয়মিত ভাবে সংকোচিত হয়ে থাকে এবং এই নিয়মিত ছন্দবদ্ধ স্পন্দনকে ইংরাজীতে রিথমিসিটি (Rhythmicity) বলে। স্বয়ংক্রিয়তা (Automaticity) হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব শক্তি যার জন্য হৃৎপিণ্ড আপনা-আপনি সংকোচিত প্রসারিত হয়ে থাকে। নিয়মিত স্পন্দনের গতিমাত্রা, যা স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি মিনিটে ৬০—১০০ মধ্যে থাকে, নিয়মিত এস-এ নোডে ইমপালস উৎপাদনের জন্য হয়ে থাকে। নার্ভের প্রভাব এই গতিমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে যা আগে আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন টিস্যুর ইমপালস উৎপাদনের গতিমাত্রা কিরূপ তা দেওয়া হল :

এস-এ নোড	—	৬০-১০০/মিন.
অলিন্দ	—	৬০ / মিন.
এ-ভি নোড	—	৪০-৬০ / মিন.
নিলয়	—	২০-৪০ / মিন.

তাহলে দেখা যাচ্ছে এস-এ নোডের যে গতিমাত্রা সেই মাত্রাতেই সমগ্র হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছে—অন্য টিস্যুর স্বয়ংক্রিয়তা দমিত হয়ে এস-এ নোডের নেতৃত্বাধীনে স্পন্দিত হচ্ছে, সে কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের ছন্দবদ্ধ স্পন্দনকে **সাইনাসরিথম** বলা হয়।

(৫) ইমপালস-সঞ্চালন শক্তি (Conductivity) :

ছন্দবদ্ধ স্পন্দনের উদ্দেশ্য হ'ল নূতন ইমপালস সৃষ্টি হওয়ার জন্য সময় নেওয়া এবং প্রয়োজন মত বিশ্রাম নেওয়া এবং ঐ সময়কে উপযুক্তভাবে সদ্ব্যবহার করে ঐ সময়েই ইমপালস বণ্টন করা এবং স্পন্দনে শৃঙ্খলা আনা। তাই ইমপালস সঞ্চালন ও ছন্দবদ্ধ স্পন্দন উভয় কার্য্যই ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

আগেই বলা হয়েছে ইসপালস এস-এ নোডে সৃষ্টি হয়। সেখান থেকে অলিন্দ পেশীতে বিস্তৃত হয় এবং তারপর এ-ভি নোডে এসে হাজির হয় এবং এরজন্য সময় লাগে ৫০ মিলিসেকেণ্ড। এ-ভি নোডে ইমপালস ৮০-১২০ মিলিসেকেণ্ড থম্‌কে থাকে এবং তারপর এ-ভি বাণ্ডলে এবং পারকিনজি কোষের মাধ্যমে নিলয়ে যায় এবং সেখানে সমগ্র পেশীতে ইমপালস ছড়িয়ে পড়তে ৪৫—৫০ মিলিসেকেণ্ড সময় লাগে।

হৃৎপিণ্ড পেশীর বিভিন্ন অংশের ইমপালসের গতিমাত্রা এইরূপ :

(১) অলিন্দে—১ মিটার প্রতি সেকেণ্ডে
(২) নিলয়ে—০.৮ মিটার প্রতি সেকেণ্ডে
(৩) পারকিনজি কোষে—৪ মিটার প্রতি সেকেণ্ডে

রোগে বা অন্য কোন কারণে এস-এ নোড নষ্ট হয়ে গেলে এ-ভি নোড ইমপালস সৃষ্টি করে এবং এর মাত্রা প্রতি মিনিটে ৪০—৬০। যখন এ-ভি নোডের ইমপালসের উপর নির্ভরশীল হয়ে হৃৎপিণ্ড সংকোচন করে থাকে সেই স্পন্দনকে **নোডালরিথম** বলা হয়।

যখন এ-ভি বাণ্ডল রক্ত সরবরাহের অভাবের দরুণ, জীবাণু আক্রান্ত বা ক্যালসিয়ামের অভাবের দরুণ বা অন্য কোন কারণে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় তখন শক হয়ে আক্রান্ত ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে যায় কিন্তু একটু পরে নিলয় পেশী নিজস্ব শক্তি দ্বারা ইমপালস উৎপাদন করে এবং স্পন্দন করতে থাকে কিন্তু এই স্পন্দনের

গতিমাত্রা ২০—৪০ মধ্যে থাকে। নিলয়ের এই প্রকার স্পন্দনকে **ইডিওভেনট্রিকুলার** (Idioventricular Rhythm) **রিথম** বলে।

(৬) পেশীটান বা টোনিসিটি :

হৃৎপিণ্ড পেশী ছাড়া অন্যান্য পেশীর বেলায় দেখা যায় পেশী কোষ সংকোচিত না হয়েও অর্থাৎ তাদের দৈর্ঘ্য না কমেও একটা টানটান অবস্থায় থাকে। এই অবস্থাকে ঐসব পেশীর টোনিসিটি বলা হয় এবং এদের ক্ষেত্রে টোনিসিটি বজায় রাখার জন্য কর্মঠ স্নায়ু সংযোগ একান্ত দরকার।

হৃৎপিণ্ড পেশীর ক্ষেত্রে অন্যান্য পেশীর মত টোনিসিটি স্নায়ু নির্ভর নয়। প্রকৃত টোন বলতে যা বুঝায় হৃৎপিণ্ড পেশীর ঠিক সেরকম কিছু থাকে না কারণ হৃৎপিণ্ড পেশী সিষ্টোলের আগেই ইলেকট্রিক ইমপালস সৃষ্টি করে। ডায়াস্টোলের সময় কোনরূপ ইলেকট্রিকাল ইমপালস সৃষ্টি হয় না, কিন্তু স্নায়ু সংযোগের উপর নির্ভরশীল না হয়েও হৃৎপিণ্ডের, তার গহ্বরগুলির রক্তে পরিপূর্ণতার মাত্রা সংযত রাখার জন্য, নিজস্ব ধারণ শক্তি আছে যাকে টোনের বা টোনিসিটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

হৃৎপিণ্ডে ইমপালস উৎপত্তির উৎস (Source of generation of Impulse) :

হৃৎপিণ্ডের ইলপালস সৃষ্টি সম্বন্ধে তিন প্রকারের মতবাদ রয়েছে। সেই মতবাদগুলি নিম্নরূপ :

১। স্নায়ু ঘটিত (Neurogenic)
২। পেশীঘটিত (Myogenic)
৩। রসায়নঘটিত (For presence of chemicals)

১। **স্নায়ু ঘটিত :** কিছু কিছু গবেষক মনে করেন হৃৎপিণ্ডে স্নায়ু থাকার জন্যই ইমপালস সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু স্নায়ু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেও দেখা যায় হৃৎপিণ্ড ইমপালস সৃষ্টি করছে এবং স্পন্দিত হচ্ছে। তাই স্নায়ুই ইমপালস সৃষ্টি করছে একথা বিশ্বাস করা যায় না।

২। **পেশী ঘটিত :** কিছু গবেষকের মতে হৃৎপিণ্ড পেশীই ইমপালস সৃষ্টি করে। স্নায়ু সংযোগ না থাকলেও হৃৎপিণ্ড পেশী ইমপালস সৃষ্টি করে ও স্পন্দিত

হয়। হৃৎপিণ্ডের এপেক্সে কোন স্নায়ু থাকে না এবং বিচ্ছিন্ন করে স্যালাইনের জলে রাখলে এপেক্সের পেশী ইমপালস সৃষ্টি করে ও স্পন্দিত হতে থাকে, এ কারণে এই সূত্রের প্রবক্তারা বলেন হৃৎপিণ্ড পেশীই ইমপালস সৃষ্টি করে অর্থাৎ **ইমপালস সৃষ্টি পেশী ঘটিত।** এরা বলেন স্নায়ুর উপস্থিতি স্পন্দনকে কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই সূত্রটিই গ্রহণযোগ্য এবং বহুজন স্বীকৃত।

৩। **রসায়ন ঘটিত ঃ** বর্তমানে কেউ কেউ মনে করছেন হৃৎপিণ্ড পেশীতে স্নায়ু থাকে এবং স্নায়ু থাকার জন্য হৃৎপিণ্ড টিস্যুতে ক্যাটিকোলামাইনস, এড্রিনেলিন ও নরএড্রিনেলিন থাকে এবং এরই জন্য স্পন্দন উচ্চগতি সম্পন্ন। এবং এটা প্রমাণিত হয়েছে যদি হৃৎপিণ্ড রিসারপাইন দ্বারা সেবিত হয় তা হলে স্পন্দনের গতি কমে যায় এবং রিসারপাইন সেবিত টিস্যুতে ক্যাটিকোলামাইনের পরিমাণ বহুলাংশে কমে যায়। এইরূপ প্রতিক্রিয়া হৃৎপিণ্ডের যে কোন অংশেই বর্তমান রয়েছে দেখা যায়।

হৃৎপিণ্ডের উপর ইলেকট্রোলাইটের ক্রিয়া ঃ

স্তন্যপায়ী জন্তুর হৃৎপিণ্ডের ভিতর শুধু জল, লবণ মিশ্রিত জল ৭·৪ pH-এ নির্দিষ্ট রেখে চলাচল করালে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। নিম্নে বিভিন্ন লবণ মিশ্রিত জলের (**Perfusion fluid**) নমুনা গঠন দেওয়া হল যা সাধারণতঃ পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে ঃ

ওষুধ	বিভিন্ন নামে গঠিত তরল পদার্থের গঠন		
	রিঙ্গার কত গ্রাম %	লকী কত গ্রাম %	টিরোড কত গ্রাম
NaCl	০·৯০০	০·৯০০	০·৯০০
KCl	০·০৪০	০·০৪২	০·০২০
CaCl	০·০২৫	০·০২৪	০·০২০
$MgCl_2$	—	—	০·০১০
Glucose	—	০·১০০	০·২০০
$NaHCO_3$	—	০·০২০	০·১০০
NaH_2PO_4	—	—	০·০০৫
pH	৭·৪	৭·৪	৭·৪

জলের প্রতিক্রিয়া : বিশুদ্ধ জল সন্ত নিহত জন্তর (ম্যামেল) হৃৎপিণ্ডে চলাচল করালে দেখা যায়—প্রথমে হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় (সোডিয়াম, পটাসিয়াম না থাকায়) কিন্তু পরে হৃৎপিণ্ড থেমে যায় এবং আর জন্তুটিকে বাঁচান যায় না।

সোডিয়াম বাদ দিয়ে উপরি উক্ত যে কোন একটি পারফিউসন ফ্লুইড হৃৎপিণ্ডে চলাচল করালে রক্তের চাপ কমে যায়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গতি ও সংকোচন শক্তিও কমে যায়।

এই অবস্থাকে হাইপোডিনামিক হৃৎপিণ্ড (**Hypodynamic Heart**) বলে। এই গবেষণা আমাদের জানায় যে, সোডিয়াম কোষের মেমব্রেন পোটেনসিয়েল রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজন।

পোটাসিয়াম ও ক্যালসিয়ামের ভূমিকা : সোডিয়ামের পরিবর্তন না করে পারফিউসন ফ্লুইডে যদি K^+ এবং Ca^+ স্বাভাবিক পরিমাণ থেকে যদি পরিবর্তন করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে স্বাভাবিক স্পন্দন কিছুক্ষণ ধরে চলে তারপর হাইপোডিনামিক হয়ে যায় কিন্তু পরে Ca^+ এবং K^+ এর পরিমাণ ঠিক মাত্রায় রেখে হৃৎপিণ্ডে সঞ্চালন করালে স্পন্দন আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এসে যায়।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে প্লাজমার পটাসিয়ামের মাত্রা যদি ঠিক রাখা যায়, (প্লাজমার স্বাভাবিক পোটাসিয়াম মাত্রা ৪-৫ **mEq** / লিটার) হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের গতি মাত্রা ঠিক থাকে। যদি পোটাসিয়ামের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়া যায় হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের গতিমাত্রা কমে যায় এবং ক্রমশঃ কমতে কমতে ডায়াস্টোল অবস্থায় একেবারে থেমে যায়।

হাইপারক্যালিমিয়া (Hyperkalaemia) :

যখন রক্তে পোটাসিয়াম স্বাভাবিক থেকে বেশি থাকে অর্থাৎ ১০০ মিলিলিটার প্লাজমায় ২৪ মিলিগ্রাম এই অনুপাতের বেশি থাকে তখন স্নায়ু দিয়ে কোন ইমপালস বাহিত হয় না। এই অবস্থাকে **অ্যা-রিফ্লেকসিক প্যারালিসিস** বলে। এই অবস্থা চলতে থাকলে হৃৎপিণ্ড ডায়াস্টোলে বন্ধ হয়ে যায়।

হাইপোক্যালিমিয়া (Hypokalaemia) :

যখন পোটাসিয়ামের মাত্রা ১০০ মিলিলিটার প্লাজমায় ১০ মিলিগ্রাম এই অনুপাতের কম থাকে তখন যে অবস্থা হয় তাকে হাইপো-রিফ্লেকসিক প্যারালিসিস বলা হয় এবং এই অবস্থায় স্নায়ুর উত্তেজনা ও ইমপালস সঞ্চালন করার ক্ষমতা কমে যায়।

কার্ডিয়াক সাইকল (Cardiac Cycle)

হৃৎপিণ্ডে কেমন করে রক্ত চলাচল সম্পাদিত হচ্ছে তা আমরা আগেই জেনেছি। এখন ঐ বিষয়েই বিস্তৃত আলোচনা করা হচ্ছে।

পাল্‌সের একটি বিট বা হৃৎপিণ্ডের একটি বিট মানে একটি কার্ডিয়াক সাইকল। প্রতি মিনিটে ৭৫টি বিট হ'লে একটি কার্ডিয়াক সাইকলের সময় সীমা ৬০ ÷ ৭৫ = ০·৮ সেকেণ্ড। একটি বিট উৎপাদন করতে ঐ ০·৮ সেকেণ্ডের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে যা যা ঘটনা ঘটছে সেই ঘটনাবলীকে এক কথায় **কার্ডিয়াক সাইকল** বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে প্রতি মিনিটে বিটের সংখ্যার উপর কার্ডিয়াক সাইকলের সময় সীমা নির্ভরশীল। কার্ডিয়াক সাইকলের ঘটনাবলী নিম্নে বর্ণিত হইল :

আমরা জানি বদ্ধ রক্তবাহের মধ্যদিয়ে রক্ত চলাচল করে। রক্ত শিরা বাহিত হয়ে অলিন্দ দুটিকে পূর্ণ করে এবং তারা সংকোচনের দ্বারা সেই রক্তকে নিলয় দুটিতে পাঠায়। তারা আবার তাদের রক্ত ধমনীর মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় রক্ত সরবরাহ করে। অলিন্দ ও নিলয় উভয় ক্ষেত্রেই সংকোচনকে সিস্টোল বলা হয় এবং যে সময়ে রক্ত এসে পূর্ণ করে সেই অবস্থাকে ডায়াস্টোল বলা হয়। অলিন্দ, নিলয় উভয় ক্ষেত্রেই সিস্টোল ও ডায়াস্টোল পর পর ঘটতে থাকে সে কারণে কার্ডিয়াক সাইকলকে দুটি পর্বে, অলিন্দ পর্ব ও নিলয় পর্ব, এই দুই পর্বে ভাগ করা হয়েছে।

অলিন্দ পর্ব :

অলিন্দ পর্ব কার্ডিয়াক সাইকলের সূচনা এবং এই পর্বে অলিন্দের সিস্টোল ও ডায়াস্টোল এই দুটি ঘটনা :

অলিন্দের সিস্টোল : অলিন্দ সিস্টোলের সময় সীমা স্বাভাবিক অবস্থায় ০·১ সেকেণ্ড। এই সময়ে দুটি অলিন্দ একই সঙ্গে সংকোচিত হয় যদিও

সংকোচন আগে দক্ষিণ অলিন্দে সূচনা হয়ে থাকে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাম অলিন্দে ছড়িয়ে পড়ে এবং এত কম সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে যে সময়ের তফাৎ কোন কার্য্যকরী বৈষম্য আনে না। প্রথমে দক্ষিণ অলিন্দে সংকোচনের সূচনা হয় কারণ দক্ষিণ অলিন্দে এস-এ নোড থাকে এবং সেখান থেকেই সংকোচন ইমপালস সৃষ্টি হয়ে থাকে। অলিন্দ সংকোচনের দুটি পর্ব আছে—(১) প্রথম পর্ব ও (২) দ্বিতীয় পর্ব :

(১) **প্রথম পর্ব বা ডিনামিক পর্ব :** পূর্ণ সিস্টোলের (০'১ সেকেণ্ড) অর্দ্ধেক অর্থাৎ ০'০৫ সেকেণ্ড এই পর্বের সময় সীমা। এই পর্বে অলিন্দের সংকোচন শক্তি বেশি যার জন্য এই পর্বকে **ডিনামিক পর্ব** বলে।

(২) **দ্বিতীয় পর্ব বা অ্যা-ডিনামিক পর্ব :** অলিন্দ সিস্টোলের দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ শেষ অর্দ্ধাংশ বা শেষ ০'০৫ সেকেণ্ড দ্বিতীয় পর্বের সময় সীমার মধ্যে পড়ে। এই পর্বের সংকোচনে অলিন্দ কোষের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ কোষ অংশ গ্রহণ করে যার জন্য খুব কম রক্ত অর্থাৎ মোট প্রেরিত রক্তের মাত্র ২০ ভাগ এই সময়ে প্রেরিত হয়। এই কারণের জন্য অলিন্দ সিস্টোলের দ্বিতীয় পর্বকে বা দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশকে **অ্যা-ডিনামিক পর্ব** বলে।

অলিন্দের ডায়াস্টোল : অলিন্দ ডায়াস্টোলের প্রথম অর্দ্ধাংশ নিলয় সিস্টোলের সমকালীন। এই সময় এ-ভি কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকে সে কারণে ভেনা কেভা দিয়ে দক্ষিণ অলিন্দে ও ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে রক্ত জমা হতে থাকে। তারপর নিলয়ের ডায়াস্টোলের সময় এবং অলিন্দ ডায়াস্টোলের দ্বিতীয় অর্দ্ধাংশ সময় এই পর্বে পড়ে। অর্থাৎ এই সময় অলিন্দ ও নিলয় উভয়েরই ডায়াস্টোল চলতে থাকে এবং এ-ভি কপাটিকাগুলি খোলা থাকে যার ফলে অলিন্দের প্রায় ৮০ ভাগ রক্ত গড়িয়ে নিলয়ে চলে যায়।

নিলয় পর্ব :

নিলয় পর্ব অলিন্দ পর্বের মতই সিস্টোল ও ডায়াস্টোল এই দুই অংশে বিভক্ত।

নিলয়ের সিস্টোল : নিলয় সিস্টোলের সময় যে ঘটনা ঘটে তাকে দুই প্রধান অংশে বিভক্ত করা হয় যথা (১) আইসোমেট্রিক সংকোচন পর্ব ও নিক্ষেপণ পর্ব (Ejection Phase)।

(১) **আইসোমেট্রিক সংকোচন পর্ব :** এই পর্বের সময় ০·০৫ সেকেণ্ড। এই পর্বকে প্রাক নিক্ষেপণ পর্ব বা নিক্ষপণের প্রস্তুতি পর্ব বলা যেতে পারে। অলিন্দ থেকে রক্ত আসতে থাকায় নিলয়ের মধ্যে রক্তের চাপ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে, এক সময় অলিন্দের থেকে নিলয়ের রক্ত চাপ বেশি হয়ে যায়, যার ফলে এ-ভি কপাটিকাগুলি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায় এবং ঐ বন্ধ হওয়ার দরুন একটা শব্দের সৃষ্টি হয় এবং এই শব্দেই হৃৎপিণ্ডে প্রতিটি কার্ডিয়াক সাইকলে যে চারটি পর পর শব্দের সৃষ্টি হয় এবং যা স্টেথেস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায়, তাদের মধ্যে **প্রথম শব্দ** (**First Sound**) এবং এই প্রথম শব্দ সৃষ্টির অন্যতম কারণ দক্ষিণ এ-ভি কপাটিকাগুলির হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং অলিন্দের মধ্যে কপাটিকাগুলি বেলুনের মত ফুলো (বালজ) হয়ে ঢুকে যাওয়া। এখনও পর্য্যন্ত সেমিলুনার কপাটিকাগুলি বন্ধ থাকে এবং প্রতিটি নিলয় একটি বদ্ধ কক্ষে পরিণত হয়। নিলয় পেশী টান টান হতে থাকার দরুণ ভিতরের রক্তের উপর রক্ত চাপ বাড়তে থাকে এবং নিলয় সিস্টোলের এই পর্বকে আইসোমেট্রিক বা আইসোভলুমিক সংকোচন পর্ব বলে। ক্রমশঃ নিলয় কক্ষে রক্তের চাপ বাড়তে থাকে এবং এক সময় মহাধমনীর রক্ত চাপ থেকে নিলয়ে রক্ত চাপ বেশি হয়ে যায় যার ফলে সেমিলুনার কপাটিকাগুলি খুলে যায় এবং নিক্ষেপণ পর্ব সুরু হয়ে যায়।

(২) **নিক্ষেপণ পর্ব (Ejection Phase) :** নিলয়ের রক্ত চাপ মহাধমনী থেকে বৃদ্ধি পাওয়ায় সেমিলুনার কপাটিকাগুলি খুলে যায় এবং নিলয় সংকোচন করতে থাকে, প্রথমে ধীরে তারপর বেশ জোরে, তারপর আবার ধীরে সংকোচন হতে থাকে। এই পর্ব শেষ হতে, স্বাভাবিক মাত্রায় বিট থাকলে, ০·২৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। সাধারণ অবস্থায় প্রতি বিটে ৭০-৯০ মিলি লিটার রক্ত নিক্ষেপিত হয় এবং নিক্ষেপ করার পর প্রতি নিলয়ে প্রায় ১৫০ মিলিলিটার রক্ত সিস্টোলের বাড়তি বা উৎবৃত্ত থেকে যায় এবং এই পরিমাণ উৎবৃত্ত রক্তকে নিলয় অবশিষ্ট রক্ত (End Systole Ventricular Volume or End Systolic Volume) বলা হয়।

আরও বিস্তারিত ভাবে বোঝার জন্য নিক্ষেপণ পর্বকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয় (i) **ক্ষুদ্রতম নিক্ষেপ পর্ব** (Minimum Ejection Phase) : এই পর্ব মাত্র ০·০২ সেকেণ্ড থাকে এবং অল্প পরিমাণ রক্ত নিক্ষেপিত হয়। (ii) **বৃহত্তম নিক্ষেপ পর্ব :** সংকোচন শক্তি এই সময়ে সর্বাধিক এবং

সংকোচনের সময়ও সর্বাধিক, ০'০৯ সেকেণ্ড। প্রায় ৮০ ভাগ রক্ত এই সময়েই নিক্ষেপিত হয়। (iii) শেষ পর্ব বা **আপেক্ষিক নিক্ষেপ পর্ব :** এই পর্বে অপেক্ষাকৃত কম রক্ত নিক্ষেপিত হয় এবং এর পরই নিলয়ের ডায়াস্টোল শুরু হয়ে যায়। এই পর্বের সময় সীমা ০'১৪ সেকেণ্ড।

নিলয়ের ডায়াস্টোল (Ventricular Diastole) :

নিলয়ের সিস্টোলের পরেই ডায়াস্টোল আরম্ভ হয় এবং এই ডায়াস্টোলকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয় যথা (১) প্রটোডায়াস্টোলিক পর্ব, (২) আইসোমেট্রিক বা আসোভলুমিক পর্ব, (৩) ভর্তি পর্ব।

(১) **প্রটোডায়াস্টোলিক পর্ব :** এই পর্ব ০'০৪ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত চলে। নিলয় সিস্টোলের পরই শিথিল হ'য়ে পড়ে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে নিলয়ের ভিতরের চাপ মহাধমনীর চাপ থেকে কম হয়ে যায়, ফলে রক্ত নিলয়ের দিকে গড়িয়ে আসতে থাকে কিন্তু নিলয়ে প্রবেশ করতে পারে না কারণ গড়িয়ে পড়া রক্ত সেমিলুনার কপাটিকাগুলিকে বন্ধ করে দেয়। এই সেমিলুনার কপাটিকাগুলির বন্ধ হওয়ার সময়, একটা শব্দের উৎপত্তি হয়, যাকে হৃৎপিণ্ডের **দ্বিতীয় শব্দ (Second Sound)** বলা হয়।

(২' **আইসোমেট্রিক বা আইসোভলুমিক পর্ব:** সেমিলুনার কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিলয় গহ্বর একটি বদ্ধ কক্ষে পরিণত হয় কারণ এ-ভি কপাটিকাগুলি এখনও খোলেনি। আইসোমেট্রিক পর্ব ০'০৮ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত চলে এবং ডায়াষ্টোলের এই পর্বকে আইসোমেট্রিক পর্ব বলে।

(৩) **ভর্তি পর্ব :** এর পর নিলয়ের ভিতরের চাপ আরও কমতে থাকে এবং অলিন্দের চাপ থেকে কম হয়ে যায় যার ফলে এভি কপাটিকাগুলি খুলে যায় এবং রক্ত নিলয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। এ-ভি কপাটিকাগুলি খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটি হালকা শব্দের সৃষ্টি হয়, যেমন দরজা খোলার সময় হালকা শব্দ হয়, যাকে হৃৎপিণ্ডের **তৃতীয় শব্দ** (Third Heart Sound) বলা হয়। এর পর নিলয় তাড়াতাড়ি ভর্তি হ'তে থাকে, **দ্রুত ভর্তি পর্ব,** এবং প্রায় ৭০ ভাগ রক্ত নিলয়ে চলে আসে এবং সময় লাগে ০'০৯ সেকেণ্ড। এর পর রক্ত মন্থর গতিতে নিলয়ে পড়তে থাকে এবং ভর্তি হওয়ার এই অংশকে **ধীর গতি পর্ব** (ডায়াস্টোসিস) বলা হয় এবং এই পর্ব ০'১৯ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত চলে এবং মাত্র ১০ ভাগ রক্ত এই সময়ের মধ্যে নিলয় আসে। এর পর **শেষ দ্রুত পর্ব** স্থরু হয়ে

যায় এবং বাকি ২০ ভাগ রক্ত অলিন্দের সংকোচন দ্বারা নিলয়ে আসে এবং এই সময়ই নিলয়ের ডায়াস্টোল ও অলিন্দের সিস্টোল এক সঙ্গে চলতে থাকে। অলিন্দ সংকোচনের সময়ও একটি শব্দ শোনা যায় যাকে হৃৎপিণ্ডের **চতুর্থ শব্দ** বা **অলিন্দ শব্দ** বলা হয়। এই পর্বের সময় সীমা ০.১ সেকেণ্ড। এই পর্বের পর নিলয়ের সিস্টোল আরম্ভ হ'য়ে যায় যা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

কার্ডিয়াক সাইকলের সময় সীমার সংক্ষিপ্তসার :

অলিন্দের সিস্টোল (০.১ সেকেণ্ড)

(১) ডিনামিক পর্ব—০.০৫ সেকেণ্ড

(২) অ্যা-ডিনামিক পর্ব—০.০৫ সেকেণ্ড

অলিন্দের ডায়াস্টোল—০.৭ সেকেণ্ড

নিলয়ের সিস্টোল—০.৩ সেকেণ্ড

(১) আইসোমেট্রিক সংকোচন পর্ব—০.০৫ সেকেণ্ড

(২) ক্ষুদ্রতম নিক্ষেপ পর্ব—০.০২ সেকেণ্ড

(৩) বৃহত্তম নিক্ষেপ পর্ব—০.০৯ সেকেণ্ড

(৪) আপেক্ষিক নিক্ষেপ পর্ব—০.১৪ সেকেণ্ড

নিলয়ের ডায়াস্টোল—০.৫ সেকেণ্ড

(১) প্রটোডায়াস্টোলিক পর্ব—০.০৪ সেকেণ্ড

(২) আইসোমেটিক পর্ব—০.০৮ সেকেণ্ড

(৩) দ্রুত ভর্ত্তি পর্ব—০.০৯ সেকেণ্ড

(৪) ধীর ভর্ত্তি পর্ব—০.১৯ সেকেণ্ড

(৫) শেষ দ্রুত ভর্ত্তি পর্ব—০.১ সেকেণ্ড

(নিলয়ের প্রিসিস্টোল)

হৃদ্ধ্বনির পরিচয় ও ইঙ্গিত :

প্রথম হৃদ্ধ্বনি (First Heart Sonnd) **:** প্রথম হৃদ্ধ্বনির স্থিতিকাল ০.১ – ০.১৭ সেকেণ্ড। এই ধ্বনি **অস্পষ্ট ও দীর্ঘ** এবং স্টেথস্কোপ দ্বারা শুনলে ইংরাজী শব্দ **L-U-B-B** এর মতন শোনায়। ট্রাইকাসপিড কপাটিকাগুলি বন্ধ হওয়ার দরুন এই শব্দ সৃষ্টি হয়। প্রথম হৃদ্ধ্বনি যে ইঙ্গিত বহন করে তা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) নিলয় সংকোচনের সূচনা নির্দেশ করে।

(২) কপাটিকাগুলির কার্যকারিতা ঠিক মত হচ্ছে এবং অলিন্দ-নিলয় দ্বার রুদ্ধ হয়েছে—এই আভাস দেয়।
(৩) ধ্বনির তীব্রতা ও স্থিতিকাল হৃৎপিণ্ড পেশীর শক্তির পরিচয় জ্ঞাপন করে।
(৪) ক্ষীণ ও স্বল্পস্থায়ী শব্দ হৃৎপিণ্ড পেশীর দুর্বলতা জ্ঞাপন করে।

দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি (Second Heart Sound) : দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনির স্থিতিকাল ০'১—০'১৪ সেকেণ্ড। ফুসফুসীয় মহাধমনী ও মহাধমনীর অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলি (Semilunar Valves) রুদ্ধ হওয়ার দরুন এই ধ্বনির উৎপত্তি হয়। এই ধ্বনি **তীক্ষ্ণ ও অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী** এবং এই ধ্বনি ইংরাজী শব্দ DUB বললে যেরূপ শোনা যায় সেইরূপ। দ্বিতীয় হৃদ্‌ধ্বনি যে ইঙ্গিত বহন করে তা এইরূপ :

(১) নিলয় ডায়াস্টোলের সূচনা নির্দেশ করে।
(২) এই ধ্বনি মহাধমনীদ্বয়ের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিকাগুলির দ্বার রুদ্ধ হওয়ার মুহূর্ত নির্দেশ করে এবং স্বক্রিয়তা জ্ঞাপন করে।
(৩) এই ধ্বনির তীব্রতা রক্তচাপের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি (Third Heart Sound) : সুস্থ অবস্থায় শতকরা ৪০ জন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধ্বনি প্রায় শোনাই যায় না। এই ধ্বনির স্থিতিকাল ০'০৪ সেকেণ্ড। নিলয়ের থেকে অলিন্দে রক্তচাপ বৃদ্ধি হলে যখন অলিন্দ-নিলয় দ্বার খুলে যায় তখন হঠাৎ রক্ত বেগে নিলয়ে প্রবেশ কালে যে শব্দ হয় সেই শব্দ তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি সৃষ্টি করে। এই ধ্বনি আমাদের যে ইঙ্গিত দেয় তা নিম্নে দেওয়া হ'ল :

(১) নিলয়ের ডায়াস্টোল নির্দেশ করে এবং উন্মুক্ত অলিন্দ-নিলয় দ্বার এই সংবাদ জানায়।

চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি (Fourth Heart Sound) : খুব অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই শব্দের অস্তিত্ব বোঝা খুবই শক্ত। এই শব্দ অলিন্দের সংকোচনের ঘটনা নির্দেশ করে। এইজন্য এই শব্দকে **অলিন্দ শব্দও** বলা হ'য়ে থাকে।

এপেক্স বিট :

নিলয় দ্বয় যখন সংকোচনের উচ্চ সীমায় থাকে তখন হৃৎপিণ্ড সামনের দিকে ঘুরে যায় যার ফলে হৃৎপিণ্ডের এপেক্স বুকের বাম দিকে ধাক্কা দেয় এবং বাম

দিকের বুকে হাত রেখে এই ধাক্কা অনুভব করা যায়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বাম পঞ্চম ইণ্টারকসটাল স্পেসের উপর ৩২ ইঞ্চি শরীরের মধ্য রেখার বাম দিকে এপেক্স বিট অনুভব করা যায়। যাদের শরীর খুব পাতলা তাদের ক্ষেত্রে এপেক্সের স্পন্দন দেখাও যায়।

এপেক্স বিটের গুরুত্ব ঃ

(১) হৃৎপিণ্ড বড় হ'য়ে গেলে এর অবস্থান দূরে সরে যায়। অতএব এপেক্সের অবস্থান থেকে হৃৎপিণ্ডের আয়তন সম্বন্ধে অনুমান করা যায়।

(২) প্লুরাল ক্যাভিটিতে জল জমলে বা হাওয়া জমলে এর অবস্থান বদলে যায়। বাম দিকে জমলে—ডান দিকে এবং ডান দিকে জমলে বাম দিকে সরে যায়।

(৪) পেরিকার্ডিয়াল গহ্বরে জল জমলে এপেক্স বিট অনুভব করা যায় না।

(৪) ফুসফুসে এমফিসিমা (**Emphysima**) হলেও এপেক্স বিট অনুভব করা যায় না।

হৃৎপিণ্ড স্নায়ু সরবরাহ তত্ত্ব

প্রাক কথন ঃ অন্যান্য ঐচ্ছিক পেশীর মত হৃৎপিণ্ডেও স্নায়ু সরবরাহ থাকে। প্যারাসিমপ্যাথেটিক (ভেগাস—**Vagus**) এবং সিমপ্যাথেটিক উভয়প্রকার স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুই হৃৎপিণ্ডে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে থাকে এবং এদের দ্বারাই হৃৎপিণ্ড পরিসেবিত হয়ে থাকে। তবে ঐচ্ছিক পেশী থেকে হৃৎপিণ্ড পেশীর তফাৎ হ'ল—অন্যান্য পেশীর ক্ষেত্রে স্নায়ু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে পেশীর ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু হৃৎপিণ্ডের বেলায় স্নায়ু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলেও হৃৎপিণ্ড কাজ করতে থাকে, কিন্তু স্পন্দন গতি স্বাভাবিকের (৬০-১০০) থেকে অনেক কমে যায় (৩৫ প্রতি মিনিটে)। স্বভাবতঃ প্রশ্ন জাগে, তবে হৃৎপিণ্ডের স্নায়ু সংযোগের দরকার কেন হয়?

পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে—যাদের স্নায়ু সংযোগ হৃৎপিণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তারা শরীরের জরুরি অবস্থার মোকাবিলা করতে পারে না (ব্যায়াম টেষ্টে সক্ষম হয় না) অথবা শরীরের চাহিদার সঙ্গে রক্ত চলাচলের

সামঞ্জস্য রাখতে সক্ষম হয় না। মনে করুণ আপনি হঠাৎ সামনে সাপ দেখেছেন বা কোন বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন আপনি তখন দ্রুত ধাবিত হয়ে বিপদ এড়াতে সক্ষম হবেন না এবং তার জন্য যে উত্তেজনা হয় তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে যা করণীয় তা শরীর আপনার করতে সক্ষম হয় না কারণ ঐ প্রতিক্রিয়া সামাল দিতে যে শ্রম লাগে ও তার জন্য যে পরিমাণ রক্ত সরবরাহের দরকার সেই অনুপাতে হৃৎপিণ্ড রক্ত সরবরাহে অক্ষম হয়। বিবিধ অবস্থায় জীবনযাত্রা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সকল কোষকে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন পুষ্টি সরবরাহ একান্ত প্রয়োজন আর হৃৎপিণ্ডে স্নায়ু সংযোগ না থাকলে ঐ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয় না তাই হৃৎপিণ্ডে স্নায়ু সংযোগ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পালনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

শরীরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, রক্তে অক্সিজেন ও কার্বন ডায়ক্সাইড-এর আনুপাতিক হার, রক্তচাপের তারতম্য প্রভৃতি বজায় রাখতে এবং শরীরকে কার্য্যক্ষম রাখার জন্য স্নায়ুর কার্য্যকারিতা একান্ত প্রয়োজন কারণ স্নায়ু ঐসব অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে প্রতিবর্তক্রিয়ার (**Reflex action**) মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গতিকে প্রয়োজন মেটাতে বাড়িয়ে দেয় বা কমিয়ে দেয়।

হৃৎপিণ্ডের উপর স্নায়ুর কার্য্যকারিতা বুঝতে হলে আমাদের আগে জানতে হবে স্বাভাবিক অবস্থায় অর্থাৎ যখন হৃৎপিণ্ডে স্নায়ু সংযোগ ঠিক থাকে এবং হৃৎপিণ্ডে কোন রোগ থাকে না তখনকার অবস্থা কিরূপ, তারপর দেখতে হবে স্নায়ু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করলে কি কি অবস্থা দেখা যায়। স্নায়ুকে উত্তেজিত বা দমিত করলে কি হয় ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা স্নায়ুর কার্য্যকারিতা ভালভাবে বোঝা যাবে।

হৃৎপিণ্ডের প্রধান কাজ হল নিয়মিত প্রয়োজন মত স্পন্দিত হওয়া ও রক্ত নিক্ষেপ করা তাই প্রথমেই আমরা হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন গতি নিয়ে নিম্নে আলোচনা করছি :

হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন গতি :

সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় বিশ্রামের পর একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন গতি, প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০-এর মধ্যে থাকে। বয়স অনুযায়ী হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গতি কম-বেশি হয়ে থাকে। মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে, পঞ্চম সপ্তাহ থেকে স্পন্দন গতি শোনা যায়। এই গতি প্রতি মিনিটে ১৪৫ থেকে

১৬০। নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে এই গতি ১৩০ থেকে ১৫০-এর মধ্যে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গতি কমতে থাকে এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের এই গতি কমে ৬০ থেকে ১০০-এর মধ্যে থাকে যা আগেই বলা হয়েছে। বৃদ্ধ বয়সে এই গতি আরও কমে যায়।

উত্তাপ ও ওজনের সহিত হৃৎপিণ্ড স্পন্দন গতির সম্পর্ক :

এটা দেখা গেছে শরীরের উত্তাপের সঙ্গে স্পন্দন গতি সম্পর্কযুক্ত—বেশি উত্তাপে স্পন্দন বাড়ে আবার কম উত্তাপ থাকলে স্পন্দন কমে যায়। সাধারণভাবে প্রতি ডিগ্রি উত্তাপ বৃদ্ধিতে প্রায় ১০টি স্পন্দন স্বাভাবিক থেকে বেশি হয়।

ওজনের সঙ্গেও স্পন্দন গতি সম্পর্কযুক্ত—ওজন যত বেশি হবে তত স্পন্দন গতি কম হবে। হাতীর ওজন খুব বেশি। এদের হৃৎপিণ্ডের গতি সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ২৫ বার। ওজন কম হ'লে গতি বাড়ে। পক্ষীর (canary) বেলায় মিনিটে ১০০০, ইঁদুরের বেলায় ৩০০ থেকে ৪০০ এবং খরগোসের বেলায় ২৫০টি বিট প্রতি মিনিটে।

মানুষের মধ্যে ক্রিড়াবিদ ও মল্লদের হৃৎপিণ্ডের গতি অপেক্ষাকৃত কম হয়ে থাকে।

এখন আমরা হৃৎপিণ্ডের গতির উপর স্নায়ুর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করব। আগেই আমরা জেনেছি ভেগাস নার্ভ (প্যারাসিমপ্যাথেটিক) ও সিমপ্যাথেটিক নার্ভ এই দুই বিপরীত ধর্মী নার্ভ হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এখন আগে আমরা দেখব ভেগাস ও সিমপ্যাথেটিক নার্ভ কেমন ক'রে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে :

ভেগাস নার্ভ (প্যারাসিমপ্যাথেটিক) :

ভেগাস একটি মিশ্র নার্ভ এবং একে দশম করোটিক নার্ভও বলা হয়ে থাকে। এই নার্ভের কার্ডিয়াক শাখা হৃৎপিণ্ডকে চেষ্টীয় (Motor) ও সংজ্ঞাবহ (sensory) উভয় প্রকার তন্তু দ্বারা সরবরাহ করে থাকে।

চেষ্টিয় তন্তু (Motor fibres) : ভেগাসের চেষ্টীয় তন্তুগুলি মেডালা অবলংগাটার (Medulla oblongata) অঙ্ক তলের পার্শ্ব দেশে অবস্থিত ডরশ্যাল নিউক্লিয়াস (Dorsal Nucleus) থেকে উৎপত্তি হয় এবং এই চেষ্টীয় নার্ভতন্তু-গুলি সিমপ্যাথেটিক নার্ভ তন্তুর সহিত মিলিত হয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি জালকের সৃষ্টি করে যাকে **কার্ডিয়াক প্লেকসাস** বলে এবং এই জালকের

মাধ্যমে চেষ্টীয় নার্ভ বিভব (motor impulse) সরবরাহ করে থাকে। ঐ তন্তুগুলি প্রিগ্যাংগ্লিয়নিক তন্তু এবং হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত গ্যাংগ্লিয়নে শেষ হয় এবং শাখা দ্বারা হৃৎপিণ্ডকে সরবরাহ করে। যে শাখাগুলি হৃৎপিণ্ডকে সরবরাহ করে তাদের পোষ্টগ্যাংগ্লিয়নিক তন্তু বলে।

ভেগাসের সংজ্ঞাবহ নার্ভতন্তু : এই নার্ভতন্তুর প্রান্ত দেশে জটিল গঠনের জ্ঞানেন্দ্রিয় (Receptor) থাকে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি হৃৎপিণ্ড এবং হৃৎপিণ্ডের সংযুক্ত বৃহৎ রক্তবাহগুলির উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে এবং এরা ঐসব অঙ্গ গহ্বরের রক্ত চাপ কমা-বাড়ার সংজ্ঞা বহন করে নিয়ে সেণ্টারে পৌছে দেয় অর্থাৎ ভেগাসের ডরাশ্বল নিউক্লিয়াসে শেয় হয়। রক্ত চাপ বৃদ্ধি পেলে বা কমে গেলে ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি উত্তেজিত হয় এবং প্রতিবর্তক্রিয়ার (Reflex action) মাধ্যমে গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং রক্তচাপের সমতা রক্ষা করে।
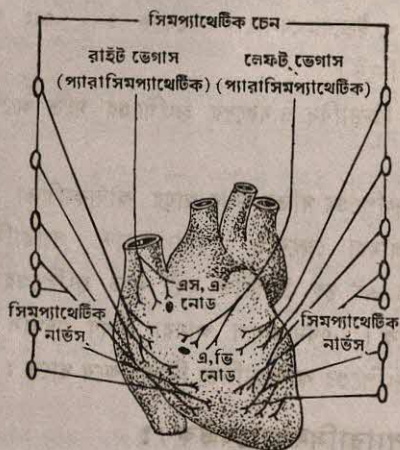
হৃৎপিণ্ডে নার্ভ সরবরাহ
(সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক)

সিমপ্যাথেটিক নার্ভ :

ভেগাস নার্ভের মত সিমপ্যাথেটিক নার্ভেরও চেষ্টীয় ও সংজ্ঞাবহ তন্তু থাকে এবং সুষুম্না কাণ্ডের অন্য নার্ভের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং ঐ সুষুম্না নার্ভের সঙ্গেই এদের প্রিগ্যাংগ্লিনিক তন্তু শুরুতে সুষুম্না কাণ্ড থেকে বাহিরে আসে।

সিমপ্যাথেটিক চেষ্টিয় কার্ডিয়াক নার্ভ : সিমপ্যাথেটিক চেষ্টীয় কার্ডিয়াক নার্ভের উৎপত্তি কেন্দ্রীয় সুষুম্না কাণ্ডের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও

কখনও কখনও পঞ্চম সুষুম্না বৃত্তাংশের (segment) পার্শ্বীয় কোষগুচ্ছ (Lateral horn cell) থেকে উৎপত্তি হয়। এগুলিকে প্রিগ্যাংগ্লিয়নিক তন্তু বলা হয়। এরা সরাসরি হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে না। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বাহিরে অবস্থিত সিমপ্যাথেটিক গ্যাংগ্লিয়নে (Sympathetic ganglion) শেষ হয়। এই সিমপ্যাথেটিক প্রিগ্যাংগ্লিয়নিক নার্ভগুলি প্রথম চার-পাঁচটি বক্ষীয় সিমপ্যাথেটিক নার্ভ গ্যাংগ্লিয়নে ও গলার সিমপ্যাথেটিক নার্ভ গ্যাংগ্লিয়নে শেষ হর। সেখান থেকে নূতন তন্তু উঠে, যাদের পোষ্টগ্যাংগ্লিয়নিক তন্তু বলে। যারা হৃৎপিণ্ডকে সরবরাহ করে।

সিমপ্যাথেটিকের সংজ্ঞাবহ নার্ভতন্তু : সিমপ্যাথেটিকের সংজ্ঞাবহ নার্ভ তন্তুগুলির কোন প্রান্তীয় অঙ্গ সজ্জা থাকে না। এদের প্রান্তগুলি মুক্তাগ্র অবস্থায় থাকে এবং মহাশিরা ও মহাধমনীর বাহিরের স্তরে (Tunica Adventitia) ও হৃৎপিণ্ডের সংযোগ কলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। এরা একই রাস্তা দিয়ে অর্থাৎ যে রাস্তা দিয়ে সুষুম্না নার্ভের সংজ্ঞাবহ নার্ভ তন্তু সুষুম্না কাণ্ডে যায় সেই রাস্তা দিয়ে সুষুম্না নার্ভের ডরশ্যাল রুটে যে গ্যাংগ্লিয়ন থাকে সেখানে শেষ হয় এবং তারপর গ্যাংগ্লিয়ন থেকে কেন্দ্রীয় শাখার মাধ্যমে প্রথম চার-পাঁচটি সুষুম্না সেগমেন্টে শেষ হয়।

এই নার্ভতন্তুগুলি হৃৎপিণ্ড থেকে ব্যাথা বেদনাকে কেন্দ্রীয় নার্ভ কেন্দ্রে বহে নিয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করায় এবং ব্যাথা বেদনা সাধারণতঃ বাম বাহু ও উপবাহু দিয়ে কড়ে আঙ্গুলের দিকে ধাবিত হয়।

ভেগাস ও সিমপ্যাথেটিকের উপর গবেষণামূলক তথ্য

ভেগাসের উপর গবেষণামূলক তথ্য :

যদি দুটি ভেগাস নার্ভেরই হৃৎপিণ্ডের সহিত শাখা সংযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় বা $\frac{১}{১৫}$ গ্রেন অ্যাট্রপিন ইন্‌জেকসন করে ভেগাসের ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্তব্ধ করে দেওয়া যায় তা হ'লে দেখা যাবে হৃৎপিণ্ডের গতি প্রতি মিনিটে অত্যন্ত দ্রুত হয়ে যায় (১৫০-১৮০)। আমরা জানি আমাদের হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় ৬০ থেকে ১০০ বার স্পন্দিত হয়ে থাকে। এই থেকে বোঝা যাচ্ছে ভেগাস নার্ভ হৃৎপিণ্ডের উপর ক্রিয়া করে এর স্পন্দনকে স্বাভাবিক মাত্রায় রাখে। বেশি বার স্পন্দন হওয়া মানে বেশি কাজ করা এবং যথেষ্ট বিশ্রামের

অভাবে বেশি কাজ করার দরুন তাড়াতাড়ি দুর্বল হয়ে যাওয়া যা হৃৎপিণ্ডের ও শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। তাই এটা বোঝা যাচ্ছে যে ভেগাস নার্ভ, হৃৎপিণ্ড গতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে হৃৎপিণ্ডের উপর শক্তিদায়ক (**Tonic effect**) হিসাবে কাজ করে। হৃৎপিণ্ডের উপর ভেগাসের কার্য্যকারিতা বোঝানর জন্য নিম্নে বর্ণিত চারটি গ্রীক শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে :

(১) নেগেটিভ ক্রনোট্রপিক (**—V Chronotropic**) কার্য্য :
হৃৎপিণ্ড গতিকে কমিয়ে দেয়।

(২) নেগেটিভ আইনোট্রপিক (**—V Inotropic**) কার্য্য :
হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শক্তিকে কমিয়ে দেয়।

(৩) নেগেটিভ বাতমোট্রপিক (**—V Bathmotropic**) কার্য্য :
হৃৎপিণ্ড পেশীর উত্তেজিত হওয়ার শক্তিকে কমিয়ে দেয়।

(৪) নেগেটিভ ড্রমোট্রপিক (**—V Dromotropic**) কার্য্য :
হৃৎপিণ্ডের বিভব **Impulse**) সংবহন শক্তিকে কমিয়ে দেয়।

এক কথায় হৃৎপিণ্ডের উপর ভেগাস নার্ভের কার্য্য—বলবর্দ্ধক বা শক্তিদায়ক।

সিমপ্যাথেটিকের উপর গবেষণামূলক তথ্য :

যখন দুটি ভেগাস নার্ভই অক্ষত অবস্থায় থাকে তখন যে সমস্ত সিমপ্যাথেটিক গ্যাংগ্লিয়া হৃৎপিণ্ডে পোষ্টগ্যাংগ্লিয়নিক তন্তু সরবরাহ করে (প্রথম চারটি বা পাঁচটি বক্ষীয় সীমপ্যাথেটিক গ্যাংগ্লিয়া এবং ইন্‌ফিরিয়র ও মিডল গলার সিমপ্যাথেটিক গ্যাংগ্লিয়া) সেগুলিকে নষ্ট করে দিলে দেখা যায় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গতি কমে প্রতি মিনিটে ৪০-এ এসে দাঁড়ায়। যদি আগে ভেগাস নার্ভ দুটিকে কেটে পরে সিমপ্যাথেটিক গ্যাংগ্লিয়াগুলি নষ্ট করা যায় তা হ'লে দেখা যাবে হৃৎপিণ্ডের গতি আরও কমে যায়। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের উপর সিমপ্যাথেটিক নার্ভের ক্রিয়াও বলবর্দ্ধক। অতএব সিমপ্যাথেটিকের কার্য্য হ'ল (১) পজিটিভ ক্রনোট্রপিক, (২) পজিটিভ আইনোট্রপিক, (৩) পজিটিভ বাতমোট্রপিক ও (৪) পজিটিভ ড্রমোট্রপিক।

অতএব উপরিউক্ত গবেষণা লব্ধ জ্ঞান আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে ভেগাস ও সিমপ্যাথেটিক উভয় নার্ভই হৃৎপিণ্ডের পক্ষে বলবর্দ্ধক। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে দেখতে গেলে ভেগাস নার্ভই বেশি শক্তি বর্দ্ধক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এই দুটি নার্ভ দু-রকমে হৃৎপিণ্ডে শক্তি বর্দ্ধক রূপে কাজ করে থাকে। ভেগাস

নার্ভ হৃৎপিণ্ডের গতি, সংকোচন শক্তি, হৃৎপিণ্ড পেশীর উত্তেজনা শক্তি এবং হৃৎপিণ্ড পেশীর বিভব সংবহন শক্তিকে কমিয়ে হৃৎপিণ্ডকে বেশি বিশ্রাম দিয়ে হৃৎপিণ্ডের বলবর্দ্ধক নার্ভ রূপে কাজ করে। অন্য দিকে সিমপ্যাথেটিক হৃৎপিণ্ডের দরকার মত গতিকে বাড়িয়ে, সংকোচন শক্তিকে বাড়িয়ে, উত্তেজিত হওয়ার শক্তিকে বাড়িয়ে এবং হৃৎপিণ্ডে ইমপাল্‌স সংবহন শক্তিকে বাড়িয়ে হৃৎপিণ্ডের বলবর্দ্ধক নার্ভরূপে কাজ করে।

ভেগাস এসকেপ (Vagus Escape) :

ভেগাস এসকেপ বলতে সাধারণ ভাবে এই বোঝা যায় যে 'ভেগাসের হাত থেকে নিষ্কৃতি' বা একটু ব্যাপক চিন্তা করে বলা যায় 'ভেগাসের পুনঃপুনঃ আঘাতে মৃতপ্রায় হয়েও বেঁচে ওঠা।'

ব্যাপারটা, ভেগাসের উপর আরও একটি গবেষণা লব্ধ তথ্য। গবেষণায় দেখা গেছে ভেগাস নার্ভকে যদি ক্রমাগত পর পর উত্তেজিত করা যায় —হৃৎপিণ্ডের গতি কমতে কমতে এমন একটা সময় আসে যখন হৃৎপিণ্ড ডায়াস্টোলে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে হৃৎপিণ্ড আবার স্পন্দিত হচ্ছে দেখা যায়। ভেগাসের ক্রিয়াকে উপেক্ষা করে পুনরায় হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের এই আবির্ভাবকে 'ভেগাস এসকেপ' আক্ষা দেওয়া হয়।

ভেগাস এসকেপের কারণ : সঠিক কারণ প্রমাণিত না হওয়ার জন্য এই কারণ সম্বন্ধে 'নানা মুনির নানা মত' প্রচলিত রয়েছে।

কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলেন—ডায়াস্টোলের সময় হৃৎপিণ্ড বন্ধ হওয়ার দরুণ ডান দিকের হৃৎপিণ্ডে রক্ত চাপাধিক্য বশতঃ হৃৎপিণ্ড পেশী উত্তেজিত হয় এবং এই কারণেই হৃৎপিণ্ড আবার সংকোচিত হতে থাকে।

আর এক মত হ'ল ডায়াস্টোলে হৃৎপিণ্ড বন্ধ হওয়ার দরুণ উচ্চ নার্ভ সেণ্টার-গুলি রক্ত সরবরাহ থেকে বঞ্চিত থাকে যার ফলে তারা খুবই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে এবং এর জন্য নার্ভ বিভব (**Impulse**) উৎপন্ন হয় এবং সেই ইমপাল্‌স হৃৎপিণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তার করে যার ফলে হৃৎপিণ্ড আবার সংকোচিত হ'তে থাকে।

উপরিউক্ত মতামত মানা খুবই কঠিন কারণ নার্ভ ইমপাল্‌স প্রভাবে হৃৎপিণ্ড সংকোচিত হলে অলিন্দ ও নিলয় উভয় প্রকোষ্ঠেরই সংকোচন হ'তে হবে কিন্তু ট্রেসিং দ্বারা দেখা গেছে কেবল মাত্র নিলয় দুটিই সংকোচিত-প্রসারিত হ'তে

থাকে। এটি ভেন্ট্রিকলের বা নিলয়ের ইডিওভেন্ট্রিকুলার রিথম যার গতি প্রতি মিনিটে ২০ থেকে ৪০। কিছু পরে হৃৎপিণ্ড গতি বাড়তে দেখা যায় যার কারণ সিমপ্যাথিটিকের আধিপত্য ও ভেগাসের উপর উত্তেজনা প্রদান বন্ধ থাকে।

হৃৎপিণ্ডে নার্ভ কেমন করে কাজ করে :

অটো লুই (Otto Loui) ১৯২১ সালে গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছিলেন যে হৃৎপিণ্ডে নার্ভ সরাসরি কাজ করে না। নার্ভকে উত্তেজিত করলে কোন রাসায়নিক বস্তু নির্গত হয় যার মাধ্যমে নার্ভ হৃৎপিণ্ড পেশীকে কার্য্য (সংকোচন) করিয়ে থাকে। তিনি দেখিয়েছিলেন উত্তেজিত হৃৎপিণ্ড পেশীর নির্যাস অন্য অসংকোচিত হৃৎপিণ্ডে ঢেলে দিলে সেই হৃৎপিণ্ড সংকোচিত হতে থাকে।

পরে আমরা জেনেছি যে প্যারাসিমপ্যাথেটিক (ভেগাস) নার্ভকে উত্তেজিত করলে যে রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয় সেই রাসায়নিক পদার্থ হ'ল—অ্যাসিটিল-কোলিন (Acetyl choline) এবং সিমপ্যাথেটিক নার্ভকে উত্তেজিত করলে রাসায়নিক পদার্থটি হ'ল এড্রিনেলিন (catecholamine) এই এড্রিনেলিন β—রিসেপটরের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) অনুসরণ করে কাজ করে থাকে।

এটা ধারণা করা হয় যে হৃৎপিণ্ডের উপর ভেগাস নার্ভের যে ক্রিয়া, যা আমরা আগেই জেনেছি, সেই চার রকমের নার্ভতন্তু থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত সেই চার রকমের নার্ভতন্তু আলাদা ভাবে গবেষণা দ্বারা চিহ্নিত করতে পারা যায় নাই যদিও ব্রুলারের নির্দিষ্ট নার্ভ শক্তি (Bruler's Law of Specific Nerve Energy) সূত্র আমাদের জানায় যে প্রতিটি নার্ভতন্তু একটি বিশেষ কার্যের জন্য নির্দিষ্ট।

হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Cardiac reflexes)

হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex action) : এটি একটি সাংগঠনিক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন গতি নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে থাকে। অন্যান্য প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতই হৃৎপিণ্ডের বেলায়ও এই প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় দুটি নার্ভ পথ ও একটি সেণ্টার থাকে যার সঙ্গে ঐ পথ দুটি সংযুক্ত থাকে। দুটি পথের মধ্যে একটি বহির্মুখী (Efferent) পথ ও একটি অন্তর্মুখী (Afferent) পথ। অন্তর্মুখী পথটি সংজ্ঞা বহন ক'রে সেণ্টারে নিয়ে যায় এবং সেণ্টার থেকে নার্ভ ইমপাল্স অঙ্গে এসে তার ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে।

হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়া বোঝার জন্য আমাদের জানতে হবে হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সেণ্টার কোথায় কোথায় আছে এবং বিভিন্ন সংজ্ঞা জ্ঞাপক ইমপাল্স কিরূপ প্রতিক্রিয়া কোথা থেকে কি কি পথ ধরে সেণ্টারে আসতে পারে এবং বহির্মুখী বিভবের (**Impulse**) পথ কি ?

হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সেণ্টার

হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সেণ্টার কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত আছে। পুরমস্তিস্ক (**forebrain**), হাইপোথ্যালামাস (**Hypothalamus**) মেডালা অবলংগাটা, (**Medulla oblongata**) এবং সুষুম্না কাণ্ডে এই সেণ্টারগুলি অবস্থিত আছে। এই সেণ্টারগুলির মধ্যে মেডালার সেণ্টারই সর্বপ্রধান, যার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপ বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সংক্ষেপে সেণ্টারগুলির পরিচয় ও অবস্থিতি প্রদান করা হ'ল।

কর্টিকাল (Cortical) : এই সেণ্টার পুরমস্তিষ্কের এরিয়া-১৩ অংশে অবস্থিত। মস্তিষ্কের এই অংশকে উত্তেজিত করলে হৃৎপিণ্ডের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির পরিবর্তন হ'তে দেখা যায়।

হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) : হাইপোথ্যালামাসের মধ্যবর্তি অংশকে উত্তেজিত করলে হৃৎপিণ্ড গতি কম হয়ে যায় অর্থাৎ এই অংশকে ভেগাসের উচ্চতর সেণ্টার বলা হয়। অনুরূপ ভাবে হাইপোথ্যালামাসের পশ্চাতের অংশকে উত্তেজিত করলে হৃৎপিণ্ড গতি বৃদ্ধি পায়। এই অংশকে সিমপ্যাথেটিকের উচ্চতর গতি সেণ্টার বলা হয়।

মেডালারি সেণ্টার (Medullary centre) : হৃৎপিণ্ড গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মেডালারি সেণ্টারই প্রধান। মেডালার পশ্চাৎ দিকে চতুর্থ মগজ গহ্বরের (**Fourth ventricle of brain**) নিচের দিকে ভেগাস নার্ভের ডরশ্যাল নিউক্লিয়াসে এই সেণ্টার অবস্থিত। এই সেণ্টারে দুইটি অংশ আছে, একটি মগজের মধ্য রেখার কাছাকাছি এবং অন্যটি ঐ অংশেরই বাহিরের দিকে। যে অংশটি মধ্য রেখার কাছাকাছি থাকে তাকে **কার্ডিওইনহিবিটরি** (**cardioinhibitory**) সেণ্টার বলে। এই সেণ্টারকে উত্তেজিত করলে হৃৎপিণ্ড গতি কমে যায়। এই কার্ডিওইনহিবিটরি সেণ্টারের বাহিরের দিকে যে অন্য সেণ্টারটি থাকে তাকে **কার্ডিওঅ্যাকসিলেটরি সেণ্টার** বলে। এই সেণ্টারকে উত্তেজিত করলে হৃৎপিণ্ড গতি বেড়ে যায়। বহু সংজ্ঞা জ্ঞাপক উত্তেজনা বহুস্থান

থেকে এই সেণ্টারে আসে যাদের মোকাবেলায় এই সেণ্টার কার্য্যকারী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এবং চেষ্টীয় কার্ডিয়াক নার্ভের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনগতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সুষুম্না কাণ্ডে অবস্থিত কার্ডিয়াক সেণ্টার (Spinal cardiac centre) : এই সেণ্টার বক্ষীয় সুষুম্না কাণ্ডের (Thoracic Spinal cord) এক থেকে পঞ্চম বৃত্তাংশের (1—5 spinal segment) ল্যাটারাল কোষ স্তম্ভে (Lateral horn cell column) অবস্থিত। এই সেণ্টারকে উত্তেজিত করলে হৃৎপিণ্ড গতি বৃদ্ধি পায় (সিমপ্যাথেটিক প্রতিক্রিয়া)

হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী নার্ভ (Afferent and efferent nerves of cardiac reflex) :

হৃৎপিণ্ড প্যারাসিমপ্যাথেটি নার্ভের বেলায় প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অন্তর্মুখী নার্ভে প্রান্তীয় জ্ঞানেন্দ্রিয় (receptor) গুলি হৃৎপিণ্ডের উপর, হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত মহাধমনী ও মহাশিরার উপর, কমন ক্যারটিড ধমনীর বিভাজনের স্থানে, ক্যারটিড সাইনাস ও ক্যারটিড বডির উপর, অ্যায়োটিক আর্চ, অ্যায়োটিক বডি ও কার্ডিয়াক পেশীর উপর অবস্থিত থাকে। এ ছাড়া করনারী ধমনী, সাব-ক্লেভিয়ান ধমনীর উৎপত্তিস্থলে, মেসেনটেরিক ও ফুসফুসীয় রক্তবাহের গায়ে অবস্থিত থাকে। রিসেপ্টারের মাধ্যমে সংজ্ঞা গ্রহণের পর ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই) সেণ্টারে পৌছায়। ক্যারটিড সাইনাস ও ক্যারটিড বডি থেকে গ্লসোফেরিনজিয়েল নার্ভের মাধ্যমে সেণ্টারে যায়।

সিমপ্যাথেটিকের বেলায় সংজ্ঞা জ্ঞাপক নার্ভগুলির কোন প্রান্তীয় অঙ্গসজ্জা থাকে না, প্রান্তাগ্রগুলি মুক্ত থাকে। এই মুক্ত প্রান্তগুলি ব্যাথা-বেদনার সংজ্ঞা হৃৎপিণ্ড থেকে সিমপ্যাথেটিক সেণ্টারে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে বহির্মুখী নার্ভ তন্তুর মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে এসে তার স্পন্দনকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যেহেতু বক্ষীয় ও উদরের অঙ্গগুলির নিজস্ব কোন অনুভূতি থাকে না, এই সমস্ত অঙ্গের কোন ত্রুটি হলে আমরা যে ব্যাথা বেদনা অনুভব করি তা সিমপ্যাথেটিক নার্ভের সুষুম্না নার্ভের সংযোগ থাকার দরুণ ঐ-সুষুম্না নার্ভের মাধ্যমে তাদের প্রান্তীয় অঙ্গসজ্জার বিস্তৃতি যেখানে যেখানে আছে সেখানে সেখানে ব্যাথা অনুভূত হয়। নিম্নে বিভিন্ন রক্তবাহ থেকে এবং সরাসরি হৃৎপিণ্ড থেকে যে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সংযোজনা আছে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে :

রক্তবাহ ও রক্তবাহ সংযুক্ত অঙ্গের প্রতিবর্ত ক্রিয়া

রক্তবাহের মাধ্যমে এবং রক্তবাহ সংযুক্ত বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য স্বয়ংক্রিয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া দুই ভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে। রক্ত চাপের গতি প্রকৃতির উপর এক রকমের প্রতিবর্ত ক্রিয়া রয়েছে যাকে **রক্তবাহ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Vascular reflexes)** বলে। অন্য ব্যবস্থাপনায় রক্তের রাসায়নিক গঠনের তারতম্যের হাত থেকে শরীরকে রক্ষা করার জন্য যে রক্ষা কবজের মত বন্দোবস্ত আছে সেরকম প্রতিবর্ত ক্রিয়াও রয়েছে। যেখানে যে অঙ্গে এদের রিসেপটার থাকে সেই অনুযায়ী এই রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটিত প্রতিবর্ত ক্রিয়ার নাম করণ করা হয়েছে যেমন **ক্যারটিড** ও **অ্যায়টিক বডি প্রতিবর্ত ক্রিয়া**। রক্তবাহ সংযুক্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়া যা রয়েছে তা হ'ল **ক্যারটিড সাইনাস** ও **অ্যায়টিক সাইনাস প্রতিবর্ত ক্রিয়া** নামে পরিচিত।

ক্যারটিড সাইনাস প্রতিবর্তক্রিয়া (Carotid sinus reflex)

এই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎপত্তি স্থান ক্যারটিড সাইনাস এবং এই জন্যই এই প্রতিবর্ত ক্রিয়া ক্যারটিড সাইনাস প্রতিবর্ত ক্রিয়া নামে পরিচিত। কমন ক্যারটিড ধমনী গলার মাঝামাঝি লেভেলে মধ্য রেখার দুই পাশে কমন ক্যারটিড ধমনীতে এক্সটারনাল ও ইণ্টারনাল এই ধমনীতে বিভক্ত হয়। উৎপত্তির পরই ইণ্টারনাল ক্যারটিড ধমনীর প্রথম কিয়দংশের দেওয়াল কিছু স্ফীত দেখা যায়। ইণ্টারনাল ক্যারটিড ধমনীর এই স্ফীত অংশকে **ক্যারটিড সাইনাস** বলা হয়।

ইণ্টারনাল ক্যারটিড ধমনীর দেওয়াল এই অংশে কেন স্ফীত হল তা বুঝতে হ'লে এই অংশের গঠন কিরূপ তা জানা দরকার। আমরা জানি প্রতিটি ধমনীর তিনটি প্রধান স্তর আছে এবং বাহির দিক থেকে ভিতরের দিকে এই স্তরগুলি যথাক্রমে টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়া, টিউনিকা মিডিয়া ও টিউনিকা ইনটিমা। ক্যারটিড সাইনাসের বেলায় এই গঠন প্রকৃতির কিছু তারতম্য দেখা যায়। ক্যারটিড সাইনাসের টিউনিকা মিডিয়া অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়া অপেক্ষাকৃত পুরু। টিউনিকা ইণ্টিমার কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। এই ক্যারটিড সাইনাস অংশ প্রচুরভাবে সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক (গ্লোসেফেরিনজিয়েল) নার্ভতন্তুর দ্বারা পরিসেবিত থাকে। প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভতন্তু গ্লোসেফেরিনজিয়েল নার্ভের একটি শাখা এবং এই

শাখার নাম **সাইনাস নার্ভ**। এই সাইনাস নার্ভ ক্যারটিড সাইনাসের টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়ায় বিভাজিত হয়ে খুব সূক্ষ্ম তন্তুতে পরিণত হয় এবং প্রতিটি তন্তুর প্রান্ত দেশে এক রকমের রিসেপটার সংযুক্ত থাকে এবং রিসেপটার গুলি রক্ত চাপের আধিক্য অনাধিক্যের সংকেত বহন করে।

সিস্টোলের সময় যখন ক্যারটিড সাইনাসের দেওয়াল স্ফীত হয় তখন সাইনাস নার্ভের প্রান্তীয় অঙ্গগুলি উত্তেজিত হয় এবং রক্তের চাপ কেমন আছে সে বিষয়ে নার্ভ ইমপাল্‌স মেডালায় অবস্থিত কার্ডিয়াক সেণ্টারে বহন করে নিয়ে যায়। সেণ্টার থেকে প্রয়োজনীয় বহির্মুখী নার্ভ ইমপাল্‌স হৃৎপিণ্ডে এসে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকে নিয়ন্ত্রিত রাখে।

রক্তের চাপ যদি বৃদ্ধি থাকে সে ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক সেণ্টার থেকে ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে যে ইমপাল্‌স প্রেরিত হয় তার দ্বারা হৃৎপিণ্ডের গতি কমে যায়, ব্রাডিকার্ডিয়া (**Bradycardia**) এবং কার্ডিয়াক আউপুটও কমে যায়। রক্তের চাপের কম-বেশির ভিত্তিতে সাইনাস নার্ভের প্রান্তীয় রিসেপটারগুলি উত্তেজিত হয় সে কারণে এই রিসেপটারগুলিকে **প্রেসর রিসেপটর** বা **ব্যারোসেপটর** বলা হয়।

যখন রক্ত চাপের কোন তারতম্য হয় না তখন কাডিয়াক আউটপুটেরও কোন তারতম্য হয় না এবং এই চাপের খবরা-খবরই, কম, বেশি, স্বাভাবিক এই রিসেপটারগুলির মাধ্যমে ক্রমাগত প্রবাহিত হ'তে থাকে। পাল্‌স চাপের তারতম্য হ'লে বুঝতে হবে রক্ত চাপের ও পাল্‌স্ গতির তারতম্য রয়েছে।

অ্যায়োটিক সাইনাস প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঃ

অ্যায়োটিক সাইনাস প্রতিবর্ত ক্রিয়া ক্যারটিড সাইনাস প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মত। তফাৎ হচ্ছে এখানকার অন্তর্মুখী নার্ভ ভেগাসের একটি শাখা এবং এই নার্ভকে **অ্যায়োটিক নার্ভ** বলে। এই নার্ভ অ্যায়োটিক গোলার্ধকে (**Aortic arch**) এবং গোলার্ধ থেকে যে বৃহৎ ধমনীগুলি (ব্রেকিওসেফালিক, লেফট কমন ক্যারটিড ও লেফট সাবক্লেভিয়ান) ওঠে তাদের গোড়ার অংশের টিউনিকা অ্যাডভেনটিশিয়ার যোগাযোগ কলা স্তরের মধ্যে ঘোরান সিড়ির মত পেঁচিয়ে থাকে এবং এদের সূক্ষ্ম শাখার প্রান্ত দেশে এক প্রকার স্ফীত অঙ্গের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। রিসেপটারগুলি অ্যায়োটাতে রক্তচাপের তারতম্যে উত্তেজিত হয়ে অন্তর্মুখী নার্ভ ইমপাল্‌স ভেগাসের মাধ্যমে মেডালা অবলংগাটায় কার্ডিয়াক সেণ্টারে নিয়ে যায়

এবং সেখান থেকে বহির্মুখী নার্ভ ইমপাল্‌স (Motor Impulse) হৃৎপিণ্ডে এসে হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। অ্যায়োটাতে রক্ত চাপবৃদ্ধি হলে, রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ড গতি কমিয়ে দেয় এবং ভ্যাসোমটর সেণ্টারের মাধ্যমে শরীরে অন্য রক্তবাহ গুলিকে প্রসারিত করে রক্তচাপ কমিয়ে দেয়। অনুরূপভাবে অ্যায়োটাতে রক্তচাপ কমে গেলে ঐ ভ্যাসোমটর সেণ্টারের মাধ্যমে ক্ষুদ্র রক্তবাহগুলিকে সংকোচিত করিয়ে দেয় যার ফলে রক্তচাপ বৃদ্ধিপায় এবং হৃৎপিণ্ড গতি বেড়ে যেতেও সহায়তা করে।

ক্যারটিড ও অ্যায়োটিক বডি প্রতিবর্ত ক্রিয়া :

ক্যারটিড বডি : ক্যারটিড বডি একটি ক্ষুদ্র ডিম্বাকার অঙ্গ যার দৈর্ঘ্য ৫-৭ মিলিমিটার, প্রস্থ ৪ মিলিমিটার-এর কিছু কম এবং ২ মিলিগ্রাম ওজন। এই অঙ্গ কমন ক্যারটিড ধমনীর পশ্চাতে বিভাজনের ঠিক আগে অবস্থিত। ইহার গঠন প্রকৃতি বৈচিত্রপূর্ণ এবং আকারে এবং ওজনে অঙ্গটি ক্ষুদ্র হইলেও এর মধ্যে প্রচুর সাইনুসয়ডের মত রক্তবাহ থাকে এবং এর ভিতর দিয়ে প্রতি মিনিটে দুই লিটার (প্রতি ১০০ গ্রাম ওজনের অনুপাতে) রক্ত চলাচল করে থাকে, সে কারণেই এটি একটি রক্ত সমৃদ্ধ অঙ্গ। এই অঙ্গটির গঠনকারী কোষগুলি ইপিথিলিয়ামের মত (Epitheloid) দেখতে। কোষগুলি ছোট ছোট স্তবকে (lobule) সংঘটিত এবং এই স্তবকগুলি হালকা যোগ কলার (Areolar tissue) সাহায্যে সঙ্গবদ্ধ।

এই কোষগুলিকে **গ্লোমাস কোষ** বলা হয়। প্রতিটি কোষে বিশেষ ধরণের এড্রিনেলিন দানার মত দানা পাওয়া যায়। এই দানাগুলি বর্তনানে ক্রমাফিল দানা বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং এরা ক্রমাফিন লবণ গঠিত রঞ্জকে রঞ্জিত হয়ে থাকে যা কেবলমাত্র ইলেকট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়। সিমপ্যাথেটিক ও প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভতন্তু প্রচুর পরিমাণে কোষের ফাঁকে ফাঁকে ও সাইনু-সয়ডের এণ্ডোথিলিয়ামের নিচে পাওয়া যায়। প্রতিটি অন্তর্মুখী নার্ভ (Sensory nerve) এর প্রান্তে বিশেষ ধরনের কোন রিসেপটার থাকে না। এই নার্ভতন্তু গুলি, রক্তের গঠনে বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হলে, যেমন রক্তে যদি অক্সিজেন স্বল্পতা, কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রাধিক্য অথবা pH এর তারতম্য ঘটে, উত্তেজিত হয় এবং এই বার্তা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে কার্ডিয়াক সেণ্টারে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয় যা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হচ্ছে :

রাসায়নিক প্রতিবর্ত ক্রিয়া : যে সব ক্ষেত্রে অক্সিজেন পরিপৃক্তি (saturation) স্বাভাবিক (৯০%) থেকে কমতে কমতে (৮০%) এর নিচে চলে যায় তখনই কেমোরিসেপটারগুলি (ক্যারটিড বডির ক্ষেত্রে গ্লসোফেরিনজিয়েল নার্ভ শাখার সঙ্গে যুক্ত) উত্তেজিত হয় এবং অন্তর্মুখী নার্ভ
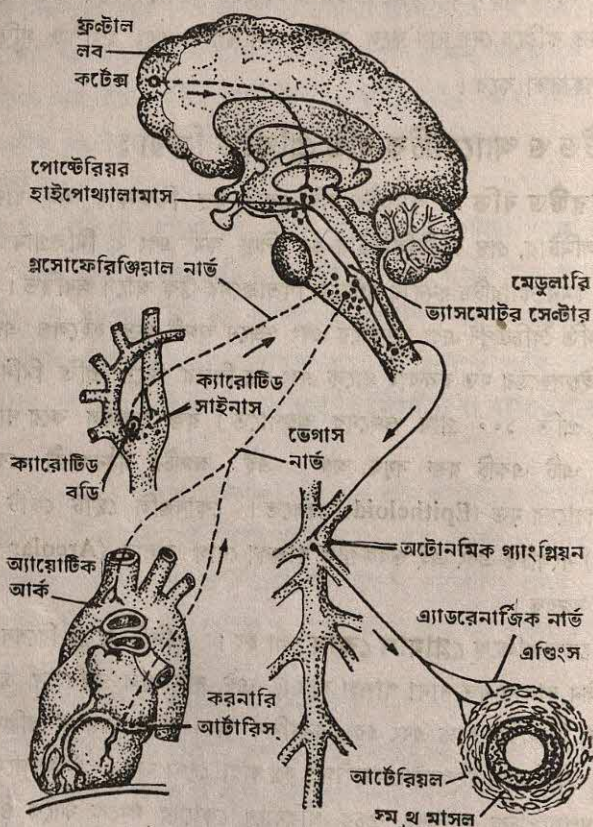
ক্যারোটিড সাইনাস ও অ্যায়োর্টিক নার্ভ প্রতিবর্তক্রিয়ার পথ ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নার্ভ সেন্টার।

ইমপাল্‌সের সৃষ্টি হয় এবং গ্লসোফেরিনজিয়েল নার্ভের মাধ্যমে সেই ইমপালস কার্ডিয়াক সেণ্টারে পৌঁছে দেয়। এর পর কার্ডিয়াক সেণ্টার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যায়, হৃৎপিণ্ড গতিও বেড়ে যায়।

যদি অক্সিজেন পরিপৃক্তি বেশি হয় সে ক্ষেত্রে কেমোরিসেপটারগুলি উত্তেজিত হয় না এবং কোন তথ্য সেণ্টারে যায় না।

সে সমস্ত ক্ষেত্রে কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর পীড়ন (tension) ৩৫ মিঃ মিঃ এইচ জি (35 mm Hg)-এর উর্দ্ধে চলে যায় বিশেষ কেমোরিসেপটারগুলি উত্তেজিত হয় এবং সেই মত নার্ভ ইমপাল্স কার্ডিয়াক সেণ্টারে যায় এবং সেখান থেকে শ্বাস-প্রশ্বাস ও রক্তচাপ সেণ্টারের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড গতি, শ্বাস-প্রশ্বাস গতি, ও রক্তচাপ বেড়ে যায়।

অ্যায়োর্টিক বডি প্রতিবর্ত ক্রিয়া : অ্যায়োটিক বডি বা গ্লোমাস অ্যায়োটিকাম মহা ধমনী গোলার্দ্ধের দেওয়ালে অবস্থিত থাকে। এর গঠন ক্যারটিড বডির মত এবং এর কেমোরিসেপটারগুলি ক্যারটিড বডির মতই কাজ করে থাকে কিন্তু অ্যায়োটিক বডির অন্তর্মুখী নার্ভ ইমপালস ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে কার্ডিয়াক সেণ্টারে যায়। ক্যারটিড বডির মত এই কেমোরিসেপটারগুলি রক্তে অক্সিজেন স্বল্পতা, কার্বনডাইঅক্সাইড এবং পি, এইচ (pH) এর আধিক্য কার্ডিয়াক সেণ্টারে খবরাখবর পাঠায় এবং কার্ডিয়াক সেণ্টার হৃৎপিণ্ড ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

অন্যান্য রক্তবাহের প্রতিবর্ত ক্রিয়া

ফুসফুসীয় রক্তবাহ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Pulmonary Vascular reflex) **:** ফুসফুসীয় রক্তবাহে রক্তচাপ বৃদ্ধি পাইলে হৃৎপিণ্ড গতি কমে যায় ও রক্তচাপও কমে যায়। এই প্রতিক্রিয়া ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এটা ধারণা করা হয় যে ধামনিক জালক ও শিরানু জালকের সংযোগ স্থলে ভেগাসের রিসেপটারগুলি থাকে। কোন কোন ঔষধের ক্রিয়া দ্বারাও হৃৎপিণ্ড গতি ও রক্তচাপ কমে যায়। এই প্রকারের প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে ফুসফুসীয় দমিত প্রতিবর্ত ক্রিয়া (**Pulmonary depressor reflex**) বলা হয় এবং এই প্রতিক্রিয়া ভেগাস নার্ভ ছেদন করলে হয় না।

করনারী রক্তবাহ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Coronary Reflexes) **:** করনারী থ্রমবোসিস রোগ যখন হঠাৎ করে কোন ব্যক্তিকে আক্রমণ করে, দেখা যায় তার হৃৎপিণ্ড গতি ও রক্তচাপ খুব কমে যায়, পাল্স অনুভবই করা যায় না, রক্তচাপ মাপাই যায় না। হঠাৎ করে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হওয়ার দরুন হৃৎপিণ্ড পেশীতে যে অক্সিজেনের অভাব হয় তার জন্যই এই প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে।

বেড়াল বা কুকুরদের ভেরাট্রিন নামক ঔষধ বাম করনারী ধমনীতে ইনজেকসন করলে ঐ প্রকার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়, কিন্তু ভেগাস নার্ভ কেটে দিলে আর ঐ রকম প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না। দক্ষিণ করনারী ধমনীতে ইনজেকসন করলে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় না। এর থেকে মনে হয় বাম নিলয়ে এই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার রিসেপটারগুলি থাকে এবং বাম করনারী ধমনীর উপর সজ্জিত থাকে। এই প্রকার প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে বেজল্ড-যারিস-রিফ্লেক্স (**Bezold Jaresh reflex**) বলা হয়।

মেসেনটেরিক রক্তবাহ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Mesenteric Vascular reflex) ঃ

পেটের মেসেনটেরিক ধমনীকে সাঁড়াসী দ্বারা চেপে ধরলে বা মেসেনটেরিক ধমনীতে হঠাৎ করে রক্তচাপ বৃদ্ধি পেলে উপরিউক্ত প্রকার প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড গতি ও রক্তচাপ কম হয়ে যায় এবং এই প্রতিক্রিয়াও ভেগাস নার্ভের মাধ্যমে ঘটে থাকে।

হৃৎপিণ্ড থেকে সরাসরি প্রতিবর্ত ক্রিয়া

হৃৎপিণ্ড দেওয়াল থেকে সরাসরি ভেগাসের রিসেপটারের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়াও অনুষ্ঠিত হতে পারে। এই ক্রিয়া দক্ষিণ দিকের ও বাম দিকের হৃৎপিণ্ড থেকে আলাদা ভাবে হতে পারে।

দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়া ঃ দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়া দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয় থেকে অন্তর্মুখী নার্ভইমপাল্‌স ভেগাসের মাধ্যমে কার্ডিয়াক সেন্টারে নিয়ে যায়। যে নার্ভ দক্ষিণ অলিন্দ থেকে নার্ভ ইমপাল্‌স নিয়ে যায় তাকে দক্ষিণ অলিন্দ নার্ভ (**Right auricaler nerve**) বলে। এই দক্ষিণ অলিন্দ নার্ভের অনুশাখা প্রান্তে দুই রকমের রিসেপটার পাওয়া যায়, (১) টাইপ-এ (২) টাইপ-বি। অলিন্দ সংকোচনের সময় টাইপ-এ রিসেপটার-গুলি উত্তেজিত হয় এবং ডায়াস্টোলের সময় যখন অলিন্দ শিথিল অবস্থায় থাকে তখন টাইপ-বি রিসেপটারগুলি উত্তেজিত হয়।

গবেষণা মাধ্যমে জানা গেছে—তরল পদার্থ যথা নরম্যাল স্যালাইন বা সম জাতীয় তরল পদার্থ দক্ষিণ অলিন্দে প্রবেশ করিয়ে চাপ বৃদ্ধি করালে হৃৎপিণ্ড গতি ও রক্তচাপ কমে যায় কিন্তু ভেগাস নার্ভ আগে থাকতে কেটে দিলে এই

প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। যদি আগে অ্যাট্রপিন ইন্‌জেকসন করা যায়, ভেগাস নার্ভ কেটে দিলে হৃৎপিণ্ড গতি কমে না, কিন্তু রক্ত চাপের সমান প্রতিক্রিয়া থেকে যায় অর্থাৎ দক্ষিণ অলিন্দে জলীয় চাপ বাড়লে রক্তচাপ কম হ'য়ে যায়।

দক্ষিণ নিলয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া : দক্ষিণ নিলয়ে জলীয় চাপ বৃদ্ধি করালে হাইপারটেনসন ও ব্রাডিকার্ডিয়া হ'তে দেখা যায় এবং অনুমান করা হয় যে দক্ষিণ নিলয়েও ভেগাসের রিসেপটার থাকে।

বাম হৃৎপিণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়া : নার্ভ সহ হৃৎপিণ্ড ফুসফুস (**Heart-Lung preparation with nerves**) একত্রে উপরিউক্ত রূপে জলীয় চাপ বৃদ্ধি করালে একই রকম ফল পাওয়া যায় যথা ব্রাডিকার্ডিয়া ও হাইপারটেনসন।

অন্যান্য বিবিধ প্রতিবর্ত ক্রিয়া

ব্রেনব্রিজ প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Brainbridge Reflex) : ১৯১৫ সালে ব্রেনব্রিজ গবেষণার দ্বারা দেখিয়েছিলেন যে দক্ষিণ অলিন্দে স্যালাইন ইন্‌জেকসন করে জলীয় চাপ বৃদ্ধি করালে হৃৎপিণ্ড গতি বৃদ্ধি পায় এবং যদি ভেগাস নার্ভকে কেটে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যায় যে দক্ষিণ অলিন্দে এই জলীয় চাপ বৃদ্ধি সত্ত্বেও হৃৎপিণ্ড গতি কমে যায়, এই প্রতিবর্ত ক্রিয়াকে **ব্রেনব্রিজ রিফ্লেক্স** বলা হয়।

ব্রেনব্রিজ রিফ্লেক্সের কারণ : দক্ষিণ অলিন্দে জলীয় চাপ বাড়লে অলিন্দ নার্ভ রিসেপটারগুলি উত্তেজিত হয় এবং অন্তর্মুখী নার্ভ ইমপাল্‌স সৃষ্টি হয়ে মেডালার কার্ডিওঅ্যাকসিলেটরি সেণ্টারে নিয়ে যায় এবং বহির্মুখী নার্ভ ইমপাল্‌স সিমপ্যাথেটিকের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে গতি বাড়িয়ে দেয়।

ব্রেনব্রিজ রিফ্লেক্সের বিতর্কমূলক বিষয় : গবেষণায় দেখা গেছে হঠাৎ করে জলীয় চাপ যদি অতিরিক্ত বাড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হ'য়ে হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। রক্তচাপ বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অধ্যাপক নোল (**Prof. Nole**) গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন—দক্ষিণ অলিন্দে জলীয় চাপ বাড়াবার আগে যদি হৃৎপিণ্ড গতি কম থাকে তবেই সেই সব ক্ষেত্রে জলীয় চাপ দক্ষিণ অলিন্দে বাড়ালে হৃৎপিণ্ড গতি বৃদ্ধি পায়। হৃৎপিণ্ড গতি আগে বৃদ্ধি অবস্থায় থাকলে, চাপ বৃদ্ধি করালে, কোন ফল পাওয়া যায় না। ডিহাইড্রেসনের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড গতি খুব বেশি থাকে এবং এই অবস্থায় শিরার মাধ্যমে স্যালাইন ইন্‌জেকসন করলে হৃৎপিণ্ড গতি বাড়ে না বরং কমে যায়। এখানেই ব্রেনব্রিজ রিফ্লেক্স সূত্রের গরমিল দেখা যায়।

ব্যারোসেপটার রিফ্লেক্স ও বাফার নার্ভ: সাইনাস নার্ভ ও অ্যায়োটিক নার্ভের মাধ্যমে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ড গতি নিয়ন্ত্রিত থাকে তা আগেই আমরা জেনেছি। এখন আমরা কিছু গবেষণার বিষয় আলোচনা করব:

সাইনাস নার্ভকে কেটে দিয়ে দেখা গেছে এই কাটা দুই প্রান্তের মধ্যে যদি নিচের প্রান্তটিকে অর্থাৎ টিস্থর সঙ্গে যেটি যুক্ত, উত্তেজিত করলে রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ড গতির কোন পরিবর্তন দেখা যায় না কিন্তু যদি উপরের প্রান্তটিতে উত্তেজনা দেওয়া যায় তা হলে দেখা যাবে যে রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ড গতি কমে যাচ্ছে। অ্যায়োটিক নার্ভের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বনে একই ফল পাওয়া যায়। যখন দুটি নার্ভই কেটে দেওয়া হয় তখন হৃৎপিণ্ড গতি বেড়ে যেতে দেখা যায় এবং প্রতি মিনিটে ১৬০ গতি মাত্রা হয়ে যায়।

উপরিউক্ত কারণে **সাইনাস নার্ভ ও অ্যায়োটিক নার্ভকে বাফার নার্ভ** বলা হয়, কারণ এরা রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ড গতি স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ন্ত্রিত রাখে।

নীরোগ অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের গতি প্রকৃতি

নীরোগ থাকা কালে শরীরের নানা অবস্থায় হৃৎপিণ্ড গতি কেমন থাকে তার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা নিম্নে করা হচ্ছে:

ব্যায়াম ও নানান উদ্যোগে: ব্যায়াম, ছুটোছুটি, উপর-নিচু যাতায়াত ও হাঁটা-হাঁটি করলে হৃৎপিণ্ড গতি বৃদ্ধি পায় এটা প্রায় সকলেরই জানা আছে। কেন হৃৎপিণ্ড গতি বাড়ে তার কারণ হল—টিস্থতে অক্সিজেনের চাহিদা বেশি, রক্তে সাময়িক ভাবে অক্সিজেন স্বল্পতা ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য, H^+ আয়নের আধিক্য, উত্তাপ (বিপাকীয়) বৃদ্ধি, এড্রিনেলিনের ক্ষরণ বৃদ্ধি এবং হৃৎপিণ্ডে, শিরার মাধ্যমে বেশি রক্তের আগমন।

আদর্শ ব্যায়াম পরীক্ষার মান (Standard exercise test) অনুসারে হৃৎপিণ্ড গতি ব্যায়ামের শেষে ২ মিনিট পরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে হবে। হৃৎপিণ্ড গতির তারতম্যের এই ব্যায়াম পরীক্ষাকে **ব্যায়াম সহন সীমা** (Tolerance test) পরীক্ষা বলা হয়। এই পরীক্ষার আগে হৃৎপিণ্ড গতির মাত্রা দেখে রাখতে হবে। তারপর ব্যায়াম বন্ধ করার ২ মিনিট পরে হৃৎপিণ্ড গতি মাত্রা দেখে নিতে হবে।

খাদ্য গ্রহণের পর ঃ খাদ্য গ্রহণের পর বেশ কিছুক্ষণ হৃৎপিণ্ড গতি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

শরীরের আয়তন ঃ খুব বড় শরীর হ'লে হৃৎপিণ্ড গতি কম হ'য়ে থাকে, আবার যাদের শরীরের আয়তন কম তাদের গতি বেশি হ'য়ে থাকে।

স্ত্রী ও পুরুষ ঃ মেয়েদের হৃৎপিণ্ড গতি পুরুষদের থেকে বেশি।

বয়স ঃ বয়সের সঙ্গে হৃৎপিণ্ড গতির সম্বন্ধ আছে। জন্মাবার পর থেকে হৃৎপিণ্ড গতি ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ক্রীড়াবীদের হৃৎপিণ্ড গতি সাধারণতঃ কম থাকে।

বায়ুর চাপ ঃ বায়ুর চাপ কম থাকলে, যেমন অতি উচ্চে, হৃৎপিণ্ড গতি বৃদ্ধি পায়, আবার ডুবুরীদের ক্ষেত্রে চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে হৃপিণ্ডের গতি কমে যায়।

দেহের অবস্থান অনুযায়ী ঃ দাঁড়িয়ে থাকলে, শোয়া ও বসা অবস্থার থেকে হৃৎপিণ্ড গতি বেশি হয়।

নিদ্রা অবস্থায় ঃ গভীর নিদ্রা অবস্থায় হৃৎপিণ্ড গতি বেশ কমে যায় কিন্তু বিঘ্নিত নিদ্রায় বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।

আবেগ ও চিত্ত চাঞ্চল্যে ঃ রাগে, উত্তেজনায়, দুঃচিন্তায়, হৃৎপিণ্ড গতি ও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় কিন্তু শোক, দুঃখ ও ভয়ে হৃৎপিণ্ড গতি কমে যায় এবং সাথে সাথে রক্তচাপও কমে যায়।

বিপাকীয় ক্রিয়া বৃদ্ধিতে ঃ শরীরে বিপাকীয় ক্রিয়া বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড গতি সমতালে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

গবেষণার চক্ষে হৃৎপিণ্ডের গতি

অক্সিজেন স্বল্পতায় ঃ আগেই বলা হয়েছে রক্তে অক্সিজেন পরিপৃক্তি (Concentration) কম থাকলে কেমোরিসেপটারের মাধ্যমে সাইনাস নার্ভ ও অ্যায়োটিক নার্ভের পথ ধরে কার্ডিয়াক সেণ্টারকে অক্সিজেন স্বল্পতার কথা জানায় এবং কার্ডিওঅ্যাকসেলেটরী সেণ্টার বহুমুখী নার্ভ বিভব (impulse) দ্বারা হৃৎপিণ্ড গতিকে বাড়িয়ে দেয়। আমরা জানি রক্তে স্বাভাবিক অবস্থায় অক্সিজেন পরিপৃক্তি ৯৬% থাকে এবং এই স্তর ৮০ বা তার নিচে চলে গেলে কেমোরিসেপটারগুলি উত্তেজিত হয়ে থাকে। উচ্চ গিরি শিখরে উঠলে (১০,০০০ ফুট উর্দ্ধে) অক্সিজেন স্বল্পতা ও বায়ুর চাপ উভয়ই কমে যায়, যার ফলে হৃৎপিণ্ড গতিও বেড়ে যায়।

কার্বনডাইঅক্সাইড বৃদ্ধিতে : কার্বনডাইঅক্সাইড বৃদ্ধিতে উপরি উক্ত উপায়ে হৃৎপিণ্ড গতি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

এইচ$^+$ আয়ন বৃদ্ধিতে : এইচ$^+$ আয়নের পরিপূক্তি রক্তে বাড়লে ঐ একই উপায়ে হৃৎপিণ্ড গতি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

কার্ডিয়াক নার্ভকে উত্তেজিত করলে : ভেগাসকে উত্তেজিত করলে গতি কমে যায় এবং **সিমপ্যাথেটিককে** উত্তেজিত করলে হৃৎপিণ্ড গতি বেড়ে যায়।

ম্যারিজ ল (Marey's Law) : গবেষণা করে ম্যারিজ একটি সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং সূত্রের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছিলেন যে রক্তচাপ বৃদ্ধি হ'লেই হৃৎপিণ্ড গতি কমে যাবে এবং রক্ত চাপও কমে যাবে। ক্যারটিড ও অ্যায়োটিক নার্ভের রিসেপটার গুলি এই বর্দ্ধিত চাপে উত্তেজিত হ'য়ে মেডালেতে কার্ডিয়াক ও ভ্যাসোমটর সেণ্টারে অন্তর্মুখী নার্ভ বিভব নিয়ে যায় এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড গতি ও রক্ত চাপ কমিয়ে দেয়।

এড্রিনেলিন ইন্‌জেকসন : এড্রিনেলিন ইন্‌জেকসন করলে সিমপ্যাথেটিকের নার্ভ প্রান্তগুলি উত্তেজিত হয়ে হৃৎপিণ্ড গতি বাড়িয়ে দেয়। এই ইন্‌জেকসনের ফলে রক্ত চাপও বৃদ্ধি পায় এবং ম্যারিজ-ল অনুযায়ী আবার হৃৎপিণ্ড গতি ও রক্ত চাপ কমে যায়।

নরএড্রিনেলিন : নরএড্রিনেলিন ইন্‌জেকসনে ঐ উপরিউক্ত প্রকার একই প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়।

পসটিরিয়র পিটুইটারি ইন্‌জেকসনে : এই ইন্‌জেকসন দিলেও রক্তচাপ বৃদ্ধি পায় যার প্রতিক্রিয়ায় আবার হৃৎপিণ্ড গতিও কমে যায় এবং কিছু পরে রক্ত চাপও কমে যায়।

রোগে হৃৎপিণ্ড গতির তারতম্য

কোন কোন রোগে হৃৎপিণ্ড গতি বেড়ে যায়, আবার কোন কোন রোগে হৃৎপিণ্ড গতি কমে যায়।

যে-সব রোগে হৃৎপিণ্ড গতি বেড়ে যায় :

(১) থাইরোটক্সিকোসিস (Thyrotoxicosis)

(২) কনজেসটিভ কার্ডিরাক ফেলিওর (Congestive cardiac failure)

(৩) কনসষ্ট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিস (**Constrictive pericarditis**)
(৪) মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কসন (**Myocardial Infarction**)
(৫) অ্যানিমিয়া (**Anaemia**)
(৬) বেশির ভাগ জ্বরের ক্ষেত্রে (টাইফয়েড রোগের প্রথম অবস্থা ছাড়া) (**All fevers except the carly stage of Typhoid Fever**)
(৭) শকে ও শরীরে জলের অভাবে (**In Shock and Dehydration**)।
(৮) অরিকুলার ফিব্রিলেসন (**Auricular Fibrillation**)
(৯) অরিকুলার ফ্লাটার (**Auricular Flutter**)
(১০) রক্তপাতে (**In Haemorrhage**)।

যে-সব রোগে হৃৎপিণ্ড গতি কমে যায় ঃ

(১) মিক্সিডিমা (**Myxoedema**)।
(২) হার্ট ব্লক (**Heart Block**)।
(৩) পিলোকারপিন, অ্যাসিটিল কোলিন, ও সিমপ্যাথেটিক ব্লকিং ঔষধ প্রয়োগে (ইন্‌জেকসন) (**Injection of Pilocarpine, Acetyl choline and Sympathetic blocking agents**)।
(৪) করোটির মধ্যে উচ্চচাপ সৃষ্টি হলে (**In increased intracranial pressure**)।
(৫) **সিনকোপাল অ্যাটাকে** (Syncopal attack)। ভেগাসের মাত্রাধিক্য প্রভাবের জন্য হৃৎপিণ্ড গতি খুবই কমে যায় এবং মগজে রক্তের চাপ কমের জন্য এই আক্রমণ হ'য়ে থাকে।
(৬) **ভাইরাস আক্রমণে ও টাইফয়েড জ্বরের প্রথম দিকে** অন্য জ্বরের তুলনায় হৃৎপিণ্ড গ'তি কম হতে দেখা যায়।

হৃৎপিণ্ডের সঞ্চিত শক্তি (Cardiac Reserve)

হৃৎপিণ্ডের সঞ্চিত শক্তি কতটা আছে এবং প্রতিকূল অবস্থায় হৃৎপিণ্ড সেই অবস্থাকে কতটা সামাল দিতে পারে সেই অবস্থা পর্য্যালোচনা করে তবেই

হৃৎপিণ্ডে সঞ্চিত শক্তি সম্বন্ধে হদিস পাওয়া যাবে। ঐ শক্তি বুঝতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করতে হবে :

হৃৎপিণ্ড গতি (Heart rate) : আমরা জানি স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৬০—১০০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হয়। শরীর নীরোগ থাকলে, দরকার অনুযায়ী, হৃৎপিণ্ড গতি ১৩০—১৪০ বার পর্য্যন্ত হওয়া উচিত। গবেষণায় দেখা গেছে যে হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ২১০ বার পর্য্যন্ত স্পন্দিত হ'তে পারে।

সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক ভলিউম : আমরা জানি নিলয়ের ধারণ শক্তি (Capacity) ১৫০—১৭০ মিলিলিটার এবং এর মধ্যে মাত্র ৫০—৭০ মিলিলিটার রক্ত প্রতি স্পন্দনে (Systole)-এ নিক্ষিপ্ত হয় কিন্তু দরকার হ'লে ৮০—১০০ মিলিলিটার পর্য্যন্ত রক্ত নিক্ষেপ করার (Stroke volume) শক্তি হৃৎপিণ্ডের আছে। আমরা আরও জানি প্রতি মিনিটে হৃৎপিণ্ড ৩৫ লিটার পর্য্যন্ত রক্ত নিক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড মাত্র ৫ লিটার রক্ত প্রতি মিনিটে নিক্ষেপ করে থাকে। অতএব হৃৎপিণ্ডের প্রতি মিনিটে বাড়তি ৩০ লিটার রক্ত নিক্ষেপ করার ক্ষমতা হৃৎপিণ্ডের সঞ্চিত শক্তি।

(৩) **শরীরে অক্সিজেন সঞ্চয় :** আমাদের জানা আছে, আমাদের শরীরে ৫ লিটার থেকে ৫½ লিটার রক্ত থাকে। আরও আমরা জানি শিরার রক্তে ১৫—১৬ মিলিলিটার অক্সিজেন থাকে। অতএব আমাদের শরীরে অক্সিজেন সঞ্চয় হচ্ছে ৯০০ মিলি লিটার। শরীরের অক্সিজেন কখনই সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়ে শেষ হয়ে যায় না। ব্যায়াম বা অনুরূপ কঠিন কায়িক শ্রমে মাত্র ১৪—১৬% ভলিউম ব্যবহৃত হয় যাতে করে ৩০০০ মিলিলিটার প্রতি মিনিটে খরচ হ'তে পারে এবং ২৭০০ মিলিলিটার অক্সিজেজেন প্রতি মিনিটে উৎবৃত্ত সঞ্চয় থেকে যায়।

(৪) **কার্ডিয়াক ওয়ার্ক :** বিশ্রামের পর ৫—৬ কেজি ওজন বয়ে নিয়ে যেতে নিলয় যতটা কাজ করতে পারে দরকারের সময় বাম নিলয় ৮০ কেজি ওজন এক মিটার পথ বহে নিয়ে যেতে পারার শক্তি ধারণ করতে পারা চাই। অতএব বাম নিলয়ে সঞ্চিত শক্তি ৭৪—৭৫ কেজি এক মিটার বহন করার মত কাজের শক্তির সমান।

করনারী ধমনী (হৃৎপিণ্ডের ধমনী)

হৃৎপিণ্ড একটি পেশী গঠিত পাম্প, যার সাহায্যে অক্সিজেন ও পুষ্টি রক্তের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড শরীরের সমস্ত কোষকে সরবরাহ করে থাকে এবং নিজ শরীরের পুষ্টি ও অক্সিজেন, দুইটি করনারী ধমনী যথা বাম ও দক্ষিণ করনারী ধমনী, সরবরাহ করে থাকে।

উভয় ধমনীই উর্দ্ধমুখী মহাধমনীর (**Ascending Aorta**) উৎস মুখের দুই মিলিমিটার উপর থেকে উৎপত্তি হয় এবং এই দুই করনারী ধমনীই উর্দ্ধমুখী মহাধমনীর প্রথম ও শেষ শাখা। দক্ষিণ করনারী ধমনী সম্মুখ অ্যায়োটিক সাইনাস থেকে এবং বাম করনারী ধমনী বাম পশ্চাৎ আয়োটিক সাইনাস থেকে উৎপত্তি হয়।

প্রতিটি করনারী ধমনী গতি পথে পর পর কিছু শাখা এপিকার্ডিয়ামে দেয় এবং তারপর ঐ শাখাগুলির উপশাখা হৃৎপিণ্ড পেশী বিদীর্ণ করে পেশীর গভীরে চলে যায়। ধমনী দুটি প্রচুর ভাবে সংজ্ঞাজ্ঞাপক (**Sensory**) ও চেষ্টিয় (**Motor**) উভয় প্রকার স্বয়ংক্রিয় নার্ভ তন্তু দ্বারা সেবিত হয়ে থাকে।

ব্যারলডি (**Baroldi**) ও স্কোমাযনির (**Scomazioni—1967**) মতে উৎপত্তি মুখে বাম করনারী ধমনীর গড় ব্যাস ৪ মিলিমিটার এবং দক্ষিণ করনারী ধমনীর ব্যাস ৩·২ মিলিমিটার। শতকরা ৬০ ভাগ হৃৎপিণ্ডে বাম করনারী ধমনীর ব্যাস বড়। মাত্র ১৭ ভাগ ক্ষেত্রে ডান করনারী ধমনীর ব্যাস বড় এবং শতকরা ২৩ জনের ক্ষেত্রে উভয় ধমনীর ব্যাসই সমান।

বাম করনারী ধমনী : বাম করনারী ধমনী বাম পশ্চাৎ অ্যায়োটিক সাইনাস থেকে উৎপত্তির পর ফুসফুসীয় মহাধমনী ও বাম অরিকিউল-এ মাঝখান দিয়ে অল্প সামনের দিকে এগিয়ে যায় তারপর বাম দিকে ঘুরে করনারী খাঁজে (**Coronary sulcus**) চলে যায় এবং পশ্চাৎ ইণ্টারভেনট্রিকুলার খাঁজ (**Inter ventricular groove-posterior**) পর্য্যন্ত গিয়ে দক্ষিণ করনারী ধমনীর সঙ্গে মিলে বরাবর (**anastomosis**) হয়ে শেষ হয়ে যায়। বাম করনারী ধমনী শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে হৃৎপিণ্ডকে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে। এর প্রধান শাখা-প্রশাখাগুলি নিম্নে বিবৃত হইল :

(১) **অ্যাণ্টিরিয়র ইণ্টারভেনট্রিকুলার শাখা :** (**Anterior Interventricular branch**) বাম নিলয়কে, দক্ষিণ নিলয়কে আংশিকভাবে ও ইণ্টারভেনট্রিকুলার সেপ্টামের বেশি অংশকে রক্ত সরবরাহ করে।

(২) **সারকামফ্লেক্স শাখা** (Circumflex branch) : এই শাখা একটি (i) **মারজিনাল** (Marginal branch) উপশাখা দেয় যেটি বাম দিকটিকে রক্ত সরবরাহ করে। (ii) **অ্যানটিরিয়র ভেনট্রিকুলার শাখা** (Anterior ventricular branch)—বাম নিলয়ের সামনের দিককে রক্ত সরবরাহ করে। (iii) **পসটিরিয়র ভেনট্রিকুলার শাখা** (Posterior

সামনে দিক থেকে হৃৎপিণ্ড সহ মহাধমনী ও শিরা যেমন দেখা যায়
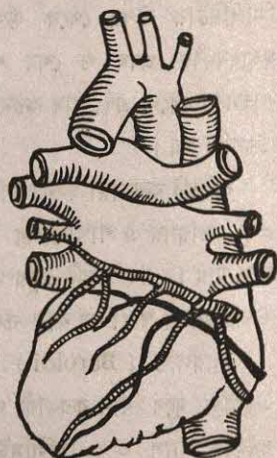
পিছন দিক থেকে হৃৎপিণ্ড সহ মহাধমনী ও শিরা যেমন দেখা যায়

ventricular branch)—বাম নিলয়ের পশ্চাৎ দিকটিতে ছড়িয়ে পরে। (iv) **বাম পসটিরিয়র ইন্টারভেনট্রিকুলার শাখা** (Left posterior interventricular branch)—উভয় নিলয়কেই এবং ইন্টারভেনট্রিকুলার সেপটামকে রক্ত সরবরাহ করে। (v) **অ্যাট্রিয়েল শাখা** (Atrial branch)—বাম অলিন্দকে রক্ত সরবরাহ করে। (vi) **সাইনু-অ্যাট্রিয়েল নোডাল শাখা** (Sinue-atrial nodel branch)—সাইনু-অ্যাট্রিয়েল নোডকে রক্ত সরবরাহ করে। (vii) **অ্যাট্রিওভেনট্রিকুলার নোডাল শাখা** (Artery to the atrioventriculr node)—ঐ নোডের জন্য রক্ত সরবরাহ করে। এ ছাড়া বাম করনারী ধমনীর একটি শাখা। (viii) **কুয়েলের অ্যানাসটোমোটিক শাখা** (Kuyel's anastomotic artery)—ইন্টারঅ্যাট্রিয়েল সেপ্টামের অল্প

অংশকে রক্ত সরবরাহ করে। বাম করনারী ধমনী শুরুর পরই একটি খুব ছোট শাখা দেয় যাকে (ix) **বাম কোনাস ধমনী** বলে। এই ছোট্ট শাখাটি অ্যায়োটার সংলগ্ন বাম নিলয়ের অংশকে সরবরাহ করে এবং দক্ষিণ কোনাস ধমনীর সঙ্গে মিলিত হয়ে শেষ হয়ে যায়।

অল্প কথায় বাম করনারী ধমনী : উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে বাম করনারী ধমনী একটু অংশ ছাড়া বাম নিলয়ের সমস্ত অংশ, বাম অলিন্দ, ইণ্টারভেনট্রিকুলার সেপ্টামের বেশির ভাগ, ইণ্টার-অ্যাট্রিয়েল সেপ্টামের অল্প অংশ, এ-ভি নোড ও এস-এ নোডকে এবং দক্ষিণ নিলয়ের অল্প অংশকে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে।

দক্ষিণ করনারী ধমনী (Right coronery artery) : দক্ষিণ করনারী ধমনী অ্যানটিরিয়র অ্যায়োটিক সাইনাস থেকে উৎপত্তি হয় এবং ফুসফুসীয় মহাধমনী (**Pulmonary trunk**) ও দক্ষিণ অরিকুলের মধ্য দিয়ে ডান দিকে গিয়ে করনারী খাঁজের (**Coronary Sulcus**) ডানদিকে এসে হাজির হয় এবং এই খাঁজ দিয়ে বাঁদিকে যায় এবং বাম করনারী ধমনীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে শেষ হয়ে যায়।

প্রথম শুরুর পর যাবার পথে দক্ষিণ করনারী ধমনী দক্ষিণ নিলয়কে কয়েকটি শাখা দেয়। এই প্রথম শাখাটির নাম (i) **দক্ষিণ কোনাস ধমনী** (Conus artry) এবং ফুসফুসীয় মহাধমনীর গোড়ার অংশকে ও দক্ষিণ নিলয়ের উপরের দিকের অংশকে সরবরাহ করে। করনারী খাঁজে ঢোকার আগে (ii) একটি **মারজিনাল শাখা** (**Marginal branch**) হার্টের দক্ষিণ মারজিন ধরে এপেক্সের দিকে যায়। শতকরা ৫০ ভাগের উপরে প্রথম ভাগের গতিপথে দক্ষিণ করনারী ধমনীর এই শাখা। (iii) **এস-এ নোডকে একটি শাখা** দেয়। (iv) করনারী খাঁজে যাওয়ার পথে **দক্ষিণ নিলয় ও দক্ষিণ অলিন্দকে** শাখা সরবরাহ করে থাকে। (v) **পসটিরিয়র ইণ্টার-ভেনট্রিকুলার শাখাটি** (**Posterior Interventricular branch**)—**পসটিরিয়র ইণ্টারভেনট্রিকুলার** খাঁজ দিয়ে নিচের দিকে নেমে যায় ও উভয় নিলয়কে ও ইণ্টারভেনট্রিকুলার সেপ্টামকে শাখা সরবরাহ করে। (vi) এ-ভি নোডকেও দক্ষিণ করনারী ধমনী শাখা সরবরাহ করে। (vii) করনারী খাঁজে যাওয়ার পথে দক্ষিণ করনারী ধমনী দক্ষিণ অলিন্দ ও নিলয়কে শাখা সরবরাহ করে।

অল্প কথায় দক্ষিণ করনারী ধমনী : দক্ষিণ করনারী ধমনী দক্ষিণ নিলয়ের বেশি অংশ, বাম নিলয়ের অল্প অংশ, দক্ষিণ অলিন্দের ও ইণ্টার-অ্যাট্রিয়েল সেপ্টামের বেশি অংশ। বাম অলিন্দের ও ইণ্টারভেনট্রিকুলার সেপ্টামের অল্প অংশ ও এস-এ ও এ-ভি নোডকে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে।

করনারী ধমনী রক্তের অনুচলাচল (**Coronary microcirculation**) **:** গবেষণায় এটা জানা গেছে যে প্রতিটি হৃৎপিণ্ড কোষের জন্য একটি ক'রে ক্যাপালারী থাকে যেমন আমরা দেখতে পাই ঐচ্ছিক পেশীর ক্ষেত্রে। একটা ঐচ্ছিক পেশী কোষের ব্যাস ৫০μ, অপরপক্ষে হৃৎপিণ্ড পেশী কোষের ব্যাস ২০μ যার ফলে এটা দেখা যাচ্ছে যে হৃৎপিণ্ড পেশী কোষের বেলায় ঐচ্ছিক পেশী কোষ থেকে ছয় গুণ ক্যাপিলারী বেশি থাকে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের টিস্যুর জন্য বেশি অক্সিজেন ও পুষ্টি দরকার হয়।

করনারী ধমনী-দ্বয়ের মধ্যে সংযোগ (**Coronary Anastomosis**) **:** ১৯৬১ সালে জেমস (**James**) দেখিয়েছেন যে ১০০-২০০ μm ব্যাস বিশিষ্ট করনারী ধমনীদ্বয়ের শাখাদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ আছে। চোখের দৃষ্টিতেও দুটি করনারী ধমনীর মধ্যে সরাসরি সংযোগ দেখা যায়। ১৯৭৪ সালে জেমস আরও দেখিয়েছেন যে সর্বস্তরে দুই ধমনীর মধ্যে সংযোগ দেখা যায় যেমন, এপিকার্ডিয়ামের নিচে (**External**), মায়োকার্ডিয়ামের মধ্যে (**Mural**) এবং এণ্ডোকার্ডিয়ামের নিচে। এত যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এটা দেখা গেছে—হঠাৎ ক'রে কোন করনারী ধমনীর মধ্যে বা এদের শাখার মধ্যে বাধা এসে উপস্থিত হলে যেমন থ্রমবোসিস বা এম্বোলিজিমের ক্ষেত্রে, এই সংযোগ কার্য্যকরী রক্ত চলাচল রক্ষা করতে পারে না। এই কারণেই করনারী ধমনীদের কার্য্যকারিতার ক্ষেত্রে সংযোগ শূন্য ধমনী (**Functional arteries**) বলেই ধরা হ'য়ে থাকে।

তবে এটাও দেখা গেছে যে সব ক্ষেত্রে করনারী ধমনীতে ধীরে ধীরে বাধা এসে উপস্থিত হয় সেইসব ক্ষেত্রে পরস্পর সংযোগকারী শাখাগুলি বড় হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচলে সাহায্য ক'রে জীবন দায়ী ভূমিকা পালন করতে পারে।

করনারী ধমনীর বাহিরের ধমনীর সহিত সংযোগ : আমরা জানি করনারী ধমনীদ্বয় এপিকার্ডিয়ামকে সরবরাহ করে এবং দেখা গেছে ঐ এপিকার্ডিয়াম অ্যায়োটা, ট্রেকিয়েল, ইসোফেজিয়েল, পসটিরিয়র ইণ্টারকসটাল,

ইণ্টারনাল থোরসিক, ব্রনক্রিয়েল ও ডায়াফ্র্যাগমেটিক ধমনী থেকে ছোট ছোট শাখার দ্বারাও পরিসেবিত হয়ে থাকে। ঐ ছোট ছোট ধমনীগুলির সঙ্গে করনারী ধমনীদ্বয়ের সংযোগ আছে। করনারী ধমনীতে ধীরে ধীরে বাধা উপস্থিত হ'লে ঐ সব সংযোগকারী ধমনীগুলি বড় হয়ে গিয়ে জীবন দায়ী হতে পারে।

করনারী ধমনীর বিশেষত্ব :

(১) শরীরের অন্য সমস্ত ধমনীগুলিতে হৃৎপিণ্ডের সিস্টোলের সময় রক্ত বেগ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু করনারী ধমনীতে ডায়াস্টোলের সময় রক্ত বেগ দেখা যায়।

(২) করনারী ধমনীদ্বয় পরস্পর যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও কার্য্যত সংযোগ-বিহীন ধমনীর মত কাজ করে (**Functional end arteries**)।

(৩) অন্য ধমনীদের তুলনায় প্রচুরভাবে স্নায়ু সেবিত।

(৪) সিস্টোলের সময় হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের জন্য রক্ত প্রবাহ খুব কমই থাকে। অন্য ধমনীদের ক্ষেত্রে সিস্টোল ও ডায়াস্টোল উভয় সময়েই রক্ত প্রবাহ চালু থাকে।

কোন্ করনারী ধমনীর কেমন প্রাধান্য : আগেই বলা হয়েছে বাম করনারী ধমনী বড় এবং হৃৎপিণ্ডের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অংশ এই ধমনী দ্বারা সেবিত হয়। ব্যারলডি (**Baroldi**) ও স্কোমাযোনি (**Scomazzoni**) ১৯৬৭ সালে গবেষণা করে যে তথ্য আমাদের জানিয়েছেন তাতে বাম করনারী ধমনী উৎস মুখের ব্যাস ৪ মিলিমিটার এবং দক্ষিণ করনারী ধমনীর ব্যাস ৩.২ মিলি-মিটার। আরও প্রকাশিত যে শতকরা ৬০ ভাগ হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রেই বাম করনারী ধমনীর ব্যাস বড়। মাত্র ১৭ ভাগ ক্ষেত্রে দক্ষিণ করনারী ধমনীর ব্যাস বড় এবং শতকরা ২৩ ভাগ ক্ষেত্রে উভয় ধমনীর ব্যাস সমান।

দুই করনারী ধমনীর হৃৎপিণ্ডের উপর রক্ত পরিবেশন কার্য্য পর্য্যালোচনা করে কার কতটা হৃৎপিণ্ডের উপর আধিপত্য রয়েছে তাই বিচার করে সেই আধিপত্যের পরিচিতি জ্ঞাপনের জন্য কিছু শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে যথা **বাম করনারী প্রভাবিত** (Left dominance) ও **দক্ষিণ করনারী প্রভাবিত** (Right dominance) ও **সম প্রভাবিত** (Balanced)। বাম প্রভাবিত হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে করনারী ব্যাধি বেশি হয়ে থাকে এবং দক্ষিণ প্রভাবিত হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে করনারী ব্যাধি কম হ'তে দেখা যায়।

করনারী ধমনীতে রক্ত চলাচল
(Cornary circulation)

আগেই বলা হয়েছে হৃৎপিণ্ড একটি পেশী গঠিত পাম্প এবং এই অঙ্গটি নিজ নিজ করনারী ধমনী দুটির মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টি পেয়ে থাকে। এই দুটি ধমনী হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি কোষকে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে এবং তারপর সেই রক্ত পরিশোধনের জন্য আবার হৃৎপিণ্ডের মধ্যেই ফিরে আসে।
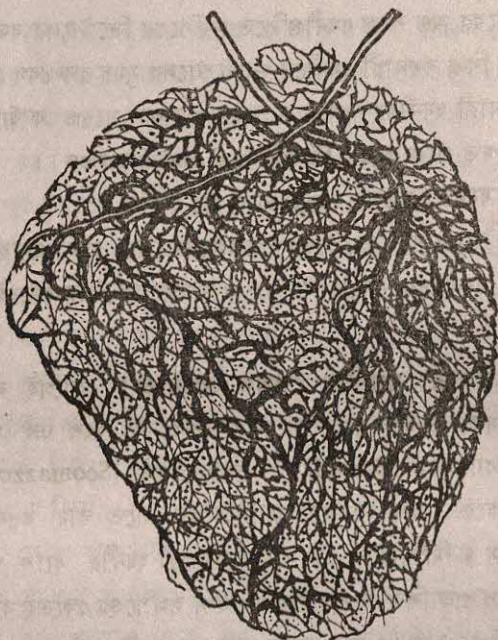
হৃৎপিণ্ডে রক্ত সরবরাহ

করনারী ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হওয়ার পর কেমন ক'রে সেই রক্ত প্রতিটি কোষে গেল এবং কেমন করেই বা সেই রক্ত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে ফিরে এল এই তথ্যই হল হৃৎপিণ্ড শরীরে রক্ত চলাচলের তথ্য বা করনারী ধমনীতে রক্ত চলাচল (Cororary circulation)।

করনারী ধমনীর **বেশির ভাগ রক্ত** অন্য ধমনীর মত টারমিনাল বা মেটাআটারিওল থেকে জালক হয়ে প্রতিটি কোষকে ঐ জালকের মাধ্যমে

অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করার পর শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। কিছু কিছু ধমনী ভাগ হ'তে হ'তে সূক্ষ্ম হয়ে যায়। কিন্তু তারা জালকে পরিণত না হ'য়ে সরাসরি হৃৎপিণ্ড গহ্বরে রক্ত নিক্ষেপ করে। আবার কিছু সূক্ষ্ম ধমনী সাইনুসয়ড হ'য়ে ঐ সাইনুসয়ডের মাধ্যমে রক্তকে হৃৎপিণ্ড গহ্বরে নিক্ষেপ করে। এটা দেখা গেছে খুবই অল্প পরিমাণ রক্ত হৃৎপিণ্ড বর্হিভূত ধমনীর সহিত করনারী ধমনীর সংযোগ থাকার জন্য বৃহৎ রক্ত চলাচলের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে ফিরে আসে। এই পরিপ্রেক্ষিতে করনারী ধমনী দ্বয়ের রক্ত কেমন করে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে সেই বিষয়কে নিম্নলিখিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে :

(১) শিরার মাধ্যমে।
(২) সূক্ষ্ম ধমনীর মাধ্যমে।
(৩) সাইনুসয়ডের মাধ্যমে।
(৪) বৃহৎ রক্ত চলাচলের মাধ্যমে।

(১) শিরার মাধ্যমে :

তিন প্রকার শিরার মাধ্যমে বেশির ভাগ রক্ত কেমন ক'রে কোথায় ফিরে আসে তা নিম্নে দেওয়া হইল :

(a) **করনারী সাইনাস :** সব থেকে বেশি রক্ত হার্টের শরীরের মধ্য থেকে বিভিন্ন ছোট ছোট শিরার সহিত মিলিত হয়ে করনারী সাইনাসে পরিণত হয়ে দক্ষিণ অলিন্দে রক্তকে নিক্ষেপ করে।

(b) **অ্যানটিরিয়র কার্ডিয়াক শিরা :** এই শিরাও রক্ত এনে দক্ষিণ অলিন্দে ফেলে।

(c) **ভেনি কর্ডিস মিনিমি বা থিবেশিয়েন শিরা :** এদের সংখ্যা প্রচুর। এই শিরাগুলি বেশির ভাগ দক্ষিণ অলিন্দে শেষ হয় ; কিছু দক্ষিণ নিলয়ে এবং খুব অল্প সংখ্যক বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ে শেষ হয়।

(২) সূক্ষ্ম ধমনীর মাধ্যমে :

কিছু অতি সূক্ষ্ম ধমনী যাদের আর্টারিওলুমিনাল রক্তবাহ (Arterioluminal Vessel) বলা হয় তারা সরাসরি হৃৎপিণ্ড গহ্বরে শেষ হয়।

(৩) সাইনুসয়ডের মাধ্যমে :

কিছু ক্ষুদ্র করনারী ধমনী যাদের **মায়োকার্ডিয়েল সাইনুসয়েড**

বা **আর্টারিওসাইনুসয়ড** বলা হয় তারা সাইনুসয়ডে পরিণত হয়ে সেই সাইনুসয়ড সরাসরি হৃৎপিণ্ড গহ্বরে শেষ হয়।

(৪) **বৃহৎ রক্ত চলাচলের মাধ্যমে :**

খুব সামান্যই রক্ত হৃৎপিণ্ড বহির্ভূত ধমনীর সহিত করনারী ধমনীর যোগ থাকার ফলেই বৃহৎ রক্ত চলাচলের মাধ্যমে দক্ষিণ অলিন্দে ফিরে আসে।

রক্ত সংবহনের নানান দিক

রক্ত সংবহন বিষয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে হৃৎপিণ্ডের বাম দিকের রক্ত, অর্থাৎ বাম অলিন্দ ও বাম নিলয়ের রক্ত, মহা ধমনীর মাধ্যমে শরীরের দূর দূর প্রান্তে অবস্থিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির কোষ সমূহকে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে। অন্য দিকে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অংশের রক্ত, অর্থাৎ দক্ষিণ অলিন্দ ও দক্ষিণ নিলয়ের রক্ত, বিশুদ্ধি করণের জন্য কাছাকাছি অবস্থিত দুই ফুসফুসে যায় এবং সেখান থেকে বাম অলিন্দে চলে আসে। ঐ পরিপেক্ষিতে রক্ত সংবহনে এটা দেখা যাচ্ছে যে, দুইটি ধারা বৃত্তাকারে হৃৎপিণ্ডে ঘুরে ফিরে আসছে। একটি ধারা শরীরের বৃহত্তর অংশ পরিক্রমা করে, অন্যটি শরীরের ক্ষুদ্রতর অংশকে পরিক্রমা করে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। এই সূত্রে রক্ত সংবহনকে দুইটি প্রধান অংশে ভাগ করা হয়েছে, (১) বৃহত্তর সংবহন (Greater or Systemic Circulation) ও (২) ক্ষুদ্রতর অথবা ফুসফুসীয় সংবহন (Lesser circulation)।

বৃহৎত্তর সংবহন (Greater or Systemic Circulation) **:** আগেই বলা হয়েছে আমাদের শরীরে রক্ত একটি বদ্ধ নলতন্ত্রের আবর্তে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। বৃহত্তর রক্ত সংবহনের ক্ষেত্রে আগেই বলা হয়েছে হৃৎপিণ্ডের বাম দিকের রক্ত যা বাম অলিন্দ থেকে বাম নিলয়ে আসে, সেই রক্ত বাম নিলয় সংকোচন দ্বারা মহাধমনীতে যথেষ্ট চাপে নিক্ষেপ করে যার ফলে মহাধমনীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধমনী, ধমনিকা ও ধামনিক জালকের ভিতর দিয়ে শরীরের সমুদয় কোষকে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করে থাকে।

ধামনিক জালকের মাধ্যমে রক্ত থেকে কোষ অক্সিজেন ও পুষ্টি গ্রহণ করে এবং নিজেদের কারবন ডাই অক্সাইড ও ক্ষয়িত আবর্জনা রক্তে ছেড়ে দেয়। সেই দূষিত রক্ত ধামনিক জালক থেকে সরাসরি শিরাণু জালক, শিরাণু, উপশিরা ও শিরার মাধ্যমে উর্দ্ধ ও নিম্ন মহা শিরার মাধ্যমে দক্ষিণ অলিন্দে এসে জমা হয়। এই ভাবে রক্ত বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে।

বিশেষ বিশেষ স্থানের রক্ত সংবহন ঃ বৃহত্তর রক্ত সংবহন আবর্তের মধ্যে পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোন কোন অঙ্গে বা স্থানে পরিবেশন পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু বৈচিত্রের লক্ষণ দেখা যায়। রক্ত চলাচল রূপ বৃক্ষের যে সমস্ত শাখায় এই বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় তাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়। বৃক্ক (**Kidney**), যকৃত (**Liver**), চর্ম (**Skin**), ফুসফুস
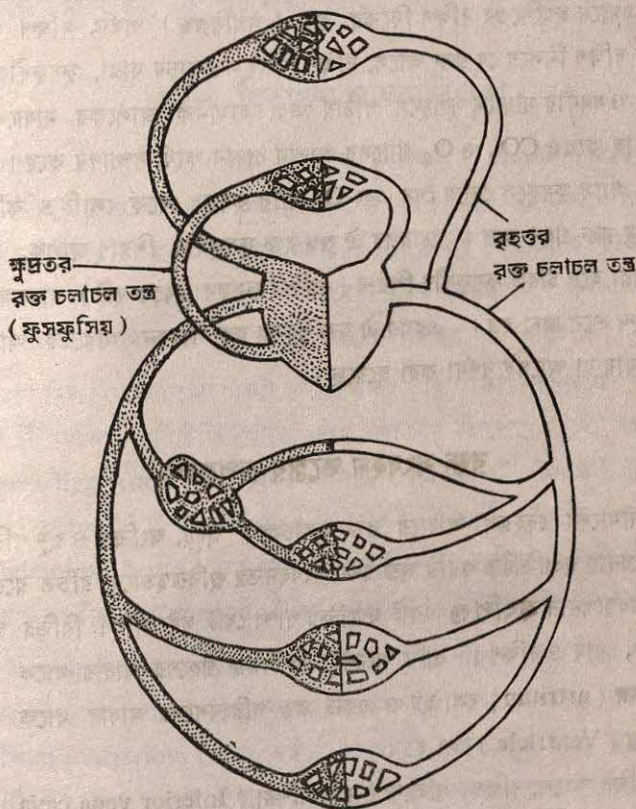
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রক্ত সংবহন

(**Lungs**), মগজ (**Brain**), হৃৎপিণ্ড, অন্ত্র, ও জরায়ু প্রভৃতি জায়গায় এই বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় এবং এদের যথাক্রমে রেনাল সারকুলেশন, হিপাটিক, কিউটে-নিয়াশ, পালমনারি, সেরিব্রাল, করনারী, স্প্যানকনিক, ইউটেরাইন সারকুলেশন বলে চিহ্নিত করা হয়।

এই সমস্ত বিশেষ স্থানের রক্ত সংবহনের মধ্যে কেবল হৃৎপিণ্ড শরীরের মধ্যে যে বিশেষ রক্ত সংবহন ব্যবস্থা রয়েছে তাহাই কেবল পরে আলোচনা করা হয়েছে।

(২) ফুসফুসীয় বা ক্ষুদ্রতর রক্ত সংবহন :

বৃহত্তর রক্ত সংবহনের মত ক্ষুদ্রতর রক্ত সংবহন ব্যবস্থা একই রকম, শুধু তফাৎ হ'ল এখানে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিকের রক্ত (অপরিশুদ্ধ) অর্থাৎ দক্ষিণ অলিন্দ থেকে দক্ষিণ নিলয়ে যে রক্ত আসে, দক্ষিণ নিলয় সংকোচন দ্বারা, ফুসফুসীয় মহা ধমনী ও ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে পাঠায় এবং ধামনিক জালকের মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহ করেও CO_2 ও O_2 গ্যাসের আদান প্রদান কার্য্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ CO_2 গ্যাস ফুসফুসে ছেড়ে দেয় এবং O_2 গ্যাস ফুসফুস থেকে লোহিত কণিকার মাধ্যমে রক্ত গ্রহণ করে। তারপর ঐ শুদ্ধ রক্ত ফুসফুসীয় শিরাণু জালক, শিরাণু উপশিরা হয়ে চারটি ফুসফুসীয় শিরার (প্রতিটি ফুসফুস থেকে দুটি) মাধ্যমে বাম অলিন্দে এসে জমা হয়। এরপর ঐ রক্ত বৃহত্তর রক্ত সংবহন আবর্তের আওতায় এসে যায় যা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

রক্ত সংবহন তন্ত্রের রূপরেখা

আমাদের দেহরূপ আধারে রক্ত চলাচলকে সুদৃঢ়, স্বংক্রিয় ও সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থাপনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য রক্ত সংবহনতন্ত্র সুবিন্যস্তভাবে রচিত রয়েছে। এই ব্যবস্থাপনায় **হৃৎপিণ্ড** একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্প যেটি দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত, বাম ও দক্ষিণ। প্রতি অংশেই একটি রক্ত গ্রহণের আধার থাকে যাকে **অলিন্দ** (artrium) বলা হয় ও একটি রক্ত পরিবেশনের আধার থাকে যাকে **নিলয়** (Ventricle) বলা হয়।

দক্ষিণ অংশে, দক্ষিণ অলিন্দে নিম্ন মহাশিরা (**Inferior vena cava**) পুষ্টি ও অপরিশুদ্ধ রক্ত, এবং উচ্চ মহাশিরা (**Superior vena cava**), ও হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব শরীর থেকে করনারী সাইনাসের (**Coronary Sinus**) মাধ্যমে অপরিশুদ্ধ রক্ত এসে জমা হয়। দক্ষিণ অলিন্দ সেই রক্তকে দক্ষিণ নিলয়ে পাঠায় এবং সেখান থেকে ফুসফুসীয় মহাধমনীর এবং দুই ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে বিশুদ্ধি করণের জন্য (অক্সিজেন সংযোগের জন্য) দুই ফুসফুসে পাঠায়। রক্ত ফুসফুসের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণের পর ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে

আসে এবং সেখান থেকে বাম অলিন্দ রক্তকে বাম নিলয়ে পাঠায়। বাম নিলয় ঐ রক্ত, যার মধ্যে পুষ্টি ও অক্সিজেন রয়েছে, মহাধমনী মারফত সর্ব শরীরে পরিবেশন করে। এই ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য—প্রতিটি কোষকে তরল পদার্থের (রক্ত) মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টি পরিবেশন করা এবং প্রতিটি কোষ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড ও বিপাকীয় আবর্জনা (**Metabolic products**) পরিবহন করে হৃৎপিণ্ডে আনয়ন করা এবং পরিশোধন করান।

ধমনী বিভাজন ও ক্রমবিকাশ

বাম ও দক্ষিণ নিলয় থেকে যথাক্রমে মহাধমনী (**Aorta**) ও ফুসফুসীয় মহাধমনী (**Pulmonary trunk**) উৎপত্তি হয়। এই মহাধমনীগুলি লম্বায় পাঁচ সেন্টিমিটার ও প্রস্থে তিন সেন্টিমিটার। বৃক্ষ যেমন গুঁড়ি থেকে কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায় তেমনি মহাধমনী দুটিও অনুরূপ ভাবে বিভাজন হতে থাকে এবং যতই বিভাজন হতে থাকে ততই ক্রমশঃ সরু হতে থাকে।

বাম নিলয় থেকে যে মহাধমনী প্রবাহিত হয় তার আকার-প্রকার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন পরিচিতি আছে এবং যথাক্রমে তাদের ঊর্দ্ধমুখী মহাধমনী (**Ascending Aorta**), মহাধমনী গোলার্দ্ধ (**Arch of Aorta**), নিম্নমুখী বক্ষীয় মহাধমনী (**Descending Aorta**), নিম্নমুখী উদরীয় মহাধমনী (**Abdominal Aorta**) বলা হয়। উদরে নিম্নমুখী উদরীয় মহাধমনী দুই কমন ইলিয়াক ধমনীতে (**Common Iliac arteries**) বিভাজন হয়ে শেষ হয়।

বিভাজন হতে হতে প্রতিটি ধমনী খুবই সরু নলে পরিণত হয়ে যায়। যখন এদের ব্যাস ১৫০ μm বা কিছু কমের মধ্যে থাকে তখন ঐ ক্ষুদ্র রক্তবাহকে **ধমনিকা** (**Arteriole**) বলা হয়। মহাধমনী থেকে যে সমস্ত রক্তবাহের উৎপত্তি তাদের ও তাদের শাখা প্রশাখাকে, ধমনিকা হওয়ার আগে পর্য্যন্ত, অর্থাৎ যে সমস্ত রক্তবাহের ব্যাস ১৫০ μm এর বেশি তাদের সকলকেই **ধমনী** (**Artery**) বলা হয়। ধমনিকা আরও বিভাজন হয়ে আরও সরু হয়ে যায় এবং যখন কোন রক্তবাহের ব্যাস ৫০ μm এর কম থাকে তখন তাদের অন্তধমনিকা (**Terminal arteriole**) বলা হয়। এই অন্তঃধমনিকা রক্তবাহগুলি খুব সরু হলেও চোখে দেখা যায়। অন্তধমনিকা আরও বিভাজন হয়ে **ধমনী জালক** বা **কৈশিকে** (**Capillary net work**) পরিণত হয়। ধামনীক জালককে চোখে

দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই কেবল দেখা যায়। এই ধামনীক জালকই একমাত্র রক্তবাহ যাদের মাধ্যমে আমাদের শরীরের কোষ সমূহ খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং এদেরই মাধ্যমে কোষ থেকে পরিত্যক্ত কার্বন ডাই অক্সাইড ও বিপাকীয় আবর্জনা রক্তে চলে আসে এবং শিরার মাধ্যমে বাহিত হয়ে হৃৎপিণ্ডে চলে যায়।
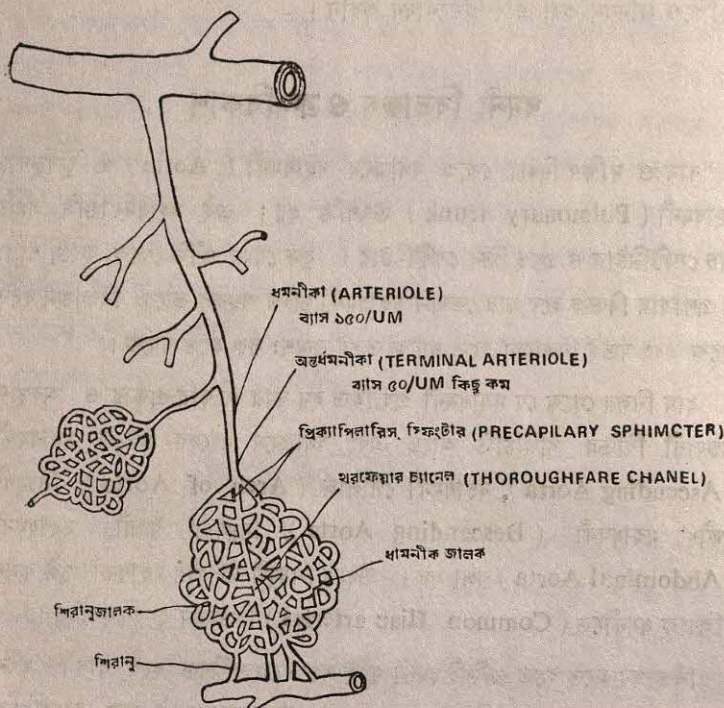
প্রতিটি ক্যাপিলারি ০'৫—১ মিলিমিটার লম্বা ও ৮—১০/µM ব্যাস।

অন্তধমনিকার পার্শ্ব থেকে আরও এক প্রকার ধমনিকা উঠতে দেখা যায়। যাদের গড় ব্যাস ১২ µm এবং এই সূক্ষ্ম রক্তবাহগুলির প্রাকার-প্রাচীর চারিদিক থেকে কতকগুলি সংকোচক-প্রসারক কোষ দ্বারা আবদ্ধ থাকে; এই রক্তবাহকে **প্রবাহ নিয়ন্ত্রক রক্তবাহ** (Precapillary sphincter vessel) বলা হয় এবং এই প্রবাহ নিয়ন্ত্রক রক্তবাহগুলি খুব অল্প পথ অগ্রসর হওয়ার পরই বিভাজন হয়ে জালকে পরিণত হয়। এই রক্তবাহগুলি জালক অভ্যন্তরে রক্তের গতিধারার প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

ধামনিক জালক অবিচ্ছিন্নভাবে **শিরাণু জালকে** (Venous capillary) পরিণত হয় অর্থাৎ একই স্রোতধারার একপ্রান্ত ধামনিক জালক এবং তার বিপরীত প্রান্ত শিরাণু জালক। শিরাণু জালক থেকে যে ক্ষুদ্র রক্তবাহ প্রকাশ পায় তাকে **শিরাণু** বলা হয়। শিরাণু পরস্পর যুক্ত হয়ে **শিরার** উৎপত্তি হয়। পরে ছোট ছোট শিরা মিলে **বড় শিরা** এবং পরিশেষে সব থেকে বড় দুটি শিরার উৎপত্তি হয়। একটি শরীরের উপর অংশের থেকে দূষিত রক্তকে দক্ষিণ অলিন্দে এনে ফেলে এবং এই বৃহত্তম শিরাকে **সুপিরিয়র ভেনা কেভা** বলে ; অন্যটি শরীরের নিম্ন অংশ থেকে দূষিত রক্তকে দক্ষিণ অলিন্দে এনে ফেলে এবং এই শিরাকে **ইনফিরিয়র ভেনা কেভা** বলা হয়। হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব শরীরের প্রায় সমস্ত দূষিত রক্ত **করনারী সাইনাসের** মাধ্যমে দক্ষিন অলিন্দে এসে পড়ে।

এটা লক্ষ্য করার বিষয় হৃৎপিণ্ড গহ্বরের অভ্যন্তরে যে এণ্ডোথিলিয়েল ঝিল্লির আবরণ রয়েছে, সেই আবরণ রক্তবাহ নালীর ভিতরের আবরণের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে বরাবর সামিল হয়ে থাকে এবং হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহগুলি সম্মিলিত ভাবে একটি বদ্ধ সংবহন তন্ত্রের সৃষ্টি করেছে যার মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

সংকোচন দ্বারা হৃৎপিণ্ড উচ্চ চাপে মহাধমনী ও ধমনীর মধ্যে রক্ত নিক্ষেপ করে এবং এই চাপ হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত যত দূরে সরে যেতে থাকে তত ক্রমশঃ কম হতে থাকে এবং শিরায় যখন রক্ত পৌছায় তখন রক্তচাপ খুবই কম হয়ে যায়। থেকে থেকে বেশি চাপে ধমনীর মধ্য দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হয় বলে ধমনী দেওয়াল পুরু ও অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ। শিরার মধ্য দিয়ে নিম্ন চাপে রক্ত বাহিত হয়ে থাকে তার জন্য শিরার বেষ্টনী প্রাচীর অপেক্ষাকৃত পাতলা এবং এদের প্রস্থচ্ছেদ ব্যাস বড় এবং এদের মধ্য দিয়ে রক্ত একই ভাবে বরাবর অভিন্ন স্রোতধারায় গতিমান থাকে।

এটা বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য যে একই মাধ্যম অর্থাৎ রক্ত, অক্সিজেন ও পুষ্টি শরীরের কোষকে পরিবেশন করে আবার সেই একই মাধ্যম কার্বন ডাই অক্সাইড ও বিপাকীয় আবর্জনা দূরিকরণের জন্য পরিবহন করে আনছে যেটা মাধ্যমের ব্যবহার সম্বন্ধে মিতব্যয়িতার একটি উৎকৃষ্ট নজির যা আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে অকৃপণে পেয়েছি। আর আমাদের শরীরে রক্ত সংবহনের বিশেষ পরিচয় যে রক্ত চক্রাকারে একটি বদ্ধ বিস্তৃত নলতন্ত্রের মাধ্যমে চলাচল করে থাকে এবং একই জায়গা থেকে পরিবেশিত হয়ে সেই একই জায়গায় ফিরে আসে।

লসিকা

রক্ত চলাচল তন্ত্রের মত লসিকা তন্ত্র টিস্যুরস (Tissue fluid) সংবহন, করার জন্য একটি রক্ত চলাচলতন্ত্রের সহযোগী বদ্ধ নলতন্ত্র যদিও হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে এর কোন সরাসরি যোগ নাই। আমাদের শরীর অভ্যন্তরে বিস্তৃত লসিকাতন্ত্রের সমাবেশ সুবিন্যস্তভাবে প্রসারিত রয়েছে যাদের মাধ্যমে ফেলে-আসা রক্তরসের কিয়দংশ ও বিপাকীয় আবর্জনা বাহিত হয়ে থাকে। লসিকাতন্ত্রের দ্বারা বাহিত তরল পদার্থকে লসিকা রস (Lymph) বলা হয়। লসিকাতন্ত্রের বিস্তৃত শাখা প্রশাখা নানা লসিকাগ্রন্থি (lymph node) কে অতিক্রম ক'রে শিরার মতই ছোট ছোট লসিকাবাহ মিলিত হয়ে বড় লসিকা তৈরি হয় এবং পরিশেষে মাত্র দুটি বড় লসিকাবাহের সৃষ্টি হয় (ডানদিকে দক্ষিণ লিমফ্যাটিক ডাক্ট ও বামদিকে থোরাসিক ডাক্ট) যারা শরীরের সমস্ত জায়গার লসিকা বহন করে গলার গোড়ায় শিরায় নিয়ে ফেলে। শিরার মাধ্যমে ঐ লসিকা রস হৃৎপিণ্ডে পৌছায়।

রক্তবাহ তন্ত্র (Blood Vascular System)

রক্তবাহতন্ত্র দুইটি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়ে, যথা ধমনীতন্ত্র ও শিরাতন্ত্র, রক্ত সংবহনকে নলাকার আধারের মাধ্যমে শরীরে সমস্ত টিস্যুকে রক্ত পরিবেশন ও পরিসেবন করে থাকে। এই দুইটি শাখাই হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ধমনীতন্ত্র রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টি বহন করে টিস্যুর সেবা করে এবং টিস্যু থেকে বিপাকীয় আবর্জনা ও কার্বন ডাই অক্সাইডকে সরিয়ে এনে টিস্যু স্বাস্থ্যকে বজায় রাখে।

ধমনীতন্ত্র ও শিরাতন্ত্রের বিভিন্ন গতি, প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে আলোচনা শারীরতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থের আলোচনার বিষয়। তাই আমরা এখানে উক্ত রক্তবাহতন্ত্রের উভয় শাখার কেবলমাত্র গঠন, কার্য্যকারিতা এবং এই দুইয়ের সম্বন্ধযুক্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব।

ধমনী ও শিরার গঠন পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করার আগে আমরা যে কোন রক্তবাহের, শিরাই হউক আর ধমনীই হউক, গঠনের সাধারণ নক্সা সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করছি :

রক্তবাহের সাধারণ গঠন নক্সা :

একটি নলাকার রক্তবাহকে প্রস্থচ্ছেদ করে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করলে,

কি শিরা বা ধমনী, সকলেরই বেষ্টনী প্রাচীর গঠনের নক্সা এক প্রকার, যদিও কার্য্যকারণের উপর নির্ভর ক'রে কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়। সব রক্ত-বাহেরই বেষ্টনী-প্রাচীরটি তিনটি টিস্থর তিনটি বিভিন্ন স্তরে সজ্জিত। ভিতরের স্তরটি ছোট ছোট, চ্যাপটা চ্যাপটা এণ্ডোথিলিয়েল কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষগুলি পরস্পর সংযুক্ত হয়ে একটি নলের আকার ধারণ করে এবং এই স্তরটিকে **এণ্ডোথিলিয়েল স্তর** (Endothelial layer) বলা হয়। এই স্তরটি অত্যন্ত মসৃণ এবং সরাসরি রক্তের সংস্পর্শে আসে। মাঝখানের স্তরটি অরেখিত পেশী কোষ দ্বারা গঠিত (**পেশী স্তর**)। বাহির দিকের স্তরটি সংযোজক কলার দ্বারা গঠিত (**তান্তব স্তর**)।

কার্য্যকারিতা, ও ভিতরের রক্ত চাপের উপর নির্ভর ক'রে স্তরগুলির নিবিড়ত্ব ও স্থিতিস্থাপক কলার সন্নিবেশ বহুলাংশে নির্ভর করে।

ধমনীর গঠন ও শ্রেণীবিন্যাস

প্রতিটি ধমনীর বেষ্টনী প্রাচীর সাধারণ রক্তবাহের মতই তিনটি স্তরে সজ্জিত এবং ভিতর থেকে বাহিরে এই স্তরগুলি যথাক্রমে (১) টিউনিকা ইনটিমা (Tunica intima), (২) টিউনিকা মিডিয়া (Tunica media) ও (২) টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়া (Tunica adventitia) নামে পরিচিত।

টিউনিকা ইনটিমা (Tunica Intima)**:** এই স্তরটি ধমনী বেষ্টনী প্রাচীরের সব থেকে ভিতরের স্তর এবং এক লাইন এণ্ডোথিলিয়েল কোষ দ্বারা গঠিত এবং ইহাকে **এণ্ডোথিলিয়েল আবরণী স্তরও** বলা হয়। এই আবরণী স্তরের বাহিরে কিছু সংযোজক কলার আঁস ছড়ান ছিটান ভাবে এণ্ডোথিলিয়েল স্তরকে আবৃত করে এবং এই স্তরের বাহিরে স্থিতিস্থাপক কলার আঁস একটি অপেক্ষাকৃত নিবিড় স্তরে বিন্যস্ত থাকে যাকে **অভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপক ত্বক** (Internal elastic lamina) বলা হয়। এণ্ডোথিলিয়েল স্তরের বাহিরে ঢিলেঢালা সংযোজক কলা ও স্থিতিস্থাপক কলার আঁসের আবরণীকে **সাব-এণ্ডোথিলিয়েল স্তর** বলা হয়। অতএব টিউনিকা ইনটিমা বলতে আমরা বুঝব যে এণ্ডোথিলিয়েল স্তর ও সাব-এণ্ডোথিলিয়েল স্তর এই দুই স্তর মিলে টিউনিকা ইনটিমা গঠন করছে।

টিউনিকা মিডিয়া (Tunica Media) **:** ভিতরের টিউনিকা ইনটিমা ও বাহিরের টিউনিকা অ্যাডভেন্টিশিয়া এই দুই স্তরের মধ্যে যে স্তর থাকে তাকে **টিউনিকা মিডিয়া** বা মধ্যবর্তী আবরণী স্তর বলা হয়। এই স্তরটি একটি অরেখিত পেশী স্তর এবং টিউনিকা ইনটিমাকে পরিবৃত করে। এই পেশীর সঙ্গে মিশে কিছু কিছু স্থিতিস্থাপক কলা ও সংযোজক কলার আঁশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে
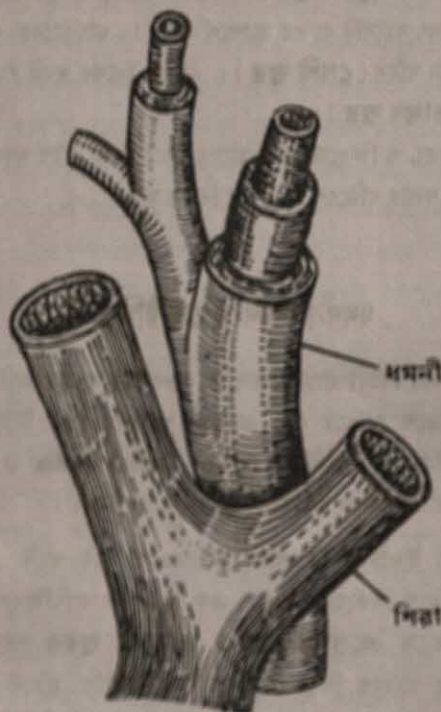
থাকে। এই পেশী স্তর ও টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়ার মধ্যে স্থিতিস্থাপক কলার কিছু তন্তু নিবিড়ভাবে একটি আবরণীর সৃষ্টি করে থাকে **বাহিরের স্থিতিস্থাপক ত্বক** (External elastic lamella) বলা হয়।

টিউনিকা অ্যাডভেন্টিশিয়া (Tunica Adventitia) **:** এই স্তরটি ধমনী দেওয়ালের বাহিরের আবরণী। সংযোজক কলার আঁশ বৃত্তাকারে ধমনী দেওয়ালকে আবৃত ক'রে এই স্তরের সৃষ্টি করে এবং ধমনী দেওয়ালের

কাঠামোকে মজবুত করে। এই স্তরের সংযোজক কলার কিছু আঁশ আশেপাশের সংযোজক কলার আঁশের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে থাকে।
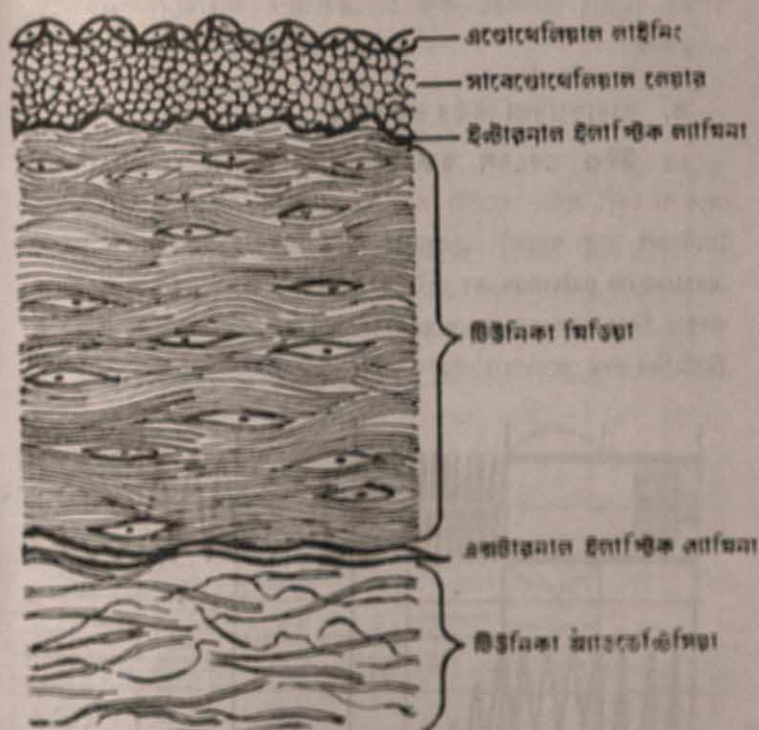
ধমনীর শ্রেণীবিন্যাস

আমাদের শরীরের ধমনীগুলিকে যদি নানান দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায় তাহলে তাদের মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্রের সমাবেশ আমরা দেখতে পাব। ঐ বৈচিত্রগুলি আলাদা আলাদা করে দেখলে দেখা যাবে তাদের মধ্যে রয়েছে গঠনের তারতম্য, মাপের ও কার্যকারিতার তারতম্য। কিছু কিছু বিশেষ স্থানে বিশেষ ধরণের ধমনী রয়েছে যাদের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে গঠন প্রকৃতিতে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

উপরি উক্ত কারণে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে ধমনীগুলিকে নানানভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়।

১৯৬০ সালে ফকো (Folkow) রক্তবাহের কার্য্যকারিতাকে পর্য্যবেক্ষণ করে কোন্ রক্তবাহ কি কাজ করে সেই কাজের কথা সামনে রেখে রক্তবাহগুলিকে কাজের নিরিখে নামকরণ করে যে শ্রেণীবিন্যাস করেছিলেন তা নিম্নে বর্ণিত হইল :

ক. কার্য্যকারিতা নির্ভর রক্তবাহ :

১। **উইণ্ড কেসেল রক্তবাহ** (Wind Kessel Vessels) : সব থেকে বড় ধমনী, অর্থাৎ অ্যয়োটা এবং এর শাখাগুলি এই শ্রেণীভুক্ত। হার্টের সিস্টোলের সময় অ্যায়োটা দেওয়ালের স্থিতিস্থাপকতার জন্য যে স্পন্দন-স্ফীতি (contractive pulsation) হয় সেই স্ফীত অবস্থা ডায়াস্টোলের সময় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে এবং রক্ত স্তম্ভের উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং রক্ত চলাচলকে নিরবিচ্ছিন্ন সুষম স্রোতধারায় পরিণত করে।

(এই ছবিটি চক্রবর্তী ঘোষ সাহানা হিউম্যান ফিজিওলজি হইতে গৃহীত।)

২। **প্রবাহরোধকারী রক্তবাহ** (Resistance vessels) : ক্ষুদ্র ধমনী, ধমনিকা এবং কম-বেশি রক্তবাহ জালক এই শ্রেণীভুক্ত। এই রক্তবাহগুলি রক্ত চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৩। **রক্তধারা নিয়ন্ত্রক রক্তবাহ** (Sphincter vessels) : শেষ

প্রান্তীয় ধমনিকা এই পর্যায়ভুক্ত। এই রক্তবাহগুলির দেওয়ালে বিশেষ এক প্রকার অঙ্গসজ্জা থাকে যার মধ্যে অরেখিত পেশীই প্রধান অঙ্গ। এই পেশী স্বয়ংক্রিয় সংকোচন-প্রসারণ দ্বারা ধামনিক জালকে রক্ত সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৪। **আদান-প্রদানকারী রক্তবাহ** (**Vessels of exchange**) **:** রক্তবাহ জালকগুলি এই পর্য্যায় ভুক্ত। এদের দেওয়াল চুইয়ে তরল পদার্থ (প্ল্যাজমা) অক্সিজেন ও পুষ্টি বহে নিয়ে কোষকে সরবরাহ করে এবং কোষ থেকে কার্বন ডায়ক্সাইড ও বিপাকীয় আবর্জনাকে রক্তে টেনে নিয়ে তাদের রক্তের মাধ্যমে যথারীতি বিলিবন্দেজ করায়।

৫। **ভিন্নপথে পাচারকারী রক্তবাহ** (Shunt vessels) **:** এই রক্তবাহগুলি ধামনিক জালককে এড়িয়ে রক্তকে সরাসরি শিরায় নিয়ে ফেলে। আঙ্গুলের ডগায়, কানের লবিউলে, নখের নিচে প্রভৃতি জায়গায় পাওয়া যায়।

৬। **বৃহৎ রক্তাধার রক্তবাহ** (Capacitance vessels) **:** শিরাগুলি এই পর্য্যায়ভুক্ত রক্তবাহ। শিরাগুলির ভিতরের নালী বড় এবং দেওয়াল পাত্‌লা এবং পেশী-স্বল্পতা থাকার জন্য সংকোচন শক্তি খুবই তুর্বল এবং বহমান রক্তের পরিমাণের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। কোন কোন সময় শিরার মধ্যে অনেক রক্ত আটকে পড়তে পারে এবং এই সমস্ত ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ডে রক্তের পরিমাণ কম মাত্রায় ফিরে আসে ও কার্ডিয়াক আউটপুটও কমে যায়। হঠাৎ করে অনেক রক্ত আটকে গেলে মাথা ঘুরে যায়।

গঠন অনুযায়ী ধমনীগুলিকে কেউ কেউ নিম্নরূপে ভাগ করে থাকেন

খ. গঠন অনুযায়ী :

১। পেশীবহুল ধমনী (Muscular Type)

২। স্থিতিস্থাপক কলা প্রধান ধমনী (Elastic Type)

৩। মিশ্র রকমের ধমনী (Mixed Type)

৪। হাইব্রিড টাইপ (Hybrid Type)

গ. মাপ অনুযায়ী ধমনীর শ্রেণীবিভাগ :

১। বড় ধমনী (স্থিতিস্থাপক কলা প্রধান)

২। মাঝারী মাপের ধমনী } পেশীবহুল

৩। ক্ষুদ্র ধমনী }

ঘ. বিশেষ ধমনী গোষ্ঠী :

১। আমবাইলিকেল ধমনী

২। নিম্ন অঙ্গের ধমনী

৩। মাথার খুলির ধমনী

৪। পুরুষাঙ্গের হেলিসাইন ধমনী

৫। প্লীহার কোমল পিণ্ডের (White pulp) ধমনী

১। আমবাইলিকেল ধমনী : এই ধমনী বেষ্টনী-প্রাচীরের গঠনে আভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপক ত্বক (Internal elastic lamina) থাকে না। টিউনিকা মিডিয়াতে দুইটি পেশী স্তর থাকে, ভিতর ও বাহির। ভিতরের পেশী স্তরটি বৃত্তাকারে সজ্জিত এবং বাহিরেরটি লম্বালম্বিভাবে সজ্জিত।

২। নিম্ন অঙ্গের ধমনী : নিম্ন অঙ্গের ধমনীগুলিকে যখন অন্য স্থানের ধমনীদের সহিত তুলনা করা যায় তখন দেখা যাবে নিম্ন অঙ্গের ধমনীদের টিউনিকা মিডিয়া খুবই পরিপুষ্ট।

৩। মাথার খুলির ধমনী : মাথার খুলির ধমনীদের বিশেষত্ব হল, এদের বেষ্টনী প্রাচীর খুবই পাতলা এবং আভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপক ত্বক খুবই পরিপুষ্ট এবং টিউনিকা মিডিয়াতে স্থিতিস্থাপক তন্তু প্রায়ই থাকে না।

৪। পুরুষাঙ্গের হেলিসাইন ধমনী : এই ধমনীগুলি লিঙ্গের ডিপ ধমনী থেকে উৎপত্তি হয়। এদের বিশেষত্ব হল, এরা ধামনিক জালকে শেষ না হয়ে আঁকা-বাঁকা প্রশস্ত রক্তবাহে, যাদের **ক্যাভারনাস স্পেস** বলা হয়, শেষ হয়। এদের টিউনিকা মিডিয়ায় পেশী স্তরটি খুবই পরিপুষ্ট এবং এণ্ডোথিলিয়েল স্তরটি করোগেটেড টিনের মত ঢেউ খেলান।

যখন পুরুষাঙ্গ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে তখন এণ্ডোথিলিয়েল স্তরে ঢেউ খেলান উঁচু অংশগুলি নিচু অংশের সহিত মিলিত থাকে এবং রক্ত চলাচল স্তিমিত থাকে। উত্তেজনার সময় ক্যাভারনাস স্পেসগুলি খুব তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে যায় যার ফলে পুরুষাঙ্গ স্ফীত ও লম্বা হয়ে যায় এবং পুরুষাঙ্গের বাহিরের শক্ত আবরণ (Penile fascia), যা স্বাভাবিকভাবে স্থিতিস্থাপকতা শূন্য, ডিপ ডরস্যাল শিরার রক্তকে আটকে দেয় যার ফলে পুরুষাঙ্গ একটি শক্ত স্ফীত অঙ্গে পরিণত হয় (Errection of Penis).

৫। প্লীহার কোমল পিণ্ডের ধমনী (Artery of the white pulp

of spleen) : এই ধমনীগুলির টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়া স্তরটি থাকে না এবং এর পরিবর্তে লিমফোসাইট কোষ দ্বারা আবৃত থাকে।

ধামনিক জালক (Capillaries)

ধমনিকা (Arteriole) বিভাজন হয়ে যখন সূক্ষ্ম পরস্পর সংযুক্ত জালকে পরিণত হয়, সেই জালকের রক্তবাহগুলিকে **ধামনিক জালক** বলা হয়। এই রক্তবাহগুলি চোখে দেখা যায় না এবং শুধু এদেরই মাধ্যমে কোষসমূহ পুষ্টি ও অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডায়ক্সাইড ও বিপাকীয় আবর্জনা পরিহার করে থাকে। নলাকার এই রক্তবাহগুলি অবিচ্ছেন্তভাবে শিরান্থ জালকের (Venous Capillaries) সহিত মিলিত হয়ে একই স্রোতধারার সামিল হয়ে থাকে।

ধামনিক জালকের প্রতিটি রক্তবাহের প্রস্থচ্ছেদ (Cross section) ব্যাসের মাপ ৮ μm থেকে ১০ μm হয়ে থাকে এবং প্রতি রক্তবাহ লম্বায় ½ থেকে ১ মিলিমিটার হতে দেখা যায়। এই জালকের গঠনে একটি বিশেষত্ব, প্রতিটি জালকের মাঝখান দিয়ে একটি সোজাসুজি রক্তবাহ ধমনিকা থেকে শিরাণুতে শেষ হয়। এই সোজাসুজি রক্তবাহটিকে **থরোফেয়ার চ্যানেল** (Thoroughfare Channel) বলা হয়। কি কাজ করার সময় বা বিশ্রামের সময়, সব সময়েই এই রক্তবাহের মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল করে থাকে। কিন্তু এর সঙ্গে সংযুক্ত জালিকার মধ্য দিয়ে কেবলমাত্র কাজের সময় রক্ত চলাচল করে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী ধামনিক জালক বন্ধ বা খোলা থাকতে পারে এবং এই জালক শুরু হওয়ার আগেই প্রান্তীয় ধমনিকার গায়ে একপ্রকার পেশীর দ্বারা গঠিত অঙ্গসজ্জা থাকে যাকে রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রক সংকোচক (Precapillary sphincter) বলে। এই রক্ত চলাচল নিয়ন্ত্রক সংকোচক অঙ্গটি জালকের মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে।

ধামনিক জালকের গঠন (Structure of Capillaries) :

প্রতিটি ধামনিক জালকের নলাকার রক্তবাহকে প্রস্থচ্ছেদ করলে গঠন প্রকৃতি নিম্নরূপ দেখা যায় (ভিতর থেকে বাহিরে) :

১। বৃত্তাকারে সজ্জিত এক স্তর এণ্ডোথিলিয়েল কোষ

২। এণ্ডোথিলিয়েল কোষগুলি চারিদিকে বৃত্তাকারে সজ্জিত একটি অতি সূক্ষ্ম সংযোজক কলার আবরণ থাকে যাকে **বেসমেণ্ট মেমব্রেণ বলে** এবং এই বেসমেণ্ট মেমব্রেনই কোষগুলিকে একত্রে ধরে রাখে।

৩। বেসমেণ্ট মেমব্রেনের বাহিরে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান ছিটান থাকতে দেখা যায় কিছু (ক) পেরিসাইট (**Pericyte**) কোষ, (খ) কিছু রেটিকুলার তন্তু, (গ) কিছু ম্যাক্রোফাজ (**Macrophage**) কোষ, (ঘ) আদিম মেসেনকাইম (**Mesenchyme**) কোষ, (ঙ) রগেট (**Roget**) কোয এবং কখনও কোথাও কোথাও (চ) স্নায়ু কোষ (**Nerve Cell**) ও ফাইব্রোব্লাস্ট (**Fibroblasts**).

রগেট কোষ (Rouget Cell) : ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রগেট প্রথমে এই কোষ আবিষ্কার করেন এবং তাঁর নাম অনুসারেই এই কোষের নামকরণ করা হয়েছে। এই কোষগুলি ধামনিক জালক রক্তবাহের উপর অবস্থিত থাকে এবং এদের বেশ লম্বা লম্বা রোঁয়া থাকে যেগুলি চারিদিক থেকে রক্তবাহকে জড়িয়ে থাকে। এই কোষগুলিকে ইলেকট্রিক সাহায্যে উত্তেজিত করলে এদের সংকোচিত হতে দেখা যায়। এ-কারণে সে-সময় ধারণা করা হ'ত যে রগেট কোষগুলি এক প্রকারের পেশী কোষ। পরে গবেষণায় জানা গেছে—যে-হেতু এই কোষেদের বাই-ফ্রিনজারেণ্ট মায়োফাইব্রিল থাকে না সেই হেতু এদের আর পেশী কোষ বলে ধরা হয় না। তাছাড়া এটাও দেখা গেছে যে এণ্ডোথিলিয়েল কোষের নিজেরই সংকোচন-প্রসারণ করার সামর্থ রয়েছে।

বর্তমানে ধামনিক জালক রক্তবাহের বহির্দেশে উপরি উক্ত বিশেষ বিশেষ কোষগুলিকে একত্রে 'পেরিসাইট' এই আক্ষায় আক্ষায়িত করা হচ্ছে।

ধমনী জালকের শ্রেণী বা প্রকারভেদ :

বিভিন্ন স্থানের বা অঙ্গের ধামনিক জালক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের গঠন সব জায়গাতেই এক প্রকার নহে। হৃৎপিণ্ড পেশী, স্বয়ংক্রিয় পেশী, অগ্নাশয়ে (**Pancreas**) এবং আরও অন্যান্য জায়গায় যে সমস্ত ধামনিক জালক থাকে তাদের গঠনে এণ্ডোথিলিয়েল কোষগুলি একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তবাহের বেষ্টনীকে এক অবিচ্ছেদ্য ঝিল্লি আবরণের সৃষ্টি করে। এই প্রকার ধামনিক জালককে **অচ্ছিদ্র ধামনিক জালক** বলা হয়। অন্তর্মুখী গ্রন্থী, গ্লোমিরুলাস, ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিলাই, কিডনী এবং আরও কিছু কিছু স্থানে ধামনিক

জালকের এণ্ডোথিলিয়াম ঝিল্লি স্তরটি জায়গায় জায়গায় ছিদ্রিত। এই ছিদ্রগুলির উপস্থিতি সাধারণ অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় না। ইলেকট্রণ অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এই সমস্ত রক্তবাহ জালকের এণ্ডোথিলিয়াম স্তরকে নিরীক্ষণ করলে, কোন কোন জায়গায় এণ্ডোথিলিয়াম কোষ খুবই পাতলা (৫০০Å) আবার কোন কোন জায়গায় দুটি এণ্ডোথিলিয়াম কোষের মাঝে ছোট ছোট ফাঁক বা ছিদ্র (৩০০—১০০০ Å) থাকতে দেখা যায়। এই সমস্ত ছিদ্রিত ধামনিক জালককে **সছিদ্র ধামনিক জালক** (Fenestrated Capallaries) বলে।

ধামনকি জালকের ভেদ্যতা ও আদান প্রদান:

আমরা জানি ধামনিক জালক বেষ্টনীকে ভেদ করে রক্তের তরল অংশ যাতায়াত করে এবং রক্ত ও কোষের মধ্যে বস্তু বিশেষের আদান প্রদান করে। এই আদান-প্রদানের জন্য কোন শক্তির প্রয়োজন হয় না কারণ এণ্ডোথিলিয়াম স্তরটি জড় ঝিল্লির মত কাজ করে থাকে যার ফলে জলীয় ও স্ফটিকতুল্য বস্তু (**Crystalloid**) সামগ্রী অনায়াসে এর ভিতর দিয়ে যাতায়াত করতে পারে কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় অণু, যথা প্রোটিন অণু, এই ঝিল্লির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারে না অর্থাৎ বড় অণুর বেলায় এণ্ডোথিলিয়াম ঝিল্লি অভেদ্য।

ধামনিক জালকের মধ্য দিয়া আদান-প্রদানের পথ:

(১) অনেকে মনে করেন দুটি এণ্ডোথিলিয়েল কোষের মধ্য সূক্ষ্ম ফাঁক থাকে যার মধ্য দিয়ে উপরি উক্ত পদার্থ যাতায়াত করে। (২) প্যালেড (**Palade**) ও আরও কেউ কেউ বলেন এণ্ডোথিলিয়েল কোষের ভিতরে ও বাহিরে অনেক ছোট ছোট কোষ থলি (**Vesicle**) থাকে যাদের মাধ্যমে পিনোসাইটোসিস (**Pinocytosis**) প্রক্রিয়ায় (**Drinking by cell**) আদান-প্রদান হয়ে থাকে। (৩) পেরক্সিডেজ (**Peroxidase**) উৎসেচককে (**Enzyme**), যার অনু-ওজন ৪০,০০০, পন্থানুসরণ বস্তু হিসাবে ব্যবহার ক'রে দেখা গেছে, অণু-পিনোসাইটোসিস (**Micro pinocytosis**) প্রক্রিয়ায় এণ্ডোথিলিয়েল কোষের মধ্য দিয়ে বিশেষ বস্তুগুলি যাতায়াত করে থাকে। (৪) অছিদ্র ধামনিক জালকের ক্ষেত্রে বিশেষ বস্তুগুলি উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় যাতায়াত করে থাকে।

ধামনিক জালকে রক্ত সংবহন:

ধামনিক জালকে রক্ত সংবহন অবিরত স্রোতধারায় বহমান থাকে। বেশ

কিছু রক্ত প্রান্তীয় ধমনিকা (**Terminal arteride**) থেকে থরোফেয়ার নালী দিয়ে সরাসরি শিরাণুতে চলে যায় এবং কিছু রক্ত একটু ঘুরে জালিকা দিয়ে, শিরাণু জালকের মধ্য দিয়ে শিরাণুতে গিয়ে পড়ে। এইটাই মোটামুটি ধামনিক জালকের রক্ত সংবহন ব্যবস্থা।

ধামনিক জালকে রক্ত সংবহন সম্বন্ধে কিছু তথ্য ঃ

১। আমাদের শরীরে সমগ্র রক্তবাহ জালকের জ্যামিতিক পরিমাপ কম-বেশি ৬৩০০ স্কোয়ার মিটার কিন্তু বিশ্রামের সময় খুবই অল্প সংখ্যক ধামনিক জালক আদান-প্রদানের জন্য পরিস্রাবণের (**Filtration**) কাজে নিযুক্ত থাকে।

২। বিশ্রামের সময় মাত্র ৭৫—১০০ মিলিলিটার রক্ত, রক্তবাহ জালকের মধ্যে থাকে এবং মাত্র এই পরিমাণ রক্তই গ্যাস ও পুষ্টি আদান-প্রদান কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩। রক্ত প্রবাহ খুব ধীর গতিতে, অর্থাৎ ০·৫ থেকে ১ মিলিলিটার প্রতি সেকেণ্ডে, চলতে থাকে। গতি কিন্তু সর্বদা অবিচ্ছেদ্যভাবে চলতে থাকে। এই অবিচ্ছেদ্য গতি সিস্টোলের সময় হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের জন্য, এবং ডায়াস্টোলের সময়, ধমনীর প্রত্যাগতির জন্য হয়ে থাকে। প্রসারণের পর ধমনীর স্বাভাবিক প্রত্যাগতি, রক্ত চলাচলে **সহায়ক পাম্প** (**Auxillary pump**) হিসাবে কাজ করে।

৪। রক্ত জালকে রক্তচাপ খুব কম থাকে, ধামনিক জালকের দিকে ৩২ **mm. Hg.** এবং শিরাণু জালকের দিকে ১২ **mm. Hg.** থাকে।

৫। স্বয়ংক্রিয় সংকোচক-প্রসারক অঙ্গ, যা প্রান্তীয় ধমনিকার বেষ্টনী প্রাচীরে আবদ্ধ থাকে, সংকোচিত-প্রসারিত হয়ে ধামনিক জালকে রক্ত প্রবেশকে নিয়ন্ত্রিত রাখে।

৬। ধামনিক ও শিরাণু জালকে রক্ত প্রবাহ যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে বরাবর চলতে থাকে তা সরাসরি ভেকের জীব কিম্বা লিপ্ত-পাদ (**Web of toes**) অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যায়।

রক্তবাহ জালকে রক্ত প্রবাহে বস্তু বিশেষের প্রভাব ঃ

১। **তাপ ও শীতলতা ঃ** শরীরের কোন স্থানের উত্তাপ যে কোন কারণে বৃদ্ধি পাইলে যথা বাহির থেকে উত্তাপ প্রয়োগে বা রোগজনিত কোষের উত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে যেমন ফোড়া খোস-পাঁচড়ার ক্ষেত্রে, রক্তবাহ জালকগুলি

স্ফীত হয় এবং রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়। আবার বরফ বা ঠাণ্ডা বস্তুর প্রভাবে রক্তবাহ জালক সংকোচিত হয়।

২। **আলোক ঃ** ইনফ্রারেড ও আলট্রাভায়লেট রশ্মির প্রভাবে রক্তবাহ জালক বিশেষভাবে প্রসারিত হয়ে থাকে।

৩। **রাসায়নিক বস্তু ঃ** যে সমস্ত ক্ষেত্রে কলার মধ্যে কার্বন ডায়ক্সাইড বৃদ্ধি পায় বা অক্সিজেন কম থাকে বা এইচ$^+$ অণু বৃদ্ধি পায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে রক্তবাহ জালক স্ফীত হয়।

৪। **ব্র্যাডিকাইনিন হর্‌মোন্ ঃ** স্থানীয়ভাবে কোন কারণে এই হর্‌মোন্ বৃদ্ধি পাইলে ধমনীগুলি অতিমাত্রায় স্ফীত হয় যার ফলে ধামনিক জালকে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

৫। **অ্যাড্রিনালিন ও নরঅ্যাড্রিনালিন ঃ** স্থানীয়ভাবে বা সাধারণ-ভাবে এই দুই হর্‌মোন্ বৃদ্ধি পাইলে ধমনিকাগুলি সংকোচিত হয় এবং রক্তবাহ জালকে রক্ত প্রবাহ স্তিমিত থাকে।

৬। **বিক্রিয়াজনিত পদার্থের প্রভাব ঃ** ল্যাকটিক এসিড, এডিনিলিক এসিড স্থানীয় ভাবে বৃদ্ধি পাইলে রক্তবাহ জালক স্ফীত হয়ে থাকে ও রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। হিসটামিন ও হিসটামিন জাতীয় বস্তু এইরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকে। স্থানীয় বিপাকীয় প্রয়োজনের জন্য কোন কোন কলা বা কলাসমূহের কার্য্যকারিতা বৃদ্ধি পাইলে যেমন ব্যায়াম, অন্য প্রকার শ্রম ইত্যাদির প্রভাবে, প্রয়োজনের তাগিদে রক্তবাহ জালকের রক্ত প্রবাহ বৃদ্ধি পায়।

৭। **শিরায় রক্তের চাপ বৃদ্ধি ঃ** শিরায় রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাইলে রক্তবাহ জালক নিষ্ক্রিয়ভাবে স্ফীত হয়।

৮। **স্নায়ুর প্রভাব ঃ** সিমপ্যাথেটিক নার্ভতন্তুকে উত্তেজিত করলে ধমনিকাগুলি সংকোচিত হয় যার ফলে জালকে রক্ত প্রবাহ কম হয়ে যায়।

রক্তবাহ জালকে রক্তের চাপ

১৯৩০ সালে ল্যানডিস নোখের গোরায় বা চামড়ার মধ্যে অনুপিপেট (Micropipette) প্রবেশ করিয়ে ম্যানোমিটারের সাহায্যে রক্তবাহ জালকের রক্তচাপ মাপতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গবেষণার দ্বারা দেখা গেছে ধমনিকার থেকে ধামনিক জালকে রক্তের চাপ কম। আবার ধামনিক জালক থেকে শিরাণু জালকে রক্তের চাপ কম। আগেই

বলা হয়েছে ধামনিক জালকে রক্তের চাপ ৩২ mm. Hg কিন্তু শিরাণু জালকে অনেক কম, ১২ mm. Hg.

রক্তবাহ জালকের ভঙ্গুরতা :

পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে শিরায় রক্তচাপ বৃদ্ধি পাইলে রক্তবাহ জালকেও রক্তের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে রক্তের লোহিত কণিকাগুলি রক্তবাহ জালকের বেষ্টনী প্রাচীর ভেদ করিয়া জালকের বাহিরে চলিয়া আসে। ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় যখন রক্তচাপ মাপা যন্ত্রের সাহায্যে বাহু বেষ্টনী বাহুতে বেঁধে বায়ুর চাপকে সিস্টোল ডায়াস্টোলের মাঝামাঝি অবস্থায় কিছুক্ষণ স্থির রাখলে ছোট ছোট রক্ত বিন্দুর সৃষ্টি হ'তে দেখা যায়। ঠোঁট দিয়ে অনেক্ষণ ধরে চামড়া চুষলেও ঐরূপ হয়। এই বিন্দুগুলিকে ইংরাজীতে পেটিচি (petichae) বলা হয়ে থাকে এবং শিরার রক্ত চাপ বৃদ্ধির জন্য লোহিত কণিকা চামড়ায় জমে ঐরূপ রক্ত বিন্দুর দাগ সৃষ্টি হতে দেখা যায় এবং শিরায় রক্ত চাপ বেশি হওয়ার জন্যই হয়ে থাকে, অবশ্য এটাও দেখা গেছে শিরায় রক্তচাপ বাড়লেই যে রক্তবিন্দুর দাগ সব ক্ষেত্রেই দেখা যাবে তা নয়। ল্যানডিস নামক এক গবেষক বলেছিলেন যে ধামনিক জালক বেষ্টনীর ভেদ্যতা ও তার ভঙ্গুরতা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত নয়।

চর্মে রক্তবাহ জালকের প্রতিক্রিয়া :

শ্বেত রেখা : যদি কোন ভোতা যন্ত্রের সাহায্যে হালকা ভাবে চামড়ার কোন একটি রেখা টানা যায় সেই জায়গা বরাবর অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল একটি শ্বেত রেখার সৃষ্টি হয়। চামড়ার এই প্রতিক্রিয়া রক্তবাহ জালকের প্রতিক্রিয়া। কেন এমন হয় তার কারণ স্বরূপ যা বলা হয়ে থাকে তা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

১। রক্তবাহ জালকের এণ্ডোথিলিয়েল কোষগুলি চাপরূপ আঘাত জনিত উত্তেজনায় সংকোচিত হয়ে থাকে যার ফলে রক্ত চলাচল সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয় এবং অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল ঐ শ্বেত রেখার সৃষ্টি হয়।

২। অনেকে মনে করেন ঐ প্রতিক্রিয়া স্নায়ু ঘটিত। তাদের মতে আঘাতের বা চাপের দ্বারা স্নায়ুপুচ্ছ উত্তেজিত হয়ে এণ্ডোথিলিয়েল কোষের সঙ্কোচন ঘটায়। কিন্তু অনেকে মনে করেন এই বিশ্লেষণ ঠিক নয় কারণ যে জায়গায় এই পরীক্ষা করা হবে সেই জায়গার স্নায়ু আগে থেকে কেটে দিয়ে তারপর রক্তচাপ যন্ত্রের সাহায্যে বাহু-বন্ধনীর বায়ু চাপ ২০০ mm. Hg পর্যন্ত চাপ উঠিয়ে দিয়ে উপরি উক্তভাবে পরীক্ষা করলে ঐ সাদা দাগের সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

ঐ পরীক্ষা থেকে সহজেই বোঝা যায় ঐ প্রতিক্রিয়া স্নায়ু ঘটিত নয়। এটা জানা আছে ৪০-৬৯ mm. Hg পর্য্যন্ত চাপ রক্তবাহ জালক সহ্য করতে পারে, কিন্তু এই মাত্রার উর্দ্ধ চাপে তারা উত্তেজিত হয় (এণ্ডোথিলিয়েল কোষ) এবং সংকোচিত হয় যার ফলে শ্বেত রেখার সৃষ্টি হয়। উপরি উক্ত পরীক্ষা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে রক্তবাহ জালকের নিজস্ব সংকোচিত-প্রসারিত হওয়ার শক্তি আছে। রুগেট কোষ এই প্রতিক্রিয়ায় যুক্ত হয় না কারণ ঐ কোষগুলি সর্বদাই ছড়ান ছিটান থাকে।

অতএব চামড়ার উপর শ্বেত-রেখা প্রতিক্রিয়া এণ্ডোথিলিয়েল কোষের অ্যামিবার মত নড়চড়া করা শক্তির জন্য হয়ে থাকে অর্থাৎ এরা যখন কুঁচকে যায় বা সংকোচিত হয় তখন ঐ শ্বেত রেখার সৃষ্টি হয়।

ত্রয়ী প্রতিক্রিয়া (Triple response)

যদি চামড়ার উপর ভোতা যন্ত্রের সাহায্যে বেশ জোরে চাপ দিয়ে রেখা টানা যায় নিম্নলিখিত তিন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় :

১। চাপ বরাবর অল্পক্ষণ বাদে একটি লাল রেখার দাগ দেখা যায়।

২। চার পাঁচ মিনিট বাদে বা এর কিছু আগে ঐ লাল দাগ ছড়িয়ে পড়ে।

৩। তার পর ঐ দাগ বরাবর প্রায় ২ মিলিমিটার উঁচু ফোলা দেওয়ালের সৃষ্টি হতে দেখা যায়।

চাপের আঘাতে চামড়ার উপরি উক্ত প্রতিক্রিয়া তিনটিকে **ত্রয়ী প্রতিক্রিয়া** (Triple response) বলা হয়ে থাকে। ঐ ত্রয়ী প্রতিক্রিয়া কেন হয় তার কারণগুলির বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হ'ল :

১। ঐ লাল দাগ ধমনিকা ও ধামনিক জালকের প্রসারণের জন্য হয়ে থাকে। আগে ধারণা ছিল যে ঐ প্রতিক্রিয়া স্নায়ু ঘটিত কিন্তু পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে এই প্রতিক্রিয়া স্নায়ু ঘটিত নয় কারণ আগে থেকে স্নায়ু নষ্ট করে দিলেও ঐ প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে।

চামড়ার উপর ভোতা যন্ত্র দ্বারা চাপ দিয়ে লম্বালম্বি টান দিলে কোষগুলি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে হিসটামিন বা হিসটামিন জাতীয় পদার্থ নির্গত হয় যা সরাসরি ধামনিক জালক ও ধমনিকাদের প্রসারিত করে এবং লাল রেখার উৎপত্তি হয়।

২। রেখার মত লাল দাগ ছড়িয়ে গিয়ে চওড়া হয়ে যায় এবং চওড়া দাগের

উভয় পার্শ্বে খাঁজকাটা দাগও দেখা যায়। কারণ স্বরূপ বলা হয় এটি স্নায়ু ঘটিত ব্যাপার, **অ্যাকসন রিফ্লেক্স**। আঘাতের জন্য স্নায়ুপুচ্ছ উত্তেজিত হয়ে অন্তর্মুখী নার্ভ বিভব নিয়ে পশ্চাৎ নার্ভ রুটের গ্যাংলিয়ণে যায় এবং সেখান থেকে অ্যান্টিড্রোমিক নার্ভ ফাইবার মাধ্যমে বহির্মুখী নার্ভ বিভব এসে ধমনিকাদের প্রসারিত করে দেয় এবং ধামনিক জালককেও প্রসারিত করে দেয়।

৩। **ফুলে ওঠা চামড়া** (Wheel): এই প্রতিক্রিয়া হিসটামিন বা হিসটামিন জাতীয় পদার্থের দ্বারা ধামনিক জালকের প্রসারণের দরুণ হয়ে থাকে। এতে স্নায়ুর কোন ক্রিয়া নাই।

ত্রয়ী প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু আলোচনা:

এটা লক্ষ্য করা গেছে, চামড়ার ত্রয়ী প্রতিক্রিয়া হিসটামিন ০·০১ মিলিগ্রাম চামড়ার নিচে ইনজেকসন দ্বারা ঘটান যেতে পারে। হিসাটামিন স্থানীয় প্যারাসিমপ্যাথেটিক স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, যার ফলে রক্তবাহ জালকের ছিদ্র-গুলিকে বড় ক'রে দেয় এবং এই জন্য রক্ত রস চুইয়ে বাহিরে আসে এবং স্থানীয় ভাবে গোলাকার ফুলো (wheel) বা রেখার মত ফুলো দাগের সৃষ্টি করে।

শুধুমাত্র হিসটামিনই যে ঐরূর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তা নয়, কারণ হিসটামিন প্রতিক্রিয়া রোধ করার জন্য ঔষধ দেওয়া সত্ত্বেও ত্রয়ী প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকে। এ-থেকেই মনে হয় শুধু হিসটামিন নয়, হিসটামিন জাতীয় এক বা একাধিক বস্তু ঐ প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

নিম্ন লিখিত বস্তুগুলি প্রয়োগ করে দেখা গেছে এই পদার্থগুলিও ত্রয়ী প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে:

ব্রাডিকাইনোজেন রক্তরসের আলফা গ্লোবিউলিনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্রাডিকাইনিন সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এটি একটি উৎসেচক।

অ্যাসিটিলকোলিন প্রয়োগেও ধামনিক জালক প্রসারিত হয়।

হাইড্রক্সি-ট্রিপটামাইনও ধামনিক জালককে প্রসারিত করে।

শিরা শিরাণু শিরাণু জালক

আগেই বলা হয়েছে ধামনিক জালক থেকে রক্ত সরাসরি শিরাণু জালকে চলে যায়, সেখান থেকে শিরাণু, ছোট শিরা, মাঝারি শিরা ও বড় শিরা হয়ে অবশেষে দুইটি মহাশিরার মাধ্যমে যথা উর্দ্ধ মহাশিরা (Superior vena cava)

ও নিম্ন মহাশিরা (**Inferior vena cava**), রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে এসে পৌছায়। নদী জলধারাকে সমুদ্রে নিয়ে যায় এবং সমুদ্রের যত কাছাকাছি

প্রতিটি ক্যাপিলারি ০·৫—১ মিলিমিটার লম্বা ও ৮—১০ /μM ব্যাস।
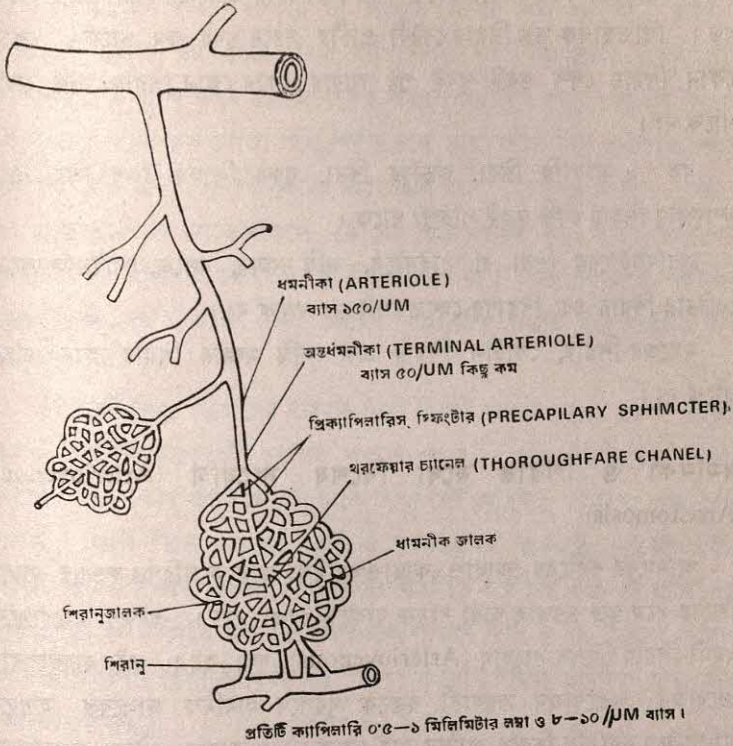
আসে বিভিন্ন স্রোতধারার সঙ্গে মিশে তত বড় হয়ে যায়। শিরাও তেমনি একে অন্যের সঙ্গে মিশে বড় হ'তে থাকে এবং পরিশেষে উপরি উক্ত দুটি মহাশিরা মাত্র শরীরের সমস্ত রক্ত নিয়ে হৃৎপিণ্ডে পৌছে দেয়।

শিরার শ্রেণী বিন্যাস :

ছোট শিরা—ব্যাস ২০ μ

মাঝারি শিরা—„ ১—৯ মিঃ মিঃ

বড় শিরা— „ ৯—২৫ ” ”

শিরার গঠন :

সাধারণতঃ ধমনী ও শিরার গঠনে একই রকম নক্সা থাকে এবং ধমনীর মত বেশির ভাগ শিরারই তিনটি স্তরের বেষ্টনী প্রাচীর আছে। ভিতর থেকে বাহিরে

—এই স্তরগুলি যথাক্রমে ১। টিউনিকা ইনটিমা, ২। টিউনিকা মিডিয়া ও টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়া। ভিতরে রক্তের চাপ কম থাকার জন্য শিরার বেষ্টনী প্রাচীরের ঘনত্ব ধমনীর থেকে কম কিন্তু শিরার প্রস্থচ্ছেদ ব্যাস অপেক্ষাকৃত বড়। স্থিতিস্থাপক তন্তু শিরার বেষ্টনী প্রাচীর গঠনে খুবই কম থাকে। কোন কোন শিরায় পেশী স্তরটি খুবই পুষ্ট আবার কোন কোন শিরায় পেশী স্তরটি থাকে না।

বড় ও মাঝারি শিরা, জড়ায়ুর শিরা, পুরুষ লিঙ্গের ডিপ শিরা এবং ফুসফুসীয় শিরায় পেশী স্তরটি পরিপুষ্ট থাকে।

ডুরাম্যাটারের শিরা বা সাইনাসে, অস্থি মজ্জায়, মগজে, স্পাইনাল কর্ডে, রেটিনার শিরায় এবং শিরাণুর ক্ষেত্রে পেশী স্তর থাকে না।

মগজের শিরায়, পোর্টাল শিরায় এবং অস্থি মজ্জার শিরায় কোন ভালব থাকে না।

ধমনিকা ও শিরার মধ্যে বিশেষ সংযোগ (Arteriovenous Anastomosis)

আমাদের শরীরের কোথাও কোথাও ধমনিকা জালকে পরিণত হওয়ার আগে শিরার সঙ্গে ক্ষুদ্র রক্তবাহ দ্বারা সংযুক্ত থাকতে দেখা যায়। এইরূপ সংযোগকে ধমনী-শিরার বিশেষ সংযোগ (Arteriovenous) বলা হয়। এই ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন অপ্রয়োজন অনুযায়ী রক্তকে ঘুরপথে ধামনিক জালকের মাধ্যমে না-পাঠিয়ে সরাসরি শিরায় পাঠান হয়ে থাকে। এ-কারণে এইরূপ সংযোগকে সাণ্ট রক্তবাহ (shunt vessels) বলা হয়ে থাকে।

ধমনী-শিরার বিশেষ সংযোগ আমাদের শরীরে চামড়ায়, বিশেষভাবে আঙ্গুলের চামড়ায়, নাসিকা মধ্যের ঝিল্লিতে, অন্ত্রে, থাইরয়ড্ গ্রন্থীতে ও সিমপ্যাথেটিক গ্যাংলিয়নে পাওয়া যায়। শিশু মাতৃ গর্ভে থাকার সময় ফুলের (Placenta) মধ্যে ধমনী-শিরার সংযোগ ব্যবস্থা খুবই বেশি সংখ্যায় দেখতে পাওয়া যায়।

ধমনী থেকে শিরায় সংযোগকারী রক্তবাহের বিশেষত্ব হ'ল এদের গঠনে পেশী স্তর (টিউনিকা মিডিয়া) খুবই পুষ্ট এবং সিমপ্যাথেটিক স্নায়ু দ্বারা বিশেষ ভাবে পরিসেবিত। স্থানীয় প্রয়োজনের উপর নির্ভর ক'রে উপরি উক্ত পেশী সংকোচিত বা প্রসারিত হয়ে থাকে। এই রকম সংযোগের কার্য্যকারিতা সাধারণ জলের

কলের (**Tap**) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজন হলে এই সংযোগকারী পথ খুলে যায় আবার প্রয়োজন না হ'লে এই রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় যেমন আমরা দরকার না লাগলে জলের কল বন্ধ করে রাখি। অবশ্য এই খোলা বন্ধ হওয়া সমস্ত ব্যাপারটাই স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত। যখন এই যোগাযোগ বন্ধ থাকে তখন রক্ত জালকের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। আবার যখন খোলা থাকে তখন রক্ত সোজা পথে শিরায় চলে যায় ফলে রক্ত চলাচলে সময় কম লাগে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বেশি রক্ত যাতায়াত করতে পারে। এই ব্যবস্থা বেশিক্ষণ চলতে থাকলে কোষের পুষ্টি বিঘ্নিত হয় কারণ জালকের মধ্য দিয়ে রক্ত না-গেলে কোষেরা পুষ্টি নিতে পারে না। রক্ত চলাচলই শরীরের উত্তাপ রক্ষা করার কারণ এবং চলাচল যত বেশি মাত্রায় হবে ততই উত্তাপ বৃদ্ধি পাবে।

এই ধমনী-শিরা সংযোগের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট স্থানের সাময়িক ভাবে বেশি চলালল করতে পারে। তাই ধমনী-শিরা বিশেষ সংযোগ যখন কোন জায়গায় চালু থাকে তখন সেই জায়গার উত্তাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অতি শীতে আঙ্গুলের ডগা ও আশপাশের স্থানগুলি, নাকের ঝিল্লি প্রভৃতি স্থানগুলি স্বাভাবিকভাবে অধিকতর শীতলীত হয়ে যায় এবং এই প্রতিক্রিয়া থেকে শরীরকে বাঁচানর জন্য রক্ত চলাচলকে বাড়িয়ে দিয়ে ঐ সব স্থানের উত্তাপ সংরক্ষণের উপায় হিসাবে ধমনী-শিরা বিশেষ সংযোগ ব্যবস্থা প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা পেয়েছি।

গ্লোমাস :

গ্লোমাস এক রকমের অতি উচ্চ মানের ধমনী-শিরা সংগোগ। এই রকমের ধমনী-শিরা বিশেষ সংযোগ নোখের নিচে, আঙ্গুলের ডগায় ও কানে দেখতে পাওয়া যায়।

গঠন : ম্যাসনের গবেষণার ফসল থেকে গ্লোমাসের গঠন সম্বন্ধে যে পরিচয় আমরা পেয়েছি সেই গঠন প্রকৃতি নিম্নে বিবৃত করছি :

গ্লোমাস একটি সংযোজক কলার আবরণ পরিবৃত আধার যার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ধমনিকা প্রবেশ করে। এই আধারের মধ্যে ধমনিকাটি যতই অগ্রসর হতে থাকে ততই ক্ষীণতর হতে থাকে এবং এই ধমনিকার বেষ্টনী প্রাচীরের স্থিতি-স্থাপক কলার তন্তুগুলি ক্রমশঃ বিলোপ হয়ে যায় এবং পুরু ইপিথিলিয়ামের মত কোষ দ্বারা পরিবৃত থাকতে দেখা যায়। সংযোগকারী ধমনিকা এককভাবে বা

দ্বিধা বিভক্ত হয়ে থাকতে পারে এবং সোজাসুজি না গিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে চলতে থাকে। ঐ সংযোজক কলার আধারে প্রচুর পরিমাণে স্বয়ক্রিয় ঐচ্ছিক (**Motor**) নার্ভ তন্তু দ্বারা পরিসেবিত থাকতে দেখা যায়। এই ধমনিকাটি পরিশেষে একটি ফানেলের মত আকারের শিরায় শেষ হয় এবং পেরিগ্লোমিক শিরার মাধ্যমে, যেটি এই গ্লোমাসরূপ অঙ্গের উপরে বাহিত থাকে, সাধারণ স্থানীয় শিরার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

এটা ধারণা করা হয় যে গ্লোমাসের ঐ প্রকার অঙ্গ শয্যা ও রক্তবাহের গতি প্রকৃতি রক্ত চলাচলকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং স্থানীয়ভাবে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করে।

বিশেষ ধমনিকা-শিরা সংযোগ ও ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আরো আলোচনা ঃ

আগেই আমরা ধমনিকা-শিরা বিশেষ সংযোগ ও তাদের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। এখন আমরা তাদের কার্য্য-কারণ একত্রে বিশ্লেষণ করছি ঃ

(১) ধামনিক-শিরা বিশেষ সংযোগ ব্যবস্থা বিশেষ স্থানের রক্ত চলাচলের একটি অতিপ্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

(২) এই ব্যবস্থা দ্বারা স্থানীয় ভাবে ও সাধারণ ভাবে উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ রক্ত চলাচলের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যখন পারিপার্শ্বিক উত্তাপ বেশি থাকে তখন ধমনিকা ও তার সঙ্গে যুক্ত রক্তবাহ জালক উভয়েই শিথিল থাকে যার ফলে রক্ত চলাচলে সময় বেশি লাগে এবং এভাপোরেশন ও রেডিয়েশন প্রকৃয়ায় উত্তাপের ক্ষয় হয়। যখন পারিপাশ্বিক উত্তাপ বেশ কম থাকে তখন শিরা সংযোগকারী ধমনিকা খুলে যায় এবং জালক সংযোগকারী রক্তবাহ (ধমনিকা) সংকোচিত হয় যার ফলে স্থানীয়ভাবে বেশি রক্ত চলাচল করে এবং উত্তাপ সংরক্ষিত হয়।

৩। যখন ক্ষুদ্র অন্ত্রের ভিলাই-এর মাধ্যমে পাচিত খাদ্য বস্তু আত্মস্থ হতে থাকে তখন ধমনিকা-শিরা সংযোগ পথে রক্ত চলাচল বন্ধ থাকে কিন্তু ধামনিক জালকের মাধ্যমে রক্তচলাচল হতে থাকে এবং পাচিত খাদ্য বস্তু আত্মস্থ হওয়ার জন্য এই ব্যবস্থা প্রয়োজন সাপেক্ষ। এই ভাবে যখন খাদ্য বস্তু পাচিত হচ্ছে কিন্তু শেষ হয় নাই এবং আত্মস্থও হচ্ছে না তখন ধমনিকা-শিরা বিশেষ সংযোগ খোলা থাকে।

৪। কারো কারো মতে ধমনিকা-শিরা সংযোগ ব্যবস্থা রক্ত চাপকেও নিয়ন্ত্রণে রাখে।

৫। নবজাত শিশুদের ধমনিকা-শিরা বিশেষ সংযোগ ব্যবস্থা ঠিকমত গড়ে ওঠে না এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা অবলুপ্তির পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকে যার ফলে ঐ উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ শিশুদের ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে শৈত্য প্রবাহ ও উত্তাপ প্রবাহ উভয় আবহাওয়াই ক্ষতিকারক হ'য়ে থাকে।

সাইনুসয়ডস (Sinusoids)

আমাদের শরীরের কোন কোন অঙ্গে যেমন যকৃত, প্লীহা, এড্রিনাল ও পিটুইটারি গ্রন্থি এবং অস্থি মজ্জার স্থানে স্থানে ধমনী ও শিরার সংযোগ জালকের মাধ্যমে না হ'য়ে এক প্রকার আঁকাবাঁকা প্রশস্ত রক্তবাহের মাধ্যমে হ'য়ে থাকে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে মিনট নামে এক গবেষক এই রক্তবাহের যথাযথ সংজ্ঞা নিরূপণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন সাইনুসয়ড এক প্রকার রক্তবাহ যাদের গহ্বরের ব্যাস, বরাবর এক প্রকার নহে, কোথাও সরু, কোথাও প্রশস্ত, এবং এই রক্তবাহ যে অঙ্গে থাকে সেই অঙ্গ ও রক্তবাহের মধ্যে যতসামান্য সংযোজক কলা বা কলার অংশ বিশেষ থাকে। সাধারণতঃ এদের গহ্বরের ব্যাস ৫-২০μ এর মধ্যে থাকে।

সাইনুসয়ডের বিশেষত্ব :

১। এই রক্তবাহের ভিতরের ব্যাস, বরাবর এক প্রকার নহে, কোথাও প্রশস্ত আবার কোথাও সংকীর্ণ।

২। এদের বেষ্টনী প্রাচীর অন্যান্য রক্তবাহের মত বরাবর এণ্ডোথিলিয়েল কোষ দ্বারা গঠিত হয় না। এণ্ডোথিলিয়েল কোষ ও ম্যাক্রোফাজ (Macrophage) জাতীয় কোষ মিলিত ভাবে বেষ্টনী প্রাচীর তৈয়ার করে, অবশ্য এণ্ডোথিলিয়েল কোষই বেশি থাকে। যকৃতে এণ্ডোথিলিয়েল কোষ ও কাফফার কোষ (Kuffer's cells), এক প্রকার ফ্যাগোসাইটিক কোষ, মিলিত ভাবে বেষ্টনী প্রাচীর তৈয়ার করে। এই ফ্যাগোসাইটিক কোষগুলি যেখানে থাকে সেখানে তারা ঝাড়ুদারের কাজ করে থাকে। যকৃতে এরা ধ্বংস-প্রায় লোহিত কণিকাগুলিকে ধরে নেয় এবং তাদের রক্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে রক্তকে সাফ রাখে।

৩। এই রক্তবাহ যে অঙ্গে থাকে সেই অঙ্গের মধ্যে সংযোজক কলার

অংশ প্রায় থাকে না বললেই চলে অর্থাৎ খুবই সামান্য থাকে। এর ফলে এই রক্তবাহ নলটি যে অঙ্গে থাকে সেই অঙ্গের কলার সহিত ঘনিষ্ট সম্বন্ধযুক্ত হ'য়ে থাকে এবং এই রক্তবাহের রক্তের সঙ্গে অঙ্গের কোষের আদান প্রদান সহজতর হয়।

৪। কোথাও কোথাও বেষ্টনী প্রাচীরে ফাঁক থাকতেও দেখা যায়। এতে ক'রে রক্ত সরাসরি কোষের সংস্পর্শে আসে। প্লীহার ক্ষেত্রে শিরার সাইনাসে এইরূপ ব্যবস্থা প্রচুর সংখ্যায় ফাঁক থাকতে দেখা যায়। এড্রিনাল গ্রন্থিতে ধমনিকা সরাসরি সাইনুসয়ডে পরিণত হ'তে দেখা যায়।

সাইনুসয়ডের শ্রেণী বিন্যাস :

গঠন অনুযায়ী দুই রকম সাইনুসয়ড দেখতে পাওয়া যায়—

১। ডিসকনটিনুয়াস (Discontinuous) ও ২। ফেনেসট্রেটেড সাইনুসয়ড।

১। **ডিসকনটিনুয়াস (Discontinuous) সাইনুসয়ড :** যকৃতে এই রকম সাইনুসয়ড পাওয়া যায়। এদের দেওয়াল কোথাও এণ্ডোথিলিয়েল কোষ এবং কোথাও এণ্ডোথিলিয়েল ও একপ্রকার ম্যাক্রোফাজ (কাফফার কোষ) দ্বারা গঠিত হয়। কোথাও কোথাও দেওয়ালে ফাঁক থাকে যা আগেই বলা হয়েছে।

২। **ফেনেসট্রেটেড সাইনুসয়ড :** এইরূপ রক্তবাহ অন্তর্মুখী গ্রন্থিতে পাওয়া যায়। এরা বহুলাংশে ফেনেসট্রেটেড ধমনিকা জালকের মত। বেসমেণ্ট মেমব্রেন সম্পূর্ণ থাকে কিন্তু জায়গায় জায়গায় এণ্ডোথিলিয়েল কোষ খুব পাতলা হয়ে যায় এবং এইরূপ পাতলা অংশে খুব ছোট ছোট ছিদ্র থাকতে দেখা যায় যেগুলি বেসমেণ্ট মেমব্রেন দ্বারা পরদার মত ঢাকা থাকে। কখনও দুই কোষের মধ্যে ফাঁক থাকে না বা এই রক্তবাহের দেওয়াল গঠনে অন্য কোন রকমের কোষ থাকে না।

সাইনুসয়ডের উৎপত্তি :

জন্মকালে বৃহৎ শিরা-হ্রদ থেকে সাইনুসয়ডের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এইরূপ বৃহৎ শিরা-হ্রদ বৃদ্ধিরত অঙ্গ কলার মধ্যে আটকে যায় এবং বর্দ্ধমান কোষগুলি এই রক্তবাহের দেওয়ালকে রক্তবাহ গহ্বরের ভিতরের দিকে ঠেলে দেয় এবং কোথাও কোথাও দেওয়ালকে ভেদ করে রক্তবাহের ভিতরে ঢুকে যায় যার ফলে রক্তবাহ-গুলি কোথাও সরু কোথাও প্রশস্ত থাকতে দেখা যায়।

রক্তের চাপ

রক্তবাহের মধ্যে রক্ত চলাচল কালে রক্ত-স্তম্ভ রক্তবাহ দেওয়ালে যে পার্শ্ব চাপের সৃষ্টি করে তাকে রক্তের চাপ (**Blood pressure**) বলা হয়। ধমনীতে, শিরাতে ও ধামনিক জালকে যেখান দিয়েই রক্ত চলাচল করুক না কেন সব জায়গাতেই রক্তের একটা নির্দিষ্ট চাপ থাকে এবং ধমনীর বেলায় সেই চাপকে ধামনিক রক্ত চাপ (**Arterial blood pressure**), শিরার বেলায় শিরার রক্ত চাপ (**Venous pressure**) এবং ধামনিক জালকের বেলায় ধামনিক জালকের রক্ত চাপ (**Capillary pressure**) বলা হয়।

ধমনীতে রক্ত চাপ (Arterial blood pressure) :

সাধারণ ভাবে রক্তের চাপ (**Blood pressure**) বলতে আমরা ধমনীর রক্ত চাপকে বুঝে থাকি। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন-প্রসারণের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত থাকায় এই ধামনিক রক্ত চাপকে প্রকাশ করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে থাকি :

১। **সিস্টোলিক রক্ত চাপ (Systolic pressure) :** হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের (**Left ventricle**) সংকোচন কালে ধমনীর উপর সর্বাধিক যে চাপ মাপা যায় সেই চাপকে **সিস্টোলিক চাপ** (**Systolic pressure**) বলা হয়।

২। **ডায়াস্টোলিক চাপ (Diastolic pressure) :** হৃৎপিণ্ড নিলয়ের বিশ্রামের সময় ধমনীর মধ্যে যে সর্বোচ্চ চাপ মেপে পাওয়া যায় তাকে **ডায়া-স্টোলিক চাপ** বলা হয়।

৩। **পাল্‌সের চাপ (Pulse pressure) :** সিস্টোলিক চাপ থেকে ডায়াস্টোলিক চাপ বাদ দিলে যে চাপ পাওয়া যায় তাকে **পাল্‌সের চাপ (pulse pressure)** বলা হয়। যেমন সিস্টোলিক চাপ ১২০ **mm.Hg** এবং ডায়াস্টোলিক চাপ ৮০ **mm Hg.** হ'লে পাল্‌সের চাপ হবে ১২০ − ৮০ = ৪০।

৪। **মধ্যবর্তী বা রক্তের গড় চাপ (Mean pressure) :** ডায়া-স্টোলিক চাপের সঙ্গে পাল্‌স চাপের ⅓ অংশ যোগ করলে যে যোগফল পাওয়া যায় তাকে মধ্যবর্তী বা **গড় রক্তের চাপ** বলা হয়ে থাকে।

৫। **মৌলিক চাপ (Basal pressure) :** কোন ব্যক্তির প্রধান আহারের ১০/১২ ঘণ্টা পর, আধ ঘণ্টা স্বাভাবিক আরামদায়ক গরম ঘরে

বিশ্রামের পর যে রক্ত চাপ নেওয়া হয় তাকে **মৌলিক রক্ত চাপ** (Basal pressure) বলা হয়।

৬। **তাৎক্ষনিক বা যখন তখনের রক্ত চাপ** (**Casual pressure**) **:** রক্তের চাপ সব সময় একপ্রকার দেখা যায় না। একই লোকের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, রক্ত চাপ ভিন্ন হতে পারে। যখন-তখন, সাধারণ কাজের মধ্যে, যে রক্ত চাপ মেপে পাওয়া যায় তাকে **তাৎক্ষনিক রক্ত চাপ** (casual pressure) বলা হয়ে থাকে। মৌলিক চাপের থেকে সাধারণতঃ এই চাপ বেশি থাকে।

ব্যবহারিক প্রথা অনুযায়ী আমরা সাধারণতঃ সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক ও পাল্‌সের চাপ মেপে থাকি এবং এই তিন প্রকার চাপের অনুপাত (ratio) ৩ : ২ : ১ অর্থাৎ ১২০ mm. Hg সিস্টোলিক, ৮০ ডায়াস্টোলিক চাপ হলে অনুপাত হবে ১২০ : ৮০ : ৪০।

রক্ত চাপের প্রয়োজনীয়তা বা কার্য্যকারিতা :

১। জীবন রক্ষার জন্য হৃৎপিণ্ড রক্তকে চাপের মাধ্যমে ধমনী ও তার শাখা-প্রশাখায় প্রেরণ করে (সিস্টোলের সময়) এবং ধমনীও নিজ প্রত্যাগতি শক্তি দ্বারা রক্ত চলাচলকে ডায়াস্টোলের সময় অব্যাহত রাখে। রক্ত চলাচল জীবনের স্পন্দন কারণ এরই মাধ্যমে কলাসমূহ পুষ্টি (খাদ্য ও অক্সিজেন) পেয়ে থাকে এবং বিপাকীয় আবর্জনা ত্যাগ করে থাকে এবং এই স্পন্দনকে ঠিক রাখতে, সরবরাহ ঠিক রাখতে রক্ত একটা নির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হওয়া একান্ত দরকার।

২। রক্তচাপই চালক শক্তি (Motive force) যার দ্বারা রক্তের প্লাজমা ধামনিক জালকের দেওয়াল ভেদ করে কলা ও কোষে পুষ্টি ও অক্সিজেন সরবরাহ করিতে সক্ষম হয়।

৩। রক্তচাপই চালক শক্তি যার দ্বারা প্রস্রাব তৈয়ার হতে পারে।

৪। রক্তচাপই চালক শক্তি যার দ্বারা শিরার মধ্য দিয়ে রক্তপ্রবাহ অব্যাহত থাকে।

৫। রক্তচাপের জন্য কলারসের (Tissue fluid) সৃষ্টি হয় এবং সেই কলারস কলা থেকে লসিকার (lymphatics) মাধ্যমে বড় মাপের মলিকিউল ও কিছু কিছু বর্জনীয় পদার্থগুলিকে কলা থেকে সরিয়ে এনে শিরার মাধ্যমে প্রবাহিত করে বিলি বন্দোবস্ত করে থাকে।

স্বাভাবিক রক্ত চাপ (Normal blood pressure) :

সুস্থ শরীরে, বেশ কয়েক ঘণ্টা বিশ্রামের পর একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ ১১০—১৪৫ **mm Hg.**-এর মধ্যে থাকে এবং গড়ে ১২৫—১৩০ **mm. Hg**-এর মধ্যে থাকলে রক্তচাপ স্বাভাবিক বলা হয়ে থাকে। স্বাভাবিক ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৬০—৮০ **mm. Hg.**-এর মধ্যে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রীলোকদের ক্ষেত্রে সিস্টোলিক রক্তচাপ ৫ **mm. Hg.** কম থাকে।

অস্বাভাবিক রক্তচাপ :

সুস্থ শরীরে, সম্পূর্ণ বিশ্রামের পর, সিস্টোলিক রক্তচাপ যদি ১৫০ **mm Hg**-র উর্দ্ধে থাকে এবং ডায়াস্টোলিক ৯০ **mm. Hg.**-র উর্দ্ধে থাকে উভয় ক্ষেত্রকেই রক্ত চাপাধিক্য (**Hypertension**) বা অস্বাভাবিক রক্তচাপ বলা হয়ে থাকে। ঐরূপ একই অবস্থায় (সুস্থ শরীরে বিশ্রামের পর) সিস্টোলিক রক্তচাপ যখন ১০০ **mm. Hg.**-এর নিচে থাকে এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৫০ **mm. Hg.**-র নিচে থাকে ঐ উভয় ক্ষেত্রকেই কম রক্তচাপ (**Low Blood Pressure**) বা হাইপোটেনস (**Hypotension**) বলে।

উচ্চ রক্তচাপের স্তরভেদে পরিচিতি বা শ্রেণীবিন্যাস :

উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের মাত্রাকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং এই ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের পরিমাপকে অবলম্বন ক'রে উচ্চ
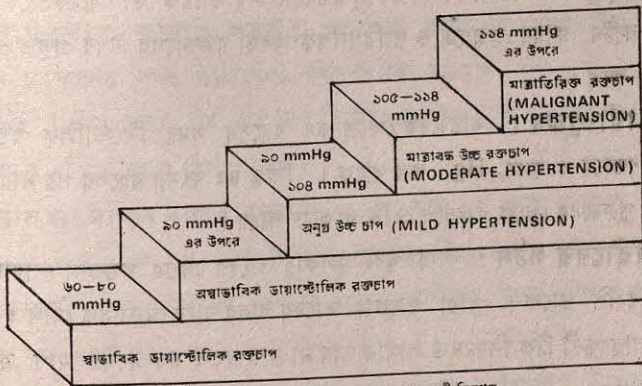
ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের স্তর বা শ্রেণী বিন্যাস

রক্তচাপের স্তরবিন্যাস করা হয়েছে। যখন ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০—১০৪ **mm.Hg.**-র মধ্যে থাকে তখন ঐ উচ্চ রক্তচাপকে **অনুগ্র উচ্চচাপ** বা **মাইল্ড**

হাইপারটেনসন (Mild Hypertention) বলা হয়। যখন ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১০৫—১১৪ mm.Hg.-র মধ্যে থাকে তখন ঐ উচ্চ রক্তচাপকে **মাত্রাবদ্ধ বা মাঝারি রক্তচাপ** (Moderate Hypertension) বলা হয়। ডায়াস্টোলিক চাপ ১১৪ mm.Hg.-এর উপরে থাকলে ঐ রক্তচাপকে **মাত্রা-রিক্ত রক্তচাপ বা ম্যালিগনাণ্ট হাইপারটেনসন** (Malignant Hypertention) বলা হয়।

বিভিন্ন বয়সে, নারী-পুরুষে ও বিভিন্ন সময়ে রক্তচাপের তারতম্য :

বয়স : বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের চাপ স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে থাকে। **নবজাতক শিশুর ক্ষেত্রে** সিস্টোলিক রক্তচাপ ২০-৬০ mm. Hg.-র মধ্যে থাকে। এদের ক্ষেত্রে গড় রক্তচাপ ৪০ mm. Hg.-তে থাকে। **১৪-১৫ দিন বয়স** হলে ঐ রক্তচাপ ৭০-৭৫ mm. Hg.-র মধ্যে থাকতে দেখা যায়। **এক মাস বয়স হলে** সিস্টোলিক রক্তচাপ ৯০ mm. Hg.-তে পৌছায়। **এক মাসের পর থেকে** সিস্টোলিক রক্তচাপ ক্রমশঃ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে যতক্ষণ না তারা যৌবনে পদার্পণ করে। **যৌবনে** সিস্টোলিক রক্তচাপ ১২৫-১৩০ mm. Hg.-এর মধ্যে থাকে।

৪০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে, পুরুষদের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ রক্তচাপ বাড়তেই থাকে এবং সাধারণতঃ স্বাভাবিক স্তরের উর্দ্ধেই থাকে। কিন্তু এই বয়স সীমার পর কোন্ রক্তচাপ স্বাভাবিক বা কোন্ রক্তচাপ অস্বাভাবিক তা সঠিকভাবে বলা খুবই কঠিন কারণ জন্মসূত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা রক্তচাপের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে।

নারী-পুরুষ : নারীদের ক্ষেত্রে কম বয়সের সময় সিস্টোলিক রক্তচাপ সাধারণভাবে ৫ mm. Hg. কম থাকে। কিন্তু ৪৫ বৎসর বয়সের পর নারীদের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে রক্তচাপ বেশি থাকতে পারে।

শরীরের গঠন : যারা খুবই স্থূলকায় তাদের ক্ষেত্রে রক্তচাপ সাধারণতঃ কিছু বেশি থাকে। যারা স্থূলকায় তাদের বাহুর ব্যাস অত্যধিক বেশি হওয়ার দরুণ বাহুবন্ধনী ঠিক নিয়মমত লাগান যায় না যার ফলে রক্তচাপের মাপ ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে।

সুপ্ত অবস্থায় : গভীর নিদ্রা অবস্থায় রক্তচাপ জাগ্রত অবস্থার থেকে সাধারণতঃ ১৫-২০ mm. Hg. বা আরও কম থাকতে দেখা যায়। কিন্তু ভাল

ঘুম না হ'লে বা নিদ্রায় ব্যাঘাত হ'লে রক্তচাপের কোন তারতম্য হয় না অর্থাৎ রক্তচাপ জাগ্রত অবস্থার মতই থাকে।

সকাল-সন্ধ্যায়ঃ রাত্রে বিশ্রামের পর বা নিদ্রার পর রক্তচাপ কম থাকে, তারপর সকাল থেকে বেলা ২টা পর্য্যন্ত রক্তচাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কিন্তু যারা রাত্রে কাজ করেন ও দিনে নিদ্রা যান তাদের ক্ষেত্রে সকালের দিকে রক্তচাপ বেশি থাকে।

দেহভঙ্গির তারতম্যেঃ দাঁড়ান অবস্থায় সিস্টোলিক রক্তচাপ কিছু কম থাকে ও ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ কিছু বেশি দেখা যায়। আধশোয়া অবস্থায় সিস্টোলিক রক্তচাপ দাঁড়ান অবস্থার থেকে কিছু বেশি থাকে এবং ডায়াস্টোলিক চাপ কম থাকে। অর্থাৎ দাঁড়ান অবস্থার উল্টো ফল পাওয়া যায়।

খাদ্য হজমের সময়ঃ খাদ্য হজমের সময় অর্থাৎ খাদ্য গ্রহণের পর ২-৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত রক্তচাপ ২০ **mm. Hg.** পর্য্যন্ত সিস্টোলিক চাপ বেড়ে যায়। তবে এই চাপ বৃদ্ধি খাদ্যের গুণাগুণের ও পরিমানের উপর নির্ভর করে। গুরুপাক খাদ্য গ্রহণের পর এই বৃদ্ধি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। এই কারণেই যারা হাইপারটেনসন রোগে ভুগছেন তাদের চিকিৎসকরা গুরুপাক খাদ্য ও গুরুভোজন বর্জন করতে বলে থাকেন।

ব্যায়ামের সময়ঃ ব্যায়ামের সময় সিস্টোলিক রক্তচাপ বেশ বেড়ে যায়। ১৮০-২০০ **mm. Hg.** পর্য্যন্ত হ'তে পারে কিন্তু ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের কোন পরিবর্তন হয় না।

রাগ-শোক কান্নার সময়ঃ মানসিক আবেগের সময় যথা রাগ, শোক ও কান্নার সময় সাধারণতঃ সিস্টোলিক রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এইজন্যই চিকিৎসকরা যারা রক্ত চাপাধিক্যের রোগী তাদের মানসিক আবেগের পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতে বলে থাকেন।

বাম ও দক্ষিণ বাহুর রক্তচাপঃ শতকরা ১০ ভাগ লোকের ক্ষেত্রে বাম বাহু থেকে দক্ষিণ বাহুর রক্তচাপ ২০-৩০ **mm. Hg.** বেশি থাকতে পারে। এই কারণেই রক্তচাপাধিক্যে ভুগছেন এমন রোগীদের উভয় বাহুরই রক্তচাপ পরীক্ষা করা দরকার।

শ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ঃ সম্পূর্ণ বিশ্রামরত অবস্থায় ইলেকট্রনিক ম্যানোমিটার দ্বারা অবিচ্ছেদ্য রক্তচাপ মাপের মাধ্যমে দেখা যায়—যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ঠিক থাকে, তাহ'লে নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় রক্তচাপ নিম্নমুখী দেখায়

কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি মাত্রা যদি বেশ কম থাকে সে-ক্ষেত্রে নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় রক্তচাপ বেশি হ'তে দেখা যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সময় রক্তচাপের পরিবর্তন কেন হয় তার কারণ স্বরূপ অনেকে বলে থাকেন যে এই পরিবর্তন হৃৎপিণ্ডের স্ট্রোক ভলিউম ও ধমনীর প্রান্তীয় বাধার (Stroke volume and peripheral resistance) কম-বেশি হওয়ার জন্য হয়ে থাকে।

বড় ছোট ধমনীর ক্ষেত্রে : সাধারণতঃ বড় ধমনীদের ক্ষেত্রে ছোট ধমনীদের থেকে রক্তের চাপ বেশি থাকতে দেখা যায়।

স্ত্রী সঙ্গমের সময় : স্ত্রী সঙ্গমের সময় অত্যধিক উত্তেজনা মুহূর্তে সিস্টোলিক রক্তের চাপ খুবই উর্দ্ধমুখী থাকে এবং অল্প সময়ের জন্য সিস্টোলিক রক্তচাপ দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে।

রক্তচাপ সংরক্ষণ (**Maintenance of Blood Pressure**) **:**

রক্তচাপকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্য কোন্ কোন্ বিষয়গুলি একান্ত প্রয়োজন তা নিম্নে কিছু আলোচনা করছি :

রক্ত বদ্ধ টিউবের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে, টিউবটি পরিপূর্ণই থাকে এবং সেই পূর্ণ টিউবের মধ্যেই হৃৎপিণ্ড আবার নিয়মিত কিছু পরিমাণ রক্ত (৭০ মিলিমিটার) পাঠাতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখব—টিউবটি কেমন। টিউবটি জড় টিউব নয়—একটি জীবন্ত প্রতিক্রিয়াশীল টিউব। রক্ত এই টিউবের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে এবং বারে বারে বেশি রক্ত যা আসে নিজ দেহ গহ্বর স্ফীত হয়ে তাকে ধারণ করে এবং ধমনী দেওয়াল প্রত্যাগতি ক্রিয়ার মাধ্যমে বেশি রক্তকে দূরে সরিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। আগেই বলা হয়েছে টিউবটি-পূর্ণ থাকে এবং তার উপর প্রতি সিস্টোলে হৃৎপিণ্ড প্রায় ৭০ মিলিলিটার রক্ত পাঠিয়ে দেয়। শিরার মাধ্যমে আবার সেই রক্তই ফিরে হৃৎপিণ্ডে আসছে। হৃৎপিণ্ড যখন বিশ্রাম করে অর্থাৎ দুটি বিটের মধ্যে যে সময়টা সেই সময়ে রক্তে ভর্তি টিউবটি স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে কিন্তু ঐ ভিতরের রক্ত সর্বদাই একটা পার্শ্বচাপ সৃষ্টি করে যাকে আমরা ডায়াস্টোলিক চাপ বলি। সিস্টোলের সময় বেশি রক্ত আসার জন্য তা আরও বেশি চাপ সৃষ্টি করে যাকে আমরা সিস্টোলিক রক্তচাপ বলি।

হৃৎপিণ্ড নিয়মিত ধমনীতে রক্ত সরবরাহ করছে এবং এই সরবরাহের পরিমাণের উপর ধমনী শাখা-প্রশাখায় রক্ত কত থাকবে তা নির্ভর করছে।

হৃৎপিণ্ডের সরবরাহ (**Cardiac output**) হৃৎপিণ্ডে কতটা রক্ত শিরার মাধ্যমে ফিরে আসছে তার উপর নির্ভরশীল।

হৃৎপিণ্ড যখন খুব দ্রুত চলতে থাকে তখন তার ডায়াস্টোলের সময় খুব কম হয়ে যায় যার জন্য নিলয় ঠিক মত পূর্ণ হতে পারে না এবং স্ট্রোক ভলিউম (প্রতি সংকোচনে রক্তের পরিমাণ) কমে যায় ফলে রক্তের চাপও কম হয়ে যায়—শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসা রক্তের পরিমাণও কম হয়ে যায়।

টিউবের মধ্য দিয়ে কম পরিমাণ রক্ত গেলে রক্ত কম চাপ সৃষ্টি করবে আবার বেশি রক্ত গেলে বেশি চাপের সৃষ্টি করবে। তাহলে এটা বুঝতে অসুবিধা নাই যে টিউবের মধ্যে রক্তের পরিমাণের (**blood volume**) উপর চাপ বা প্রেসার অনেকটা নির্ভরশীল।

আগেই বলা হয়েছে রক্তবাহগুলি জড় টিউব নয়। এরা জীবন্ত প্রতিক্রিয়াশীল টিউব ; এরা সংকোচিত হতে পারে আবার প্রসারিতও হতে পারে। যখন ছোট ছোট ধমনীগুলি সংকোচিত হয় বা থাকে তখন রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয় (**Peripheral resistance**) ফলে রক্তের চাপ রক্তবাহ দেওয়ালে বেশিভাবে প্রকাশ পায় অর্থাৎ রক্তচাপ বেড়ে যায়।

অতএব রক্তচাপকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে দুইটি প্রধান বিষয়ের সমন্বয় একান্ত দরকার। যথা—(১) হৃৎপিণ্ডের রক্ত প্রেরণের পরিমাণ (কার্ডিয়াক আউটপুট = **Cardiac output**) ও (২) প্রান্তীয় ধমনীর বাধা (**Peripheral resisiance**)। তাই নিম্নে এই দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি :

১। হৃৎপিণ্ডের (সিস্টোলে) রক্ত প্রেরণের পরিমাণ :

হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয় প্রতি সংকোচনের দ্বারা যে পরিমাণ রক্ত সংবহন তন্ত্রে নিক্ষেপ করে সেই পরিমাণ রক্তকে হৃৎপিণ্ডের নিক্ষেপ পরিমাণ (**Cardiac output**) বলা হয়। আগেই বলা হয়েছে এই নিক্ষেপ পরিমাণ অনেকগুলি বিষয়ের সঙ্গে পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের নিক্ষেপ পরিমাণ নির্ভরশীল :

(ক) সংবহণ তন্ত্রে রক্তের পরিমাণ (Blood Volume) : রক্ত সংবহন তন্ত্র একটি বদ্ধ শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট টিউব বা নলতন্ত্র। টিউবগুলি রক্তে পরিপূর্ণ থাকে। ঐ রক্তপূর্ণ বদ্ধ নলাকৃতি রক্তবাহে হৃৎপিণ্ড নিয়মিত বাড়তি রক্ত নিক্ষেপ করতে থাকে। এই পূর্ণ অবস্থার পর সিস্টোলের সময় অতিরিক্ত রক্ত

রক্তবাহগুলিকে স্ফীত ক'রে বাড়তি চাপের সৃষ্টি করে এবং সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ধারণ ক্ষমতা প্রসারণ দ্বারা বৃদ্ধি করে অতিরিক্ত রক্তের স্থান করে নেয় এবং ডায়াস্টোলের সময় আবার প্রত্যাগতি শক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, একথা আগেই বলা হয়েছে। প্রসারণের পর প্রত্যাগতির সময় রক্ত স্তম্ভের উপর যে চাপের সৃষ্টি হয় সেই চাপ ডায়াস্টোলের সময় চাপের যোগান রেখে রক্ত প্রবাহকে গতিময় রাখে এবং অতিরিক্ত পাম্পের কাজ করে থাকে, সেই জন্য স্ফীতির পর ধমনীর প্রত্যাগতিকে সহায়ক পাম্প (Auxillary pump) বলা হয়ে থাকে। হৃৎপিণ্ড প্রেরিত রক্ত স্তম্ভের ধাক্কা এবং ধমনীর প্রত্যাগতির ধাক্কা এই উভয় শক্তি রক্তকে জালকের মধ্য দিয়ে শিরায় এনে ফেলে এবং শিরা সেই রক্তকে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে এনে ফেলে। সেই কারণে, সব ঠিকঠাক থাকলে হৃৎপিণ্ডে শিরা দিয়ে যে পরিমাণ রক্ত এসে পৌছায় এবং যে পরিমাণ রক্ত হৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করে এই উভয় পরিমাণ রক্তই পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। যতটা আসবে ততটা যাবে। অতএব নিক্ষেপিত রক্তের পরিমাণ (Blood Volume) শিরার মধ্য দিয়ে হৃৎপিণ্ডে রক্ত ফিরে আসার উপর নির্ভরশীল।

কলেরা রোগে রক্তের জলীয় অংশ খুবই কমে যায় যার ফলে রক্তের চাপও খুব কমে যায়। আবার পলিসাইথিমিয়া ভেরা (Polycythemia Vera) নামে এক প্রকার রোগে রক্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তের চাপও খুব বেড়ে যায়।

(খ) হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রত্যাগতির অধিযন্ত্রবাদ (Mechanism of Venous return)

হৃৎপিণ্ডে শিরা দিয়ে কত রক্ত ফিরে আসছে তার উপর নিলয় দ্বারা নিক্ষিপ্ত রক্তের পরিমাণ সম্পূর্ণ নির্ভরশীল—একথা আগেই বলা হয়েছে। এখন আমাদের দেখতে হবে রক্ত শিরা দিয়ে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে কেমন করে এবং কোন্ শক্তি বা কি কি কারণ থাকার জন্য হৃৎপিণ্ডে রক্ত ফিরে আসে। নিম্নে এই বিষয়ে কারণগুলি বিশ্লেষণ ক'রে আলোচনা করা হচ্ছে :

(i) **শিরার নিষ্পেষণ :** শিরার দেওয়াল খুবই পাতলা হওয়ার জন্য যে সমস্ত শিরা পেশীর ভিতর দিয়া যাতায়াত করে, পেশী সংকোচনের সময় শিরাগুলি নিষ্পেষিত হওয়ায় তাদের রক্ত হৃৎপিণ্ডের দিকে উঠে যায় এবং একবার খানিকটা পথ উঠে গেলে রক্ত আর উপর থেকে নিচে আসতে পারে না কারণ শিরার ভিতরে অবস্থিত ভালবগুলি রক্তকে আটকে দেয়।

শ্বাস গ্রহণের সময় মধ্যচ্ছদা (**Diaphragm muscle**) পেটের দিকে নেমে আসে তখন পেটের ভিতরের চাপ বেড়ে যায় ফলে, পেটের ভিতরের শিরাগুলি নিষ্পেষিত হয়ে রক্তকে উপরের দিকে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দিকে ঠেলে দেয়।

(ii) **বক্ষাভ্যন্তরের চোষণ কার্য্য** (Intrathoracic Suction action) **:** শ্বাস গ্রহণের সময় বুকের ভিতর নেগেটিভ চাপ বেড়ে যায় যার ফলে মহাশিরাগুলির (**Superior and inferior Vena Cava**) উপর চোষণের প্রভাব পড়ে এবং রক্ত দ্রুত হৃৎপিণ্ডে এসে পড়ে।

(iii) **শিরার মধ্যে ভাল্‌বের অবস্থিতি :** শিরার মধ্যে ভালব থাকার জন্য রক্ত একবার কোন প্রকারে ভালবকে অতিক্রম করে হৃৎপিণ্ডের দিকে এগোলে আর ফিরে আসতে পারে না।

(iv) **অভিকর্ষ শক্তি** (Force of Gravitation) **:** এই অভিকর্ষ শক্তি, বিশেষ করে মাথা, গলার ক্ষেত্রে, বিশেষ কার্য্যকরী শক্তি যার ফলে রক্ত দ্রুত হৃৎপিণ্ডের দিকে নেমে আসে। নিচের দিকের শিরাগুলির ক্ষেত্রে শিরার রক্ত পরিবহনে বাধার সৃষ্টি করে কিন্তু শিরার মধ্যে ভালব থাকার দরুণ এবং পেশীর নিষ্পেষণ শিরার মধ্যে রক্ত প্রবাহকে অব্যাহত রাখে।

(v) **চাপ মাত্রার হেরফের** (Difference of pressure gradient) **:** রক্তবাহ জালকের ভিতরের চাপ শিরা জালকের ভিতরের চাপ থেকে বেশি থাকে যার ফলে উচ্চ থেকে নিম্ন চাপের দিকে রক্তের গতি অব্যাহত থাকে অর্থাৎ ধামনিক জালক থেকে শিরার দিকে রক্তের গতি স্বাভাবিক নিয়মেই চলতে থাকে।

(vi) **রক্তের পরিমাণ :** শিরার মধ্য দিয়ে রক্তকে সচল রাখতে রক্তের পরিমাণ যথেষ্ট থাকার দরকার। রক্তের পরিমাণ বাড়লে হৃৎপিণ্ডে বেশি রক্ত ফিরে আসে এবং কম হ'লে কম রক্ত ফিরে আসে।

(vii) **অন্যান্য প্রভাব :** (a) **ভ্যাসোমটর স্নায়ু**—ধমনীদের মত শিরাগুলিও ভ্যাসোমটর স্নায়ুর প্রভাবে সংকোচিত-প্রসারিত হতে পারে যার ফলে শিরার মধ্য দিয়ে রক্তের গতির তারতম্য হ'তে পারে।

(b) **শিরা-ধমনিকার সংযোগ :** অনেকের মতে এই সংযোগ শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলে সাহায্য ক'রে থাকে।

(c) **প্রত্যঙ্গের প্রধান ধমনীর দু-পাশে শিরার লম্বালম্বি অবস্থিতি :** এইভাবে শিরা (**Venae Comites**) প্রায় ধমনীর গায়ে গায়ে

লেগে থাকে এবং দু-পাশের দুটি শিরা আবার আড়াআড়ি ধমনীর উপর দিয়ে ছোট ছোট শিরার দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে। ধমনীর স্ফীতির সময় এই শিরার উপর যে চাপের সৃষ্টি হয় সেই চাপ শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত সংবহনে সাহায্য করে।

(d) ঘুমের সময় পেশী সমূহ শিথিল থাকে যার জন্য শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল পেশীর সাহায্য পায় না। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর সাধারণভাবে যে হাই ওঠে তা শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচলে সাহায্য করে থাকে। হাই তোলার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যে প্রসারণ হয় তার জন্য পেশীতে যে টান পড়ে সেই টানের সাহায্যে পেশীর মধ্যে অবস্থিত শিরার রক্তে গতিবেগ আসে। হাই তোলার সময় যে গভীর শ্বাস গ্রহণ করা হয় তাতে প্লুরা গহ্বরের নেগেটিভ চাপ বৃদ্ধি পায় ও চোষণ শক্তিও বেড়ে যায় যার ফলে রক্ত দ্রুত হৃৎপিণ্ডে এসে পৌছায় এবং শিরার রক্ত প্রবাহ বাড়িয়ে দেয়।

(গ) হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং ক্রিয়া (Pumping action of Heart) :

হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং দুইটি প্রধান বিষয়ের উপর নির্ভর করে—(i) হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শক্তি, (ii) হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের সংখ্যা বা কত দ্রুত হৃৎপিণ্ড সংকোচিত —প্রসারিত হয় :

(i) **হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শক্তি :** হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শক্তি নিম্ন-লিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল :

(a) হৃৎপিণ্ডের পুষ্টি।

(b) অক্সিজেন সরবরাহ।

(c) নীরোগ করনারী ধমনী।

(d) সংকোচনের পূর্বমুহূর্তে হৃৎপিণ্ড পেশী কোষের দৈর্ঘ।

এইগুলি সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

(ii) **হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের সংখ্যা :**

হৃৎপিণ্ড স্পন্দনের সংখ্যার উপর হৃৎপিণ্ডের পাম্পিং ক্রিয়া নিবিড়ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। প্রতি স্পন্দনে নিক্ষিপ্ত রক্তের পরিমান এবং প্রতি মিনিটে নিক্ষিপ্ত রক্তের পরিমাণ পরস্পর নির্ভরশীল এবং হৃৎপিণ্ডের ডায়াস্টোলের সঙ্গে উভয় রক্তের পরিমাণ সম্বন্ধযুক্ত। স্পন্দন বাড়লে, ডায়াস্টোলের সময় কম হবে, হৃৎপিণ্ড সম্পূর্ণ ভরবে না, তার সংকোচন শক্তি কম হবে এবং নিক্ষিপ্ত রক্ত কম হবে। আবার

স্পন্দন কম হ'লে ডায়াস্টোলের সময় বাড়বে—নিলয়গুলি রক্তে পরিপূর্ণ হবে, সংকোচন শক্তি বাড়বে এবং হৃৎপিণ্ড দ্বারা নিক্ষিপ্ত রক্ত (**Cardiac output**) বাড়বে।

(২) **প্রান্তীয় বাধা** (Peripheral resistance) ঃ

প্রান্তীয় ধমনিকাগুলি (**Arterioles**) পেশী-বহুল রক্তবাহ এবং এই পেশী সংকোচিত হ'লে ধমনিকা গহ্বরের ব্যাস বেশ কম হ'য়ে যায়, রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হয় এবং ধমনিকা থেকে জালকের মধ্য দিয়ে রক্ত শিরায় পৌছাতে সময় বেশি লাগে। আবার ঐ পেশী শিথিল থাকলে ভিতরের ব্যাস অপেক্ষাকৃত বড় থাকে এবং রক্ত চলাচলে কম বাধার সৃষ্টি হয়। অতএব এটা বলা যেতে পারে যে রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টির স্থান ধমনিকাগুলি। রক্তবাহ জালকও রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের শরীরের পেশীর ধমনিকাগুলি ও পেটের মধ্যের আঙ্গিক (**Splanchnic**) ধমনিকাগুলি সব থেকে বেশি প্রান্তীয় বাধার সৃষ্টি করে। পেটের এই রক্ত বাহগুলি (ধমনিকা) প্রসারিত হলে বাধা কমে যায় এবং রক্তের চাপও কমে যায়। কখনও কখনও এত বেশি কমে যায় যে মাথা ঘুরে যায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞানও সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেলে।

অঙ্কের সাহায্যে প্রান্তীয় ধমনিকার বাধা কতটুকু তা নির্ণয় করা যায়। এই বাধা মধ্যবর্তী (**mean**) রক্তচাপ ও হৃৎপিণ্ডের আউটপুটের আনুপাতিক হার। অন্য কথায় একে রক্তচাপ ও রক্ত প্রবাহের অনুপাত বলা যেতে পারে।

$$\text{প্রান্তীয় ধমনীর বাধা} = \frac{\text{মধ্যবর্তী (mean) রক্তচাপ}}{\text{কার্ডিয়াক আউটপুট}}$$

প্রান্তীয় ধমনীর বাধা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভরশীল ঃ

(i) ধমনী দেওয়ালের নমনীয়তা (**Elasticity of arterial wall**)।

(ii) রক্তের সান্দ্রতা (**Viscosity of blood**)।

(iii) রক্ত চলাচলের বেগ মাত্রা (**Velocity of blood flow**)

(iv) রক্তবাহ নালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা (**State of lumen of blood vessels**)।

(i) ধমনী দেওয়ালের স্থিতি স্থাপকতা বা নমনীয়তা (Elasticity of arterial wall) :

হৃৎপিণ্ডের নিলয়গুলি যখন সংকোচিত হয় তখন যে শক্তি রক্তকে ধাবিত করে তাকে কাইনেটিক শক্তি বলা হয়। এই শক্তির কিছু অংশ ধমনী দেওয়ালকে স্ফীত করতে ব্যয়িত হয় এবং কিছু পোটেনসিয়াল শক্তিরূপে ধমনী দেওয়ালে সঞ্চিত থাকে। ডায়াস্টোলের সময় ধমনীর স্ফীত দেওয়াল আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে ঐ সঞ্চিত পোটেনসিয়াল শক্তির সাহায্যে ও ঐ শক্তি ডায়াস্টোলের সময় রক্ত স্তম্ভের উপর চাপ সৃষ্টি ক'রে রক্ত চলাচলকে অব্যাহত রাখে।

রক্তবাহ দেওয়ালের নমনীয়তা, দেওয়ালের গঠনে স্থিতিস্থাপক কলা তন্তুর সুবিন্যস্ত সংযোজনের জন্য হয়ে থাকে। বয়স্ক লোকদের ক্ষেত্রে ধমনী দেওয়ালের ঐ স্থিতিস্থাপক কলা তন্তুগুলি টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং দেওয়ালে ক্যালসিয়াম, কোলেসটেরল ও ফ্যাটি এসিড সঞ্চিত হয়ে থাকে। এর ফলে ধমনী দেওয়াল শক্ত হয়ে যায় এবং এদের নমনীয়তা কমে যায়। এর ফলে সিস্টোলের সময় ধমনী দেওয়াল প্রয়োজন মত স্ফীত হতে পারে না ও চলমান রক্ত, ধমনী দেওয়ালে অধিক চাপের সৃষ্টি করে ও রক্তচাপ বেড়ে যায়। আবার ডায়াস্টোলের সময় ধমনী দেওয়ালের নমনীয়তা কমে যাওয়ার দরুণ যতখানি রক্ত স্তম্ভের উপর চাপ দেওয়ার দরকার ততখানি চাপ দিতে পারে না যার ফলে ডায়াস্টোলিক চাপ অননুপাতিকভাবে কমে যায়।

এই থেকে বোঝা যায় ধমনী দেওয়ালের নমনীয়তা রক্তচাপ ওঠা নামার উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। নমনীয়তা স্বাভাবিক থাকলে রক্তচাপ স্বাভাবিক থাকে এবং নমনীয়তা কমে গেলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়।

(ii) রক্তের সান্দ্রতা (Viscosity of blood) :

রক্তের সান্দ্রতা রক্ত প্রবাহের উপর ঘনিষ্ট ভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সান্দ্রতা বাড়লে বহতা কমবে আবার সান্দ্রতা কমলে বহতা বাড়বে। রক্তের চাপও সেইরূপ সান্দ্রতার উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সান্দ্রতা বাড়লে রক্ত চলাচলে বাধার সৃষ্টি হবে এবং রক্তচাপও বাড়বে এবং বহতা কমবে। সান্দ্রতা কমলে বিপরীত ফল পাওয়া যাবে।

(iii) রক্ত চলাচলের বেগমাত্রা (Velocity of blood flow) :

এটা স্বতঃসিদ্ধ যে কোন তরল পদার্থ কোন নলের মধ্য দিয়া যাতায়াতের সময় বেগমাত্রা বা দ্রুততার বেগ অনুযায়ী যাতায়াতে বাধা (Resistance)

কম-বেশি হয়ে থাকে। দ্রুততা বাড়লে বাধা বাড়ে আবার দ্রুততা কমলে বাধা কমে। সে-কারণে মহাধমনী দিয়ে যখন রক্ত চলাচল করে বেগমাত্রা তখন বেশি থাকে এবং রক্তের চাপও বেশি থাকে। ধমনী, ধমনিকা ধামনিক জালক প্রভৃতি রক্তবাহের মধ্য দিয়ে রক্ত যত হৃৎপিণ্ড থেকে দূরে সরে যায় ও ছড়িয়ে পড়ে বেগ মাত্রা তত কমে যায়। মহাধমনীর প্রস্থচ্ছেদ মাপের সঙ্গে ধামনিক জালকের প্রস্থ-চ্ছেদ মাপের তুলনা করলে দেখা যাবে মহাধমনীর প্রস্থচ্ছেদ মাপের থেকে ধামনিক জালকের প্রস্থচ্ছেদ মাপ প্রায় ১০০ গুণ বেশি। অর্থাৎ একই পরিমাণ রক্ত অনেক বেশি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে এবং স্বাভাবিক ভাবেই রক্তচাপ কমে যাবে।

রক্ত চলাচলের গতি বিজ্ঞান (Haemodynamics) **:** গতি বিজ্ঞান পর্য্যালোচনা করলে দুটি প্রধান বিষয় লক্ষ্য করা যাবে যথা (১) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত পরিমাণ রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে এবং (২) রক্ত প্রবাহের দ্রুততা যথা প্রতি সেকেণ্ডে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে কতটা রক্ত পৌছাতে পারে। এই দুই বিষয়কে একত্রে গতিবিজ্ঞান বলে বিবেচিত হয় যার সাহায্যে রক্তের গতিবেগ বোঝা সহজতর হয়।

বহতা, চাপ ও বাধা (Flow pressure and resistance) : এটা আমাদের জানা আছে যে তরল পদার্থ উচ্চ থেকে নিম্ন চাপের দিকে ধাবমান থাকে অর্থাৎ তরল পদার্থের বহতা চাপের নতিমাত্রায় (**Pressure gradient**) উপর নির্ভরশীল। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে প্রবাহের কৌণিক ভরবেগ (**Momentum**) বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

কোন স্থানে বা অঙ্গে কি পরিমাণ রক্ত প্রবাহ হচ্ছে তা জানতে হ'লে কার্য্যকরী প্রবাহ চাপকে বাধার পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে পাওয়া যায়। কার্য্যকরী প্রবাহ চাপ (**Effective perfussion pressure**) হচ্ছে রক্তবাহ জালকের ধমনিকা প্রান্তের যে গড় চাপ তা থেকে শিরা প্রান্তের চাপকে বাদ দিলে যে অবশিষ্ট থাকে তাকেই কার্য্যকরী প্রবাহ চাপ বলা হয়। বাধা (**resistance**) কতটা বুঝতে হলে পি. আর. ইউ ইউনিটস্ (**PRU units**) (**mm. Hg.**) অবলম্বন করা বোঝার পক্ষে সহজতর হবে। চাপ, মিলিটারে যত হবে তাকে প্রতি সেকেণ্ডে তত মিলিলিটার রক্ত বাহিত হচ্ছে তাই দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে।

$$\text{বাধা (Resistanre) (R. Units)} = \frac{\text{৯০ mm. Hg.}}{\text{৯০ ml/s}}$$

অর্থাৎ যেখানে মহাধমনীয় গড় চাপ ৯০ **mm. Hg.** তাকে বাম নিলয়ের প্রতি সেকেণ্ডে যত আউটপুট হয় তাই দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে।

বিশ্রাম অবস্থায় কতকগুলি অঙ্গের রক্ত প্রবাহ কি রকম তা দেওয়া হচ্ছে :

অঙ্গের নাম	প্রতি সেকেণ্ডে রক্ত প্রবাহ মিলিলিটারে
ক্যারটিড বডি (Carotid body)	২০০০
থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland)	৫৬০
বৃক্ক (Kidney)	১৫০
যকৃৎ (Liver)	১৫০
হৃৎপিণ্ড (Heart)	১০০
অন্ত্র (Intestine)	৭০
মগজ (Brain)	৬৫
প্লীহা (Spleen)	৪০
পাকস্থলী (Stomach)	২৫

(iv) রক্তবাহ নালীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা (State of lumen of blood vessels) :

রক্তবাহ নালীর ভিতরের ফাঁক যত কম হবে প্রান্তীয় বাধা তত বাড়বে এবং রক্তের চাপও বাড়বে। এই বাধা ধমনিকার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য কারণ এই রক্তবাহ দেওয়ালের স্বয়ংক্রিয় পেশী সংকোচিত-প্রসারিত হতে পারে। সংকোচিত হ'লে ভিতরের ফাঁক কমে যায়, বাধা বাড়ে এবং রক্তের চাপও বাড়ে। আবার প্রসারিত হ'লে ফাঁক বাড়ে এবং রক্তের চাপ কমে। ধমনিকার পেশীগুলি ও তাদের ক্রিয়াকলাপ (সংকোচন-প্রসারণ) ভ্যাসোমটর সেণ্টারের মাধ্যমে ভ্যাসোমটর স্নায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই নার্ভগুলি কোন কারণে উত্তেজিত হ'লে রক্তবাহ-পেশী সংকোচিত হয় এবং দমিত হলে সংকোচন শক্তি কমে যায়।

রক্তচাপ মাপার পদ্ধতি

রক্তচাপ মাপার জন্য দুই রকমের পদ্ধতি, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, অবলম্বন করা হয়ে থাকে।

প্রত্যক্ষ রক্তচাপ মাপার পদ্ধতি :

ব্যবহারিক দিক থেকে প্রত্যক্ষ রক্তচাপ মাপার অনেক অসুবিধা আছে কারণ এ ক্ষেত্রে ইনজেকসন করার মত কোন সূচ বা ক্যাথিটার একদিকে ধমনী বা শিরার মধ্যে বা ধমনী বা শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করাতে হয় এবং অন্য প্রান্তটি তরল পদার্থে ভর্ত্তি একটি খাড়া নলের সহিত যুক্ত করা হয় এবং ঐ নলটির গায়ে মিলিমিটার স্কেল অঙ্কিত থাকে। এক দিকে ক্ষুদ্রাকারের ট্রানসডুসার (Trnsducer) ধমনীর মধ্যে ঢুকিয়ে অন্য দিকে টেলিমেট্রির সঙ্গে যুক্ত করেও প্রত্যক্ষভাবে রক্তের চাপ মাপা যেতে পারে। আরও বিভিন্ন ভাবে সরাসরি রক্তের চাপ মাপা যেতে পারে কিন্তু এই সব পদ্ধতি হাসপাতালে বা বড় ল্যাবরেটরীতে ছাড়া ব্যাপকভাবে অবলম্বন করা যায় না। তাই পরোক্ষ পদ্ধতিই রক্তচাপ মাপার প্রকৃষ্ট পথ বলে গ্রহণ করা হয়েছে।

পরোক্ষ রক্তচাপ মাপার পদ্ধতি

পরোক্ষ রক্তচাপ মাপার মূল তত্ত্ব হ'ল বায়ুর চাপ বৃদ্ধি ক'রে সেই চাপকে ধমনীর চাপের সঙ্গে সমতা আনা। ব্যবহারিক সুবিধার জন্য সাধারণতঃ বাহুর প্রধান ধমনীকে অর্থাৎ ব্রেক্রিয়েল ধমনীকে (**Brachial artery**) এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। পরোক্ষ রক্তচাপ মাপার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে স্ফিগমোম্যানোমিটার (**Sphygmomanometer**) বলা হয়। বর্তমানে যে স্ফিগমোম্যানোমিটার আমরা ব্যবহার করি তার তরল পদার্থটি, যা স্কেলে ওঠা-নামা করে, সেটি পারদ অর্থাৎ আমরা পারদীয় স্ফিগমোম্যানোমিটার (**Mercury Sphygmomanometer**) ব্যবহার করি। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে রিভারকি স্ফিগমোম্যানোমিটারে পারদ প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এবং এর উপযোগিতা আজও স্বীকৃত রয়েছে।

স্ফিগমোম্যানোমিটার যন্ত্র : এই যন্ত্রের একটি বাহুবন্ধনী থাকে যার প্রধান অংশ হ'ল একটি রবারেরব্যাগ যেটি একটি শক্ত সংকেচন-প্রসারণ বিযুক্ত কাপড়ের ঢাকনার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। ঐ রবারের ব্যাগ থেকে দুটি নল বেরিয়ে

আসে। একটি নল একটি পারদীয় ম্যানোমিটারের সঙ্গে যুক্ত থাকে অপরটি টিউব সংযোগে একটি রবারের পাম্পের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ঐ পাম্পের সঙ্গে নলের সংযোগস্থলে একটি নিয়ন্ত্রণশীল স্ক্রু থাকে যার সাহায্যে হাওয়া রবারের ব্যাগের মধ্যে দেওয়া হয় এবং দরকার মত স্ক্রুটি ঢিলে-বন্ধ করে হাওয়ার চাপকে ধমনীর চাপের সঙ্গে সমতা আনা হয়। পারদীয় ম্যানোমিটারের সঙ্গে মিলিমিটার স্কেল সংযোজিত থাকে এবং এটি লোহার বা শক্ত ধাতুর একটি বাক্সের মত কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং বাক্সটি খুললেই মিলিমিটার স্কেলটি সহ পারদ চলাচলের নলটি খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

বাহুবন্ধনীর মাপ : বাহুবন্ধনী খুব বড় বা ছোট হ'লে নিখুঁতভাবে রক্তচাপ মাপা যায় না। নিখুঁত রক্তচাপ মাপার জন্য বাহুবন্ধনীর মাপ বাহুর ব্যাসের থেকে শতকরা কুড়ি ভাগ বেশি হ'তে হবে। সাধারণ ভাবে বাহুবন্ধনীর মাপ নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় :

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য রাবার ব্যাগের—	১২	সেন্টি	মিটার
ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে—	৮	"	"
(৮ বৎসর বয়সের নিচে)			
চার বৎসর বয়সের নিচে	৫	"	"
এক বৎসর বয়সের নিচে—	২½	"	"
জঙ্ঘার জঙ্ঘাবন্ধনীর মাপ—	১৮	"	"

বাহুবন্ধনী বাঁধার নিয়ম :

বাহুবন্ধনীর রাবার ব্যাগটি বাহুর ভিতরের দিকটি সম্পূর্ণ চাপা দিয়ে বাহিরের দিকে এনে তার পর সমান ভাবে জড়িয়ে যেতে হবে। বাহুর চামড়া ও রাবার ব্যাগের মাঝে কোন আবরণ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বন্ধনীটি কনুইয়ের সামনের খাঁজের এক ইঞ্চি উপরে থাকবে।

রক্তচাপ মাপার পদ্ধতি : সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি রক্তচাপ মাপার জন্য অবলম্বন করা হয়ে থাকে যথা (১) প্যাল্‌পেটরি পদ্ধতি (**Palpatory method**) (২) অস্‌কালটেটরি পদ্ধতি (**Auscultatory method**) ও (৩) অসিলেটরি পদ্ধতি (**oscillatory method**)। অসিলেটরি পদ্ধতি নানান কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি তাই প্যাল্‌পেটরি ও অস্‌কালটেটরি পদ্ধতি সর্বাধিক প্রচলিত। নিম্নে দুটি পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে :

(১) **প্যাল্‌পেটরি পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে বাহু বন্ধনী লাগাবার পর পাম্পের সাহায্যে রাবার ব্যাগে বায়ু প্রবেশ করিয়ে ২০০ mmHg পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়ে কব্জির উপরে পাল্‌স্‌কে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিতে হবে, তারপর পাম্পের স্ক্রু ঢিলে করে বায়ু আস্তে আস্তে বার করে দিতে হবে এবং রেডিয়েল ধমনীর উপর আঙ্গুল রেখে পাল্‌স অনুভব করতে হবে। ২০০ mmHg বায়ুর চাপ ওঠালে প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাল্‌স অনুভব করা যায় না। তারপর বায়ু আস্তে আস্তে ছাড়ার সময় যখনই প্রথম পাল্‌স অনুভব করা যায় এবং যত mm.Hg তে অনুভূত হয় ততই সিস্টোলিক রক্তচাপ। এই পদ্ধতি দ্বারা ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ মাপা যায় না।

(২) **অস্‌কালটেটরি পদ্ধতি ঃ** প্যাল্‌পেটরি ও এই পদ্ধতি যুক্তভাবে ব্যবহার রক্তচাপ মাপার পক্ষে খুবই উপযোগী, এবং একটি উত্তম প্রক্রিয়া যার দ্বারা বহুলাংশে সঠিক রক্তচাপ নির্ণয় করা সম্ভব এবং এখনও পর্য্যন্ত এই পদ্ধতিই বহুল প্রচারিত, সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ব্যবহারিক দিক থেকে সুষ্ঠু পদ্ধতি। প্যালপেটরি প্রক্রিয়ার মত একইভাবে ব্রেক্রিয়েল ধমনীর স্পন্দন বায়ুর চাপ দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং আস্তে আস্তে (২ mm প্রতি সেকেণ্ডে) বায়ুর চাপ কমিয়ে দেওয়া ও সাথে সাথে কনুইয়ের সামনের খাঁজের উপর স্টেথসস্কোপ দ্বারা স্পন্দনের শব্দ শোনা হয়। প্রথম যে শব্দ শোনা যায় সেইটিই সিস্টোলিক রক্তচাপ এবং মিলিমিটার স্কেলের সাহায্যে কত mmHgতে প্রথম শোনা গেল তা দেখে নিতে হবে। তার পরও স্পন্দন শব্দকে অনুসরণ করে শুনে যেতে হবে এবং যত মিলিমিটার Hgতে আবার স্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল তা দেখতে হবে এবং সেইটেই ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রুস বিজ্ঞানী করটকো সিস্টোলের প্রথম শব্দ শোনার পর কি ভাবে শব্দের পরিবর্তন হ'তে হ'তে সম্পূর্ণ লয় হয়ে যায় তার একটি নিখুঁত বর্ণনা করেছিলেন। ঐ পরিবর্তনশীল শব্দগুলি যা করটকো বর্ণনা করেছিলেন তা আজও করটকো-এর শব্দ (**Korotkow's sound**) নামে পরিচিত। নিম্নে করটকো-এর ধারাবাহিক শব্দ পরিবর্তনের পরিচিতি দেওয়া হচ্ছে ঃ

করোটকো শব্দ (**Korotkow's sound**) **ঃ** স্টেথসস্কোপ ব্রেকিয়েল ধমনীর উপর কনুই-এর সামনে দিকের খাঁজে রেখে বাহুবন্ধনীর মধ্যে পাম্প দ্বারা হাওয়া ২০০ mm.Hg. পর্য্যন্ত উঠিয়ে তারপর পাম্পের স্ক্রু ঢিলে করে আস্তে আস্তে (২ মিলিমিটার Hg প্রতি সেকেণ্ডে) ছাড়লে এক সময় পরিষ্কার 'টপ' ক'রে

(tapping sound) একটা শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ঐ প্রথম শব্দই যে mm.Hgতে শুনতে পাওয়া যায় সেইটিই সিস্টোলিক রক্তচাপ। এই প্রথম শব্দকে ধরে পর পর যে শব্দ শুনতে পাওয়া যায় সেই শব্দকে করোটকো চারটি স্তরে ভাগ করেছিলেন যথা স্তর-১, স্তর-২, স্তর-৩ ও স্তর-৪। নিম্নে ঐ-স্তরগুলির পরিচয় দেওয়া হচ্ছে ঃ

স্তর-১ ঃ প্রথম যখন শব্দ শুনতে পাওয়া গেল তারপর ১০-১৪ mm.Hg. ম্যানোমিটারে পারদ নামার সময় পর্য্যন্ত এই স্তরকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। প্রথম 'টপ' শব্দটি ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট এবং তার পর ১০-১৪ mmHg ম্যানোমিটারে পারদ নামার সময়ে শব্দ ক্রমশঃ বেশ জোর জোর শুনতে পাওয়া যায়।

স্তর-২ ঃ এই স্তরে শব্দটা ফ্যাসফেসে হ'য়ে হয়ে যায় এবং ১৫-২০ mmHg পারদ নামার সময় পর্য্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ঐ ফ্যাসফেসে শব্দটা যতক্ষণ শোনা যায় সেইটেই স্তর-২।

স্তর ৩ ঃ এই স্তরে শব্দ বেশ পরিষ্কার এবং জোরে জোরে হতে থাকে এবং ৫-৭ মিলিমিটার পারদ নামার সময় পর্য্যন্ত চলতে থাকে।

স্তর-৪ ঃ শব্দ আবার অস্পষ্ট হতে থাকে এবং এই অস্পষ্টতা ৫-৭ মিলি-মিটার পারদ নামার সময় পর্য্যন্ত শুনতে পাওয়া যায়। তার পর আর শব্দ শোনা যায় না। ঐ অতি ক্ষীণ স্বরকেই ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ধরার সময় বলে ধরা হয়।

স্তর-৫ ঃ কেউ কেউ যখন শব্দ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় সেই সময়ে ম্যানোমিটারের পারদ যে মিলিমিটারে থাকে তাকে পঞ্চম স্তর বলে চিহ্নিত করেন এবং ঐ শব্দ বন্ধ হওয়ার সময় যে স্তরে পারদ লেভেল থাকে তাকেই ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলে চিহ্নিত করেন। এই সূত্রের প্রবক্তারা বলেন, ব্যায়ামের সময় চতুর্থ ও পঞ্চম স্তরের মধ্যে তফাৎ ৪০ মিলিমিটার পর্য্যন্ত হতে পারে এবং সেই পঞ্চম স্তরকেই ডায়াস্টোলিক চাপের সময় চিহ্নিত করেছেন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে চতুর্থ স্তরকেই ডায়াস্টোলিক চাপ চিহ্নিত করা হয়।

আগেই বলা হয়েছে প্রথম শব্দ যখন শোনা যায় তখন ম্যানোমিটারে মিলি-মিটারে যে সংখ্যা পড়া যায় সেইটিই সিস্টোলিক রক্তচাপ। এ-বিষয়ে কোন মত-দ্বৈদ্ধতা নাই। ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ঠিক কোন্ সময়ে ধরতে হবে সে নিয়ে মতদ্বৈদ্ধতা আছে। কেউ কেউ বলেন করোটকোর চতুর্থ স্তরই ডায়াস্টোলের সময়। আবার কেউ কেউ পঞ্চম স্তরকেই ডায়াস্টোলের সময় বলে ধরে থাকেন

যা আগেই বলা হয়েছে। ধমনীর মধ্যে ট্রান্সডুসার-এর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে **পঞ্চম স্তরই প্রকৃত ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের সময়** এবং অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পঞ্চম স্তর ঠিক ঠিক ধরা যায় না কারণ শব্দ বরাবর শুনতে পাওয়া যায়। কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলেন যে পুরবাহু (Forearm) অতিরিক্ত প্রসারিত হওয়ার জন্য ঐরূপ হয়ে থাকে।

অস্‌কালটেটরি গ্যাপ : অনেক ক্ষেত্রেই এটা দেখা গেছে যে রক্তচাপ মাপার সময় প্রথম একটা ক্ষীন 'টপ'-শব্দ শোনার পর আর কোন শব্দ শোনা যায় না। এই অবস্থাকে **অস্‌কালটেটরি গ্যাপ** বলা হয়ে থাকে। যারা হাই-পারটেনসনে ভোগেন তাদের ক্ষেত্রেই এই অস্‌কালটেটরি গ্যাপ কখনও কখনও পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই গ্যাপ ৪০ মিলিমিটার পারদ নামার সময় পর্য্যন্ত থাকে তারপর আবার শব্দ শোনা যায়। এই সব ক্ষেত্রে সিস্টোলিক রক্ত চাপ মাপায় মারাত্মক ভুল হয়ে যেতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে প্যাল্‌পেটরি পদ্ধতি অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত। রক্তবাহের প্রসারতা ও বাহুবন্ধনী দেরিতে প্রসারিত হওয়াই কারণ হিসাবে কেউ কেউ বলে থাকেন। তবে সঠিক কি কারণ তা আজ্ও জানা নাই।

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে রক্তচাপ মাপা খুবই অসুবিধাজনক : শক, অরিকুলার ফিব্রিলেশন ও প্যারক্সিসম্যাল ট্যাকিকার্ডিয়ার ক্ষেত্রে রক্তচাপ মাপা খুবই অসুবিধাজনক।

নিম্ন অঙ্গের বা পায়ের রক্তচাপ : পায়ের রক্তচাপ মাপার পদ্ধতি হ'ল—রোগীকে পা ছড়িয়ে উপর হয়ে শুতে হবে, তারপর পায়ের রক্তচাপ মাপার বন্ধনী দিয়ে দাবনার মাঝ বরাবর ঠিক ভাবে বাঁধতে হবে। পপলিটিয়াল ফোসার মাঝখানে স্টেথস্কোপের নবটি জোরে চাপ দিয়ে পপলিটিয়াল ধমনীর শব্দ শুনে চাপ নির্ণয় করতে হবে। মাপার নিয়ম একই রকম হবে।

হাতে ও পায়ের রক্তচাপের গুরুত্ব : অ্যায়টিক ইনকমপিটেনস-এর ক্ষেত্রে পায়ের রক্তচাপ বেশি হয়ে থাকে। সিস্টোলিক রক্তচাপ ১৬০ mm. Hg-ও হতে পারে এবং হাতের রক্তচাপ তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়ে থাকে। হাতে-পায়ের রক্তচাপে গুরুত্বপূর্ণ তফাৎ এই রোগ নির্ণয়ে একটি প্রধান হাতিয়ার।

কোআর্কটেসন অফ অ্যায়োটার ক্ষেত্রে হাতের রক্তচাপ স্বাভাবিক বা একটু বেশি হ'তে পারে কিন্তু পায়ের রক্তচাপ খুবই কম হয়ে থাকে।

সিস্টোলিক রক্তচাপের তাৎপর্য্য :

নানান কারণে যথা মানসিক আবেগ জনিত চিন্তা, ভয়, শোক ও শারীরিক পরিশ্রম প্রভৃতি বিষয়গুলি সিস্টোলিক রক্তচাপের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ক'রে থাকে যার ফলে সিস্টোলিক রক্তচাপ উর্দ্ধমুখী হয়ে যায়। স্বাভাবিক, নীরোগ একজন প্রাপ্ত বয়স্কের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক রক্তচাপ ১২০ **mm. Hg.** থেকে ১৪৫ **mm. Hg.** হয়ে থাকে। পরিশ্রমের পর রক্তচাপ ২৫—৩০ **mm.Hg.** বেশি হতে পারে।

সিস্টোলিক রক্তচাপ থেকে আমরা হৃৎপিণ্ড পেশীর সংকোচন শক্তি কিরূপ আছে তা অনুমান করতে পারি। রক্তের পরিমাণের উপর নির্ভর করে সিস্টোলিক রক্তচাপের স্তর নির্ভর করে। রক্তের পরিমাণ বেশি হ'লে সিস্টোলিক রক্তচাপ বেশি হয়।

ডায়াস্টোলিক রক্তচাপের তাৎপর্য্য :

ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলতে সেই রক্তচাপকে বুঝি যা ধমনীর মধ্যে সর্বদা রক্ত থাকার জন্য যে চাপের সৃষ্টি করে সেই রক্তচাপকে এবং এই রক্তচাপ ধমনিকা দেওয়ালের অবস্থা কিরূপ আছে বা কতটা টান-টান হয়ে (**Tonicity**) রক্তকে ধরে রেখেছে তা বোঝা যায়। ধামনিক জালকের ধারক শক্তির উপরও এই ডায়া-স্টোলিক রক্তচাপ নির্ভর করে। এক কথায় ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ প্রান্তীয় বাধার স্বরূপ নির্ণয়ের চাবিকাঠি।

ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ থেকে আমরা বুঝতে পারি হৃৎপিণ্ডকে রক্ত পাম্প করতে কতটা শক্তি ক্ষয় করতে হচ্ছে। ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বেশি হ'লে বুঝতে হবে হৃৎপিণ্ড বেশি কাজ করছে। এইরূপ বেশি কাজ করতে করতে হৃৎপিণ্ড পেশী পরিবর্দ্ধিত (**Hypertrophy**) হয়ে যাবে এবং হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। তাই ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

পাল্‌সের চাপ ও তাৎপর্য্য :

সিস্টোলিক রক্তচাপ থেকে ডায়াস্টোলিক চাপ বাদ দিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেইটিই **mm. Hg.**-তে পাল্‌স চাপ বলা হয়। সিস্টোলিক চাপ ১২০ **mm. Hg.** হ'লে এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ হ'লে পাল্‌সের চাপ ৪০ **mm. Hg.** হবে।

পাল্‌সের চাপ কার্ডিয়াক আউটপুট কি রকম আছে তার সম্বন্ধে একটা অনুমান করা যায়। পাল্‌সের চাপ বেশি হ'লে কার্ডিয়াক আউটপুট বেশি আছে অনুমান করা যায়।

মধ্যবর্তী বা গড় রক্তচাপের (Mean arterial pressure) তাৎপর্য্য :

ধমনীর গড় রক্তচাপ হচ্ছে—ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ + $\frac{1}{3}$ পাল্‌সের চাপ। এই গড় রক্তচাপের তাৎপর্য্য হ'ল—এই চাপ থেকে শরীরের সর্বত্র কি চাপে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তা জানা যায়। হাইপারটেনসন রোগের ক্ষেত্রে এই চাপ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর থেকে ঐ রোগের গুরুত্ব বিচার করা সম্ভব হয়ে থাকে।

রক্ত চলাচলের সময় (Circulation Time)

রক্ত চলাচলের সময় হচ্ছে ততটা সময়, যে সময়ের মধ্যে রক্ত যে-কোন একটি নির্দিষ্ট স্থান থেকে আর একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায়। শরীরের কোন একটা স্থান থেকে কাছাকাছি অপর একটি স্থানে রক্ত চলাচলে যে সময় লাগে তাকে **আংশিক রক্ত চলাচলের সময়** (Partial circulation time) বলে যেমন বাহু থেকে জিবে। শরীরের কোন একটা শিরা থেকে রক্ত আবার সেই শিরায় ফিরে আসতে যে সময় লাগে তাকে সমগ্র রক্ত চলাচলের সময় (Total circulation time) বলা হয়।

আংশিক রক্ত চলাচলের সময় (Partial circulation time) :

বাহু থেকে মুখে : পাঁচ মিলিলিটার ২% ডেকোলিন (Decholin), সময় টুকে রেখে, কনুই-এর সামনের মিডিয়েন কিউবিটাল (Median Cubital) শিরায় ইনজেকসন দেওয়া হয় এবং তারপর রোগী যখনই জিবে তেতোর স্বাদ পায় তখনই সেই সময় টোকা হয়। ইনজেকসন দেওয়া ও জিবে তেঁতো স্বাদ পাওয়া—যে সময় লাগে তাকে বাহু থেকে মুখে রক্ত চলাচলের সময় বলা হয়। এই সময় ৮ থেকে ১৭ সেকেণ্ডের মধ্যে থাকে এবং এই সময়ের গড় হল ১৩ সেকেণ্ড।

অনুরূপভাবে ইথার (Ether) ৫ ফোটা, ৫ মিলিলিটার ৯% সোডিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে মিশিয়ে ইনজেকশন করলে বাহু থেকে ফুসফুসে রক্ত চলাচলের সময় জানা যায়। এই সময় গড়ে ৬ সেকেণ্ড।

সমগ্র রক্ত চলাচলের সময় (Total circulation time) :

ফ্লুওরেসিন (Fluorescin) শিরায় ইনজেকসন করলে রক্ত হলদে রঙের হয়ে যায়। শরীরের এক দিকের একটি শিরায় ঐ ঔষধ ইনজেকসন করলে অন্য দিকের

সেই একই শিরায় রক্ত ফিরে আসতে যে সময় লাগে তাকে সমগ্র রক্ত চলাচলের সময় বলা হয়। ঐভাবে একদিকের ইণ্টারনাল যুগুলার শিরায় ইনজেকসন করলে অপর দিকের ইণ্টারনাল যুগুলার শিরায় ফিরে আসতে ২২ সেকেণ্ড সময় লাগে।

রক্ত চলাচলের তাৎপর্য্য :

(১) রক্ত চলাচলের সময় থেকে রক্ত চলাচলের পথ সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

(২) কিছু রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রক্ত চলাচলে কত সময় লাগল তা জানতে পারলে রোগকে চিহ্নিত করা যায় যেমন দুটি অলিন্দের পার্টিসান দেওয়ালে ফুটো থাকলে ঐ রোগের উপস্থিতির হদিস পাওয়া যায়। এই অবস্থায় ডানদিকের হার্ট থেকে বামদিকের হার্টে রক্ত সরাসরি চলে যায় যার ফলে রক্ত চলাচলের সময় কম লাগে।

(ক) কোন্ কোন্ রোগে বা অবস্থায় রক্ত চলাচলে বেশি সময় লাগে :

(১) হার্ট ফেলিওর অবস্থায়।
(২) রক্তপাতের পর শক অবস্থায়।
(৩) মিক্সিডিমা রোগে।
(৪) শরীরে জল কমে যাওয়ার দরুন শক অবস্থায়।
(৫) কার্ডিয়াক হাঁপানীতে।
(৬) খুব শীতে।
(৭) অতিরিক্ত বায়ু চাপের মধ্যে থাকার সময়।

(খ) কোন্ কোন্ অবস্থায় রক্ত চলাচলে কম সময় লাগে :

(১) রক্ত শূন্যতায়।
(২) হাইপারথাইরয়ডিজিম রোগে।
(৩) প্যাজেট রোগে।
(৪) ধমনী-শিরার ফিসচুলার ক্ষেত্রে।
(৫) জ্বরে।
(৬) খুব গরমে থাকার সময়।
(৭) খুব কম বায়ু চাপে থাকার সময়।

রক্ত চাপের কোন্ অবস্থায় রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায় (Critical closing time) :

যখন কোন ক্ষুদ্র রক্তবাহে রক্তচাপ খুবই কম হয়ে যায় প্রেসার হেড থাকলেও (বেশি-কম চাপের পরিমাত্রা) রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ছোট রক্তবাহগুলি বিভিন্ন কলার মধ্যে অবস্থিত থাকার দরুন যে কলার মধ্যে থাকে সেই কলার কোষ দ্বারা পরিবৃত থাকে যার ফলে ঐ কলা রক্তবাহের উপর চাপ সৃষ্টি করে। যখন রক্তবাহ নলের ভিতরের চাপ বাহিরের আবরনী কলার চাপ থেকে কমে যায় তখন রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থাকে ক্রিটিক্যাল ক্লোজিং প্রেসার (critical closing pressure) বা চাপ বলা হয়।

ধমনীর স্পন্দন (Arterial Pulse)

রক্তে পরিপূর্ণ ধমনীতে হৃৎপিণ্ড থেমে থেমে রক্ত নিক্ষেপ দ্বারা যে স্ফীতি ঘটায় তাকে ধমনীর স্পন্দন (Arterial pulse) বলা হয়। হৃৎপিণ্ড সংকোচন দ্বারা যে অতিরিক্ত রক্ত নিক্ষেপ করে সেই রক্ত ঢেউ-এর আকারে বেগে ধাবিত থাকার দরুন এবং যেহেতু জলীয় পদার্থরূপ রক্তচাপে নতি স্বীকার (Non compressible) করে না ঐ অতিরিক্ত রক্ত ধমনীর দেওয়ালকে স্ফীত করে দেয়। কোন অগভীর স্থানে (Superficial) অবস্থিত ধমনীর উপর আঙ্গুলের সাহায্যে এই পাল্‌স বা স্পন্দন অনুভব করা যায়। সাধারণতঃ কব্জির সামনে দিকের রেডিয়াল অস্থির উপর অবস্থিত রেডিয়াল ধমনীর স্পন্দন অনুভব করা হয়ে থাকে। অ্যানটিরিয়র টিবিয়েল, আর্টারিয়া ডরসেলিস পেডিস, ফিমোরাল, ব্রেকিয়েল, সুফারফিসিয়াল টেমপোরাল, ক্যারটিড ধমনী প্রভৃতি ধমনীগুলিও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পাল্‌স ঢেউ-এর গতিবেগ (Velocity of pulse wave) : এটা জানা আছে যে পাল্‌সের ঢেউ প্রতি সেকেণ্ডে ৫—৭ মিটার পর্যন্ত চলে। এই গতিবেগ দুইটি বস্তুর উপর নির্ভরশীল—(ক) রক্তবাহ দেওয়ালের নমনীয়তা, (খ) রক্তের জড়তা।

এটা দেখা গেছে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তবাহ নলের (ধমনীর) দেওয়ালের নমনীয়তাও ক্রমশঃ কমতে থাকে এবং এদের দেওয়াল অপেক্ষাকৃত শক্ত হয়ে যায় যার ফলে, এবং রক্তের জড়তা একই থাকার দরুন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের গতিবেগও বাড়তে থাকে। এই পাল্‌স ঢেউয়ের গতিবেগের অধিযন্ত্রবাদ লক্ষ্য করার জন্য কোন ধমনীর এক প্রান্তে বাহিরের দিক থেকে চাপ দিয়ে ঢেউ-এর

সৃষ্টি করে বেশ অনেকটা দূরে অন্য প্রান্তে ঢেউ পৌঁছাতে কত সময় লাগল তা নির্ণয় করা যায় :

পাল্‌স ঢেউ-এর গতিবেগ (**Velocity of pulse wave**) =

$$\frac{\text{মিলিমিটারে দূরত্ব}}{\text{সেকেণ্ডে সময়}} = \text{মিলিমিটার সেকেণ্ডে।}$$

পাল্‌স ঢেউ উৎপত্তির কারণ : এই পাল্‌স ঢেউ সৃষ্টির মূলে তিনটি কারণ রয়েছে—(১) ধমনীর মধ্যে পরিপূর্ণ রক্ত থাকা অবস্থায় হৃৎপিণ্ডের বারে বারে রক্ত নিক্ষেপণ, (২) প্রান্তীয় বাধা ও (৩) ধমনী দেওয়ালের নমনীয়তা। উপরি উক্ত কারণেই ধমনীর বেলাতেই পাল্‌সের ঢেউ অনুভব করা যায়। শিরার বেলায় এই ঢেউ অনুভব করা যায় না কারণ শিরার মধ্য দিয়ে রক্ত অবিচ্ছেদ্যভাবে গতি সম্পন্ন।

পাল্‌স ঢেউ-এর আকৃতি ও তাৎপর্য্য : স্ফিগমোগ্রাম যন্ত্রের সাহায্যে পাল্‌সের আকৃতি কাগজে-কালিতে ধরা যায়। একটি স্পর্শকাতর বস্তু (**Sensitive element**) অগভীর ধমনীর উপরে ঠিকমত বসিয়ে সেটিকে রেকর্ড করা যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং সেই যন্ত্র কাগজের উপর পাল্‌স ঢেউ-এর ওঠা-নামা রেখার মাধ্যমে ধরে রাখে।

যদি রেডিয়েল পাল্‌সের উপর স্ফিগমোগ্রাম লাগিয়ে পাল্‌সের ঢেউ-এর আকৃতি পর্য্যালোচনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে একটি তির্যকরেখা উপরের দিকে উঠে যায়। এই উর্দ্ধমুখী রেখা বাম নিলয় বেগে রক্ত নিক্ষেপের জন্য হয়ে থাকে। তারপর ঐ উর্দ্ধমুখী রেখা থেকে একটি নিম্নমুখী রেখা দেখা যায় এবং এর কারণ হ'ল প্রান্তীয় ধমনীগুলিতে রক্তের গতিবেগ বাম নিলয়ের গতিবেগ থেকে বেশি। আরও দেখা যায় ঐ নিম্নমুখী রেখা তির্যকভাবে নামবার সময় অল্প পরিসরে একটি কোনের সৃষ্টি ক'রে এবং তারপর আবার তির্যকভাবে নেমে যায়। এই কোনকে বা খাঁজকে ডাইক্রটিক (**Dicortic notch**) নচ বা খাঁজ বলা হয়। এই খাঁজের উৎপত্তির কারণ—নিলয়ের ডায়াস্টোল শুরুর মুখে মহাধমনীর মধ্যে রক্তপ্রবাহ গড়িয়ে হৃৎপিণ্ডের দিকে পড়তে থাকে কিন্তু অ্যায়টিক ভালব বন্ধ হওয়ার দরুন রক্ত-স্তম্ভ আটকে যায় এবং সেই কারণেই এই খাঁজ হয়ে যায়। এই খাঁজের পর রেখাটি
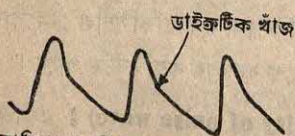
ডাইক্রটিক খাঁজ

স্বাভাবিক ধমনীর পাল্‌সের ঢেউ (রেখায়)

লম্বা হয়ে নেমে যায় এবং এই অংশকে ডাইক্রটিক ওয়েভ বলা হয়। এই ডাইক্রটিক ওয়েভ হৃৎপিণ্ডের ডায়াস্টোলকে ইঙ্গিত করে।

মাইট্রেল স্টেনোসিস ও অ্যায়টিক রিগারজিটেসন রোগে স্ফিগমোগ্রামে বিরূপ পরিবর্তন দেখা যায়।

পাল্সের চরিত্র ও দেখার নিয়ম ঃ ডান হাত ও বাম হাত উভয় হাতেরই রেডিয়েল পাল্স দেখা উচিৎ। বাম হাতে রোগীর কব্জিটি ধরে ডান হাতের মাঝের তিনটি আঙ্গুল কব্জির উপরে রেডিয়েল ধমনীর উপর রেখে পাল্স অনুভব করতে হবে। হাড়ের উপর অবস্থিত অন্য ধমনীরও পাল্স অনুভব করা যেতে পারে। রেডিয়েল পাল্স দেখার সময় হৃৎপিণ্ডের অবস্থান বরাবর রেডিয়েল ধমনী পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। পাল্সের নিম্ন লিখিত চরিত্রগুলি অনুভূতির মাধ্যমে বুঝতে হবে ঃ

১। **গতিমাত্রা (Rate) ঃ** বিশ্রামের সময় পাল্স নিয়মিত স্পন্দিত হ'লে ১৫ সেকেণ্ড কতগুলিস্পন্দন হচ্ছে তা গুনতে হবে এবং সেই সংখ্যাকে ৪ দিয়ে গুণ করলে মিনিটে কতগুলি স্পন্দন হচ্ছে তা জানা যাবে। পাল্স অনিয়মিত হ'লে ৩০ সেকেণ্ডে কতগুলি বিট হচ্ছে তা গুণে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে। বিশ্রামের সময় প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ স্পন্দন বা বিট পাল্সের স্বাভাবিক মাত্রা। যখন প্রতি মিনিটে পাল্সের বিট ৬০-এর কম হয় তাকে সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া বলা হয়। প্রতি মিনিটে বিট ১০০-র বেশি হলে সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া বলা হয় এবং এই অবস্থা স্বাভাবিক ভাবে আবেগ ও পরিশ্রমের দরুণ হ'তে পারে। যখন পাল্সের গতিমাত্রা প্রতি মিনিটে ১২০-র বেশি হয় তখন বুঝতে হবে কোন-না-কোন প্রকারের অ্যারিথমিয়া বর্তমান রয়েছে।

(২) **রিদম (Rhythm) নিয়মিত না অনিয়মিত ঃ** পাল্স অনুভব করার সময় স্পন্দন নিয়মিত না অনিয়মিত তা বুঝতে হবে। অনিয়মিত হলে বুঝতে হবে কি রকম অনিয়মিত অর্থাৎ ছন্দ পতন কত অন্তর অন্তর হচ্ছে বা ছন্দ পতন সম্পূর্ণ ই অনিয়মিত। স্বাভাবিক পাল্সে কখনও অনিয়মিত বিট হতে পারে যাকে আমরা এক্সট্রাসিস্টোল বলে থাকি। সম্পূর্ণ অনিয়মিত পাল্স অরিকুলার ফিব্রিলেসন দরুন ঘটে থাকে। অরিকুলার ফ্লাটার রোগে নিয়ম করে অনিয়মিত পাল্স অনুভব করা যায়।

(৩) **ভলিউম (Volume) বা ধাক্কার স্ফীতি ঃ** যখন ধাক্কার স্ফীতি বলবান তখন বুঝতে হবে বাম নিলয় দ্বারা রক্ত নিক্ষেপের পরিমান বেশি।

এইরূপ পাল্স অ্যায়টিক রিগারজিটেসনে, রক্ত শূন্যতা, গর্ভবতী নারী এবং থাইরোটক্সিকোষিস অবস্থায় পাওয়া যায়। শক্, হার্ট ফেলিওর ও রক্তে জলীয় অংশ কমে গেলে পাল্সের ঢেউ-এর ধাক্কা খুবই ক্ষীণ হয়ে থাকে।

(৪) **টেনসন (Tension) :** ধমনীর উপর আঙ্গুলের চাপ দ্বারা কতটা চাপে পাল্স স্তব্ধ হচ্ছে তাই থেকে টেনসন সম্বন্ধে কিছু অনুমান করা যায় কিন্তু কেবল স্ফিগমোম্যানোমিটার এর সাহায্যেই টেনসন সম্বন্ধে সঠিক ভাবে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব। পাল্সের টেনসন আমাদের ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে।

(৫) **ধমনী প্রাচীরের অবস্থা (State of vessel wall) :** পাল্স পরীক্ষার দ্বারা ধমনী প্রাচীরের অবস্থা অনুমান করা সম্ভব।

অস্বাভাবিক পাল্স

কোন কোন ক্ষেত্রে পাল্সের গতি-প্রকৃতি অস্বাভাবিক দেখা যায় এবং এই অস্বাভাবিক নির্দিষ্ট প্রকৃতিগত বৈশিষ্টের জন্য বিভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই প্রকৃতিগত বিভিন্ন পাল্স বিভিন্ন রোগের লক্ষ্যণ হিসাবে পরিচিত। নিম্নে এইরূপ অস্বাভাবিক পাল্সের পরিচয় দেওয়া হ'ল :

ডাইকরটিক পাল্স (Dicortic pulse) :

যখন প্রান্তীয় বাধা কম থাকে তখন স্ফিগমোগ্রামে ডাইকরটিক নচ (Dicortic notch) বা খাঁজ খুব গভীর থাকে। এই রকমের পাল্সকে ডাইকরটিক পাল্স বলা হয়। টাইফয়েড রোগে এই রকম পাল্স পাওয়া যায়।

অ্যানাকরটিক পাল্স (Anocortic Pulse) :

অ্যায়টিক স্টেনোসিস রোগে যেখানে অ্যায়টিক কপাটিকাগুলি জুড়ে গিয়ে বাম নিলয়ও মহাধমনীর সংযোগ মুখটি বোতাম ঘরের মত হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে অ্যানাকরটিক পাল্স পাওয়া যায়। স্ফিগমোগ্রামে এই পাল্সের উর্দ্ধমুখী রেখা খুব ছোট এবং পাল্সের ভলিউমও খুব কম থাকে এবং পালসের প্লেটো বেশি চওড়া থাকে এবং এই উর্দ্ধমুখী রেখায় একটি খাঁজ পাওয়া যায়।

অ্যায়োটিক স্টেনোসিস্ পাল্সের ঢেউ (রেখায়)

কোল্যাপসিং পাল্‌স (Collapsing Pulse) :

এই পাল্‌সকে ওয়াটার হ্যামার (water hammer) ও কড়িজেনস (corrigen's palse) পাল্‌সও বলা হয়ে থাকে। এখানে পাল্‌সের ভলিউম খুব বেশি থাকে এবং অ্যায়টিক রিগারজিটেসন রোগে পাওয়া যায়। রক্ত শূন্যতা, গর্ভবতী নারী, ও থাইরোটক্সিকোষিস রোগেও এই রকম পাল্‌স পাওয়া যেতে পারে। এখানে কোন ডাইকরটিক খাঁজ থাকে না কারণ অ্যায়টিক ভালব দোষ দুষ্ট এবং রক্তের পতন আটকাতে পারে না এবং রক্ত গড়িয়ে বাম নিলয়ে পড়ে যায়।

কোল্যাপসিং পালসের নক্সা (রেখায়)

পাল্‌সাস অলটারনাস (Pulsus alternus) :

এই পাল্‌সে উর্দ্ধমুখী রেখা একবার বড় ও একবার ছোট হতে দেখা যায়। এই রকমের পাল্‌স স্ফিগমোম্যানোমিটার বা স্ফিগমোগ্রাম যন্ত্রের সাহায্যে ভাল বোঝা যায়। ১০ থেকে ৪০ **mm.Hg.** রক্তচাপের তফাৎ ছোট বড় দুটি পাল্‌সের মধ্যে দেখা যায়, ভেন্টিকুলার ফেলিওর ও হাইপারটেনসনের ক্ষেত্রে এইরূপ পাল্‌স পাওয়া যায়।

পালসাস প্যারাডক্সাস (Pulsus paradoxus) :

শ্বাসনালীতে বাধা থাকলে যেমন অ্যাস্থমারোগ, পেরিকার্ডিয়েল ইফিউসন ও কনসট্রিকটিভ পেরিকার্ডাইটিসের ক্ষেত্রে এই রকমের পাল্‌স পাওয়া যায়। এই পাল্‌সের ক্ষেত্রে পাল্‌সের ভলিউম শ্বাস গ্রহণের সময় বেশ কমে যায়। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ১০ মিলিমিটার **Hg** পর্য্যন্ত রক্তচাপ (সিস্টোলিক) নিশ্বাস গ্রহনের সময় কমে যায় কারণ শ্বাস গ্রহণের সময় ফুসফুসীয় রক্তবাহগুলির রক্তধারণ শক্তি বেড়ে যায় ফলে কম রক্ত বাম নিলয়ে ফিরে আসে। এইরূপ পাল্‌সকে পালসাস প্যারাডকসাস বলা হয়।

শিরার পাল্‌স ও চাপ
(Venous Pulse and Pressure)

১৯০৮ সালে জেমস ম্যাকেনজি (**James Makenzie**) তাঁর পুস্তকে জুগুলার শিরার পাল্‌স সম্বন্ধে এক মনোরম পরিচিতি জ্ঞাপন করেছিলেন। তৎকালে

জুগুলার শিরার পাল্‌স সম্বন্ধে তিনি যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তদানিন্তন সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা ঐ বিষয়ে ততটা গুরুত্ব দিতে পারেন নি। আজকে আমরা তাঁর বক্তব্যের যথার্থতা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছি। অবশ্য কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেসন পদ্ধতি আবিষ্কারের পর এর গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেলেও তাঁর ব্যক্তব্যের গুরুত্ব ও বিশ্লেষণাত্মক ভূমিকা আজও অম্লান রয়েছে।

শিরার পাল্‌সের প্রকৃতি :

শিরার পাল্‌সের চরিত্র ধমনীর পাল্‌সের চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। শিরার পাল্‌স হাত দিয়ে অনুভব করা যায় না বরং দেখেই ভাল বোঝা যায়। প্রতিটি কার্ডিয়াক সাইকলে পলিগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে শিরার ক্ষেত্রে দুটি স্পন্দন (**Pulsation**) দেখা যায় কিন্তু ধমনীর ক্ষেত্রে একটি স্পন্দন দেখা যায়। সামান্য সামান্য চাপ দিয়ে শিরার পাল্‌সকে বন্ধ করে দেওয়া যায় কিন্তু ধমনীর ক্ষেত্রে অনেক বেশি চাপ দিয়ে তবে বন্ধ করে দেওয়া যায়। পেটে চাপ দিলে রক্ত বেশি মাত্রায় বুকের মধ্যে যায় এবং গলার শিরাকে ফুলিয়ে দেয় অর্থাৎ চাপ বাড়িয়ে দেয় এবং শিরাগুলি দেখা যায়। ধমনীর ক্ষেত্রে এরকম কোন ঘটনা ঘটে না।

ধমনীর পাল্‌সের মত শিরার পাল্‌স রক্ত প্রবাহে অতিরিক্ত রক্তের ঢেউ-এর দ্বারা সৃষ্ট হয় না বা কোন রক্তচাপের ঢেউ রক্তবাহ জালক দিয়ে শিরায় চলে যায় না। এই শিরার পাল্‌স হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে রক্তচাপের তারতম্যের জন্য গলার শিরার উপর প্রতিফলিত হয়। তাই গলার জুগুলার শিরার উপ ফ্লেবোগ্রামের সাহায্যে শিরার পাল্‌সের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি। জুগুলার শিরায় কোন কার্য্যকরী ভাল্‌ব থাকে না এবং এই শিরা হৃৎপিণ্ডের খুব কাছাকাছি থাকে। তাই হৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরীণ ঘটনা প্রবাহ এই শিরায় ভালভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। শ্বাস গ্রহণের সময় প্লুরা গহ্বরে নেগেটিভ চাপ বাড়ার দরুণ রক্তের গতিবেগ ত্বরান্বিত হয়ে হার্টে চলে যায়। এর প্রতিফলন শিরার পাল্‌সে ঘটতে দেখা যায়।

ফ্লেবোগাম ঃ জুগুলার শিরা পাল্‌সের ফ্লেবোগ্রাম পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে—এই নক্সায় তিনটি উর্দ্ধমুখী পজিটিভ রেখা যথা এ, সি এবং ভি-রেখা এবং তিনটি নিম্নমুখী নেগেটিভ রেখা যথা x, x এবং y পাওয়া যায়।

উর্দ্ধমুখী রেখার কার্য্যকারণ ঃ প্রথম উর্দ্ধমুখী রেখা এ (a) অলিন্দে রক্ত

আসতে না পারায় শিরায় রক্তের চাপ বাড়ে ও একটা ধাক্কার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয় উৰ্দ্ধমুখী রেখা সি (c) নিলয়ের সিস্টোলের জন্য হয়ে থাকে যখন অ্যাট্রিওভেন্টি্‌কুলার ভালব (A-V Valve) দক্ষিণ অলিন্দের দিকে ঢুকে আসে ও অলিন্দের রক্তে ধাক্কা দেয় ও সাময়িকভাবে গলার শিরা দক্ষিণ অলিন্দে রক্ত ফেলতে না পারায় রক্তের চাপ বেড়ে যায়। তৃতীয় উৰ্দ্ধমুখী রেখা ভি (V) ট্রাইকাসপিড ভালব (Tricuspid Valve) খুলে যাওয়ার জন্য হয়ে থাকে।

যুগুলার ভেনাস পালস.
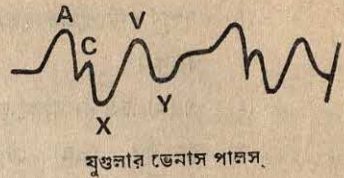
নিম্নমুখী রেখার কার্য্য-কারণ ঃ প্রথম নিম্নমুখী রেখা এক্স (x) অলিন্দের ডায়াস্টোলের জন্য এবং দক্ষিণ নিলয় সংকোচনের জন্য ট্রাইকাসপিড রিং (Tricuspid ring) নিচের দিকে নেমে আসার জন্য হয়ে থাকে। দ্বিতীয় নিম্নমুখী রেখা এক্স (x) নিলয়ের জন্য রক্ত অলিন্দে দ্রুত নেমে পড়ার জন্য হয়ে থাকে। তৃতীয় নিম্নমুখী রেখা ওয়াই (y) নিলয়ের ডায়াস্টোলের জন্য হয়ে থাকে যখন এ-ভি ভল্‌ব খুলে যায় এবং রক্ত অলিন্দ থেকে নিলয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

শিরা পাল্‌সের তাৎপর্য্য ঃ

জুগুলার ফ্লেবোগ্রাম থেকে শিরা পাল্‌সের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য আমরা জানতে পারি যা রোগ নির্ণয়ে একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার। নিম্নে শিরা পাল্‌সের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানান হচ্ছে ঃ

(১) কার্ডিয়াক সাইকল সম্বন্ধে শিরা পাল্‌স থেকে অনেক কিছু আমরা জানতে পারি যথা অলিন্দের ও নিলয়ের সংকোচন ও শিথিলায়ন, ভাল্‌ব বন্ধ হওয়া ও খোলা প্রভৃতি বিষয় জানতে পারি।

(২) এ-সি (a-c) সময়টি অলন্দি থেকে নিলয়ে কার্ডিয়াক ইমপাল্‌স পৌছাবার সময় নির্দেশ করে। ০·২$\frac{১}{৫}$ সেকেণ্ড এই ইমপাল্‌স প্রবাহের স্বাভাবিক সময়। হার্ট ব্লকের ক্ষেত্রে এই সময় বেড়ে যায়।

(৩) সি-ভি (c-v) সময় মুহূর্ত অপরিবর্তীত থাকে ও নিলয়ের সিস্টোলের সময় নির্দেশ করে।

(৪) সম্পূর্ণ হার্ট ব্লকের ক্ষেত্রে এ (a) উর্দ্ধমুখী রেখা অনেকগুলি থাকে।

(৫) এ (a) ঢেউ না থাকলে অলিন্দের ফিব্রিলেসন নির্দেশ করে।

(৬) খুব বড় এ-(a) ঢেউ (**Giant 'a' wave**) ট্রাইকাসপিড কপাটিকার সংকোচিত হওয়ার অবস্থা নির্দেশ করে যার ফলে অলিন্দ খুব জোরে জোরে সংকোচিত হতে থাকে বা এই অবস্থা থেকে বোঝা যায় যে দক্ষিণ অলিন্দ খুব বড় হয়ে গেছে (**Hypertrophied Rt. atrium**)।

(৭) ক্যানন ওয়েভ (**Cannon wave**) : সম্পূর্ণ হার্ট ব্লকের ক্ষেত্রে 'এ'- ওয়েভ বড় দেখা যায় কারণ অলিন্দ ও নিলয় একই সঙ্গে সংকোচিত হয়। ট্রাইকাসপিড কপাটিকা (**Tricuspid Valve**) জোরা লেগে দক্ষিণ অলিন্দ থেকে দক্ষিণ নিলয়ে যাতায়াতের পথ খুব ছোট হয়ে গেলেও এইরূপ হ'তে পারে।

কার্ডিয়াক ইসকিমিয়া
(Cardiac Ischaemia)

আজকাল ই-সি-জি যন্ত্রের বহুল প্রসার ও ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই 'ইসকিমিয়া' কথাটা জেনে গেছেন। কিন্তু এই কথাটির সঠিক অর্থ কি তা অনেকেরই ভাসা ভাসা জানা থাকলেও সম্যক উপলব্ধিতে নাই। 'কার্ডিয়াক ইসকিমিয়া' বা ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ বলতে এক কথায় আমরা যা বুঝি তা হ'ল 'করনারী ধমনীর বৈকল্য জনিত' হৃৎপিণ্ড পেশীতে বিপাকীয় প্রয়োজনের চাহিদা মত অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ করিতে করনারী ধমনীর অক্ষমতা। অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড পেশীর চাহিদা (অক্সিজেন ও পুষ্টি) মেটাতে, সরবরাহকারী করনারী ধমনী দ্বয়ের অক্ষমতা। জীবন ধ্বংসকারী এই রোগটি অর্থাৎ 'ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ' অন্য নামেও পরিচিত যেমন অ্যাথিরোসক্লেরোটিক হার্ট ডিজিজ, করনারী আর্টারি ডিজিজ ও করনারী হার্ট ডিজিজ।

উন্নত দেশে, উন্নতির সাথে সাথে, এই রোগের প্রসার ও বিধ্বংসী ক্রিয়াকাণ্ড এমন পর্য্যায়ে এসে পৌছেচে যে 'করনারী এপিডেমিক' বল্‌লে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। ১৯৭৪ সালে ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসে এক সমীক্ষায়[১] দেখা গিয়েছিল যে সমগ্র মৃত্যুর শতকরা ৫৪.৪ জনের মৃত্যু হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর রোগে ঘটেছিল এবং এই মৃত্যু সংখ্যার ৫০.৮ ভাগ লোক শুধু ইসকিমিস হৃদরোগে মারা যেতে দেখা গিয়েছিল। ধমনী দেওয়ালে অ্যাথিরোসক্লেরোসিস পরিবর্তন আসার জন্য বেশির ক্ষেত্রেই ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ হয়ে থাকে। যে হেতু এই রোগের প্রকোপ শুধু যে বয়স্কদের মধ্যেই করনারী ধমনী দেওয়ালের বৈকল্য ঘটিয়ে থাকে তা নয়, এই রোগ অল্প বয়স্ক পুরুষ ও নারীদেরও আক্রমণ করে থাকে এবং যে হেতু এই রোগই ইসকিমিক হৃৎপিণ্ড রোগের মুখ্য কারণ সেই হেতু নিম্নে এই রোগটি (অ্যাথিরোসক্লেরোসিস) সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও চিকিৎসা উভয় ক্ষেত্রেই সহায়ক হবে।

বিগত কোরীয় যুদ্ধে গড় ২২ বৎসর বয়সের যুবকেরা, যারা যুদ্ধে মারা গিয়েছিল, শবব্যবচ্ছেদে তাদের মধ্যে শতকরা ৭৬.৩ জনের ক্ষেত্রে করনারী ধমনীর বৈকল্য থাকতে দেখা গিয়েছিল। এই পর্য্যবেক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে,

---

১। D. J. Caltart, Prices Text Book of Practice of Medicine, Oxford University Press, 1978 Low Priced 12th Ed. Reprint, 1982.

আমাদের চিরাচরিত ধারণা যে ৪০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধেই হৃদরোগ বা করনারী ধমনী রোগ হ'য়ে থাকে, সেটি পাল্টাতে হবে। অল্প বয়সী রোগী বুকে ব্যাথা, অস্বস্থি ইত্যাদি অনুযোগ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে এলে সমধিক গুরুত্ব দিয়েই রোগীর করনারী ধমনীর বৈকল্য নাই তা বিচার বিবেচনা ক'রে দেখতে হবে।

এই রোগ সম্বন্ধে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই—যারা গায়ে গতরে পরিশ্রম করে ও সাদা-মাটা আহার বিহার ক'রে দিন গুজরাণ করে তারা খুবই কম সংখ্যায় এই রোগে আক্রান্ত হয়। তাই বলতে ইচ্ছা করে 'বিধি যাদের ধন-দৌলত দিয়েছেন তাদের এই রোগটিও দিয়েছেন, আর যাদের ধন-দৌলত দেন নি তাদের কাছ থেকে এই রোগটি সরিয়ে রেখেছেন'। কেউ কেউ বলেন—তাঁর কাজের খুঁত নাই—এই কথাটাই বোধ সত্য। তবে শ্রমজীবিদের মধ্যে যে এই রোগ হয় না তা নয়, সংখ্যায় অনেক কম হয়।

করনারী ধমনী কেন অক্সিজেন ও পুষ্টি যোগান রাখতে পারে না।

করনারী ধমনী অক্সিজেন ও পুষ্টির যোগান রাখতে পারে না, কারণ ধমনী অভ্যন্তরের নালী পথ বৈকল্য জনিত সংকীর্ণ হয়ে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়, যার জন্য প্রয়োজন মত বা একেবারেই রক্ত সঞ্চালন করতে পারে না। রক্তই অক্সিজেন ও পুষ্টি বহন করে নিয়ে যায় তাই রক্ত পরিমাণ মত যেতে পারে না বলেই হৃৎপিণ্ড বিকল হ'য়ে যায়। করনারী ধমনীর গোড়ার অংশ, যাকে প্রধান স্টেম বলা হয়, শাখা বা প্রশাখা, যে কোন অংশেরই নালী পথ সংকীর্ণ বা বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে এবং কতটা নালী পথ অবরুদ্ধ বা সংকীর্ণ হয়েছে তার উপর রোগের গুরুত্ব বা ফলাফল নির্ভর করে থাকে।

করনারী ধমনীর নালীপথ কেন সংকীর্ণ হয়ে যায় ?

করনারী ধমনীর অভ্যন্তরীণ নালীপথ সংকীর্ণ বা বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণ— **ধমনী দেওয়াল অ্যাথিরোমেটাস রোগে আক্রান্ত হয়।** হৃৎপিণ্ড পেশীর স্ফীতি (Hypertrophy) এবং অক্সিজেন-হিমোগ্লোবিন বন্ধন প্রক্রিয়ায় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যও কদাচিৎ করনারী ধমনী দেওয়ালের বৈকল্য দেখা যায়। জমা রক্তের টুকরো বা অন্য কোনরূপ বস্তুর টুকরো (Embolus) কখনও কখনও করনারী ধমনীর মধ্যে আটকে গিয়ে করনারী ধমনী রোগের সৃষ্টি করতে পারে। যেহেতু করনারী ধমনীর অ্যাথিরোমেটাস রোগই বা অ্যাথিরোসক্লেরোসিস

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই রোগ ঘটিয়ে থাকে সেজন্য এই রোগটি সম্বন্ধে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে ঃ

অ্যাথিরোসক্লেরোসিস (Atherosclerosis) ঃ

অ্যাথিরোসক্লেরোসিস ধমনী দেওয়ালের একটি রোগ যেখানে ধমনী দেওয়ালের মধ্যে প্যাথোলজিকেল বস্তু বিশেষ সঞ্চিত হয়। এই দেওয়াল মধ্যস্থিত সঞ্চিত বস্তু যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তারই ফল স্বরূপ ধমনী দেওয়ালে পরিবর্তন দেখা যায় এবং এই পরিবর্তন **ধমনীর অভ্যন্তরীণ নালীকে সংকীর্ণ করে দেয়** এবং আরও প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যার ফলে **ধমনী দেওয়াল শক্ত হয়ে যায়, স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়** এবং **ভঙ্গুরত্ব দোষদুষ্ট হয়ে পড়ে**। যে বস্তুটি ধমনী দেওয়ালে অবস্থান ক'রে প্রতিবন্ধকতার আকর হ'য়ে থাকে এবং নানান ভাবে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তাকে চিকিৎসা শাস্ত্রে **অ্যাথিরোমেটাস প্লেক** (Atheromatous Plaque) বলে।

এই **অ্যাথিরোমেটাস প্লেক** কেমন করে সৃষ্টি হয় তার সম্বন্ধে সর্ব সম্মত যুক্তিগ্রাহ্য তথ্য আজও নিরূপিত হয় নাই। বহু জনে বহু রকম মতবাদ রেখেছেন কিন্তু এই বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত মতবাদগুলি অধিকতর যুক্তি গ্রাহ্য।

ডিজেনারেটিভ সূত্র (Digenerative Theory) ঃ এই সূত্রে বলা হয় ধমনী দেওয়ালের নিজস্ব টিসুর মধ্যে স্থিতিস্থাপক ও সংযোগক কলার ক্ষয়-ক্ষতির অংশ এই প্লেক সৃষ্টি করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে যে অ্যাথিরোমেটাস প্লেক হওয়ার অনেক পরে ডিজেনারেটিভ লক্ষণ ও পরিবর্তন দেখা যায়। আরও গোল লাগছে এই কারণে যে এই সূত্রে কি ক'রে প্রথম অবস্থায় ডিজেনারেসনের সূচনা হয় ও প্লেক তৈরি হয় তার কোন হদিস পাওয়া যায় না।

ইনসুডেটিভ সূত্র (Insudative Theory) ঃ এই সূত্র বর্তমানে বহুজন স্বীকৃত এবং জীবনধারা ও স্রোতধারা (প্লাজমা সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও গবেষণা দ্বারা বহুলাংশে প্রমাণিত।

এই সূত্রের অবতারণায় বলা হয়েছে, রক্তবাহকে (ধমনী) একটি জড় নল বা টিউব বললে চলবেনা। জড় টিউবের মধ্য দিয়ে তরল পদার্থ যাতায়াত করতে করতে যেমন পলি পড়ার মত কিছু কিছু জিনিস দেওয়ালে লেগে যায় এবং সেই বস্তু ক্রমশঃ জমে জমে টিউবের নালী পথ সংকীর্ণ করে দেয় ও দেওয়ালকে পুরু

ক'রে দেয়, ঠিক সে-রকম ভাবেই ধমনীর ভিতরের স্তরটি অর্থাৎ এণ্ডোথিলিয়েল স্তরটি জায়গায় জায়গায় পুরু হয়ে যায়—এ কথা বলা যাবে না।

ধমনী একটি জীবন্ত টিউব যার ভিতর দিয়ে উচ্চ চাপে রক্ত চলাচল করে, যার ফলে স্বাভাবিক ভাবে প্লাজমার প্রোটিন চাপের চোটে ধমনী দেওয়ালের মধ্যে ঢুকে যায় এবং স্বাভাবিক ভাবে ঐ প্রোটিন ধমনী দেওয়ালের বাহির অংশে (**Tunica Adventitia**) আসে এবং সেখান থেকে লিমফ্যাটিক পথ দিয়ে আবার রক্তে চলে যায়। অ্যাথিরোসক্লেরোটিক রোগ কেন হয়? এর ব্যাখ্যায় এই সূত্রের প্রবক্তারা বলেন, কিছু বড় মলিকিউল উক্ত যাবার পথে ধমনী দেওয়ালের সংযোজক কলার চার্জড অংশের সঙ্গে মিলিত হয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তারই ফলে অ্যাথিরোসক্লেরোটিক রোগ হয়ে থাকে। প্লাজমার **ফিব্রিনোজেন ও লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন**, ধমনী দেওয়ালের মধ্য দিয়ে টিউনিকা অ্যাড্‌ভেনটিসিয়ার দিকে যাবার পথে সংযোজক কলাতে আটকে যায়। এই আটকে যাওয়া ফিব্রিনোজেন ও লাইপোপ্রোটিন, ধমনী দেওয়ালে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যার দরুন প্রবৃষ্ট প্রোটিনগুলির স্বাভাবিক গতিপথ রুদ্ধ হ'য়ে যায়। অবরুদ্ধ লাইপোপ্রোটিন ভেঙ্গে কোলেসটেরল ও আরও অন্য পদার্থে রূপায়িত হয় যারা সংযোজক কলার বৃদ্ধি ঘটায় এবং অ্যাথিরোমেটাস বস্তুর সৃষ্টি করে।

ঐ সূত্রের প্রবক্তারা, প্লাজমা প্রোটিন যে ধমনী দেওয়াল ভেদ করে বাহিরের দিকে যায়, গবেষণার দ্বারা তা প্রমাণ করেছেন। রঞ্জিত প্রোটিন ও রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ ব্যবহার করে তারা দেখিয়েছেন যে ঐ প্রোটিন ধমনী দেওয়াল ভেদ করে টিউনিকা অ্যাডভেনটিসিয়াতে স্বাভাবিকভাবে গমন করে থাকে।

ঐ অ্যাথিরোমেটাস বস্তুকে যা ধমনী দেওয়ালে টিউনিকা ইন্টিমায় জায়গায় জায়গায় জমে থাকতে দেখা যায়, **অ্যাথিরোমেটাস প্লেক** বলে।

অ্যাথিরোমেটাস প্লেক হলে কি কি হ'তে পারে

অ্যাথিরোমেটাস প্লেক প্রধানতঃ টিউনিক ইন্টিমাতে সীমাবদ্ধ থাকে। করনারী ধমনীর জায়গায় জায়গায়, সাধারণতঃ যেখানে বাঁক থাকে বা যেখানে ভাগ হয়, সেই সব জায়গায় অ্যাথিরোমেটাস প্লেক হ'তে দেখা যায়। প্লেক সৃষ্টি হ'লে যা যা পরিণতি হ'তে পারে তা নিম্নে দেওয়া হ'ল :

(১) অ্যাথিরোমেটাস প্লেক বাড়তে থাকে এবং বাড়তে বাড়তে

করনারী ধমনী নালীকে সংকীর্ণ করে দেয় এবং কখনও কখনও নালী পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে।

(২) টিউনিকা মিডিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে যার ফলে পেশী কোষগুলি নষ্ট হ'য়ে যায় এবং ঐ স্থান সংযোজক কলার দ্বারা পূর্ণ হয়।

(৩) প্লেক ভেঙ্গে গিয়ে ধমনী নালী পথ বন্ধ করে দিতে পারে।

(৪) ধমনীর মধ্যে রক্ত জমে যেতে পারে (**Thrombosis**)।

(৫) ফেটে গিযে ঘা হ'য়ে যেতে পারে।

(৬) ধমনী ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাত হ'তে পারে।

অ্যাথিরোমেটাস প্লেকটি কি বস্তু ?

এই প্লেক প্লেটের মত ধমনী-এণ্ডোথিলিয়ামের উপর গুড়পিঠের মত ফুলো ফুলো জায়গা যার ভিতর প্লাজমার জৈব রাসায়নিক পদার্থ এবং ধমনী দেওয়ালের ক্ষয় প্রাপ্ত টিস্যুর অংশ-বিশেষ প্রভৃতি একত্রে মিলে একটা মিশ্রিত পদার্থ যা এণ্ডো-থিলিয়াম দেওয়ালের মধ্যে থাকে। যে প্লেকগুলি অনেক দিনের তাদের মাঝখানে একটি নিক্রোটিক সেণ্টার থাকে যেটি সংযোজক কলার আবরণে ঢাকা থাকে। ঐ নিক্রোটিক বস্তু বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত পদার্থগুলি পাওয়া যায় :

(১) কোলেসটেরলের দানা (**Crystal**) ও কোলেসটেরল এষ্টার (**Cholesterol crystal and cholesterol ester**)।

(২) কোষ ধ্বংসাবশেষ (**Cell debris**)।

(৩) ক্যালসিয়াম (**Calcium**)।

(৪) অরেখিত পেশী কোষ (**Plain muscle cell**)।

(৫) ফাইব্রিন (**Fibrin**)।

(৬) লিপিড (**Lipid**)।

লিপিড, অ্যাথিরোমা ও কার্ডিয়াক ইসকিমিয়ার সম্বন্ধ :

খাদ্যের মাধ্যমে আমরা নানাভাবে নিত্য লিপিড গ্রহণ করি—তাই আগেই আমাদের জানা দরকার লিপিডের সঙ্গে অ্যাথিরোমার কোন সম্পর্ক আছে কিনা বা কি রকম সম্পর্ক আছে।

আমরা জানি রক্তের কোলেসটেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড-এর স্বাভাবিক স্তর যথাক্রমে ১৮০—২৫০ মিলিগ্রাম/১০০ এম. এল. এবং ১৪০—১৯০ **mg.** / ১০০

এম. এল. (পঞ্চাশ উর্দ্ধ বয়েসের ক্ষেত্রে)। এই কোলেসটেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড ছাড়াও আরও অন্য রকম জটিল ধরনের লাইপোপ্রোটিন রক্তে থাকে যাদের অধিক মাত্রায় রক্তে উপস্থিতি করনারী ধমনীতে অ্যাথিরোমেটাস রোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং ইসকিমিক হৃদরোগের কারণ হ'য়ে থাকে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা জানা গেছে ঐ সমস্ত লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন-এর আয়তন, ডেনসিটি ও মোবিলিটি ভিন্ন ভিন্ন রকমের। ঐ ভিত্তিতে এদের পাঁচটি টাইপে ভাগ করা হয়েছে যথা টাইপ—I, II, III, IV ও টাইপ—V। যেহেতু ঐ সমস্ত লাইপো-প্রোটিন, কোলেসটেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, ব্যবহারিক দিক থেকে, সিরাম কোলেসটেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের পরিমাণগত মাত্রা রক্তে কতটা আছে জানলেই (কম কিম্বা বেশি ; বেশি থাকলে ধরে নেওয়া যায় যে অন্য লিপিডগুলিও বেশি আছে) চিকিৎসা বা উপদেশ কোন ক্ষেত্রেই বিশেষ অসুবিধা হবে না।

সিরাম কোলেসটেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের সঙ্গে অ্যাথিরো-মেটাসের সম্পর্ক ঃ

এখন আমরা দেখব সিরাম কোলেসটেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড অ্যাথিরোমেটাস রোগের সঙ্গে কতটা সম্বন্ধযুক্ত। নিম্নে এই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছি ঃ

(১) যে সমস্ত জন্তুদের কোলেসটেরল অতি মাত্রায় খাইয়ে বা অন্যভাবে খাদ্যের মাধ্যমে খাইয়ে রক্তে কোলেসটেরলের পরিমাণ কিরূপ আছে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে অধিক পরিমাণে কোলেসটেরল খাওয়ালে রক্তে কোলেসটেরল বৃদ্ধি পায় এবং ঐ বর্দ্ধিত কোলেসটেরল অ্যাথিরোমেটাস রোগ ঘটাতে দেখা যায়।

(২) যাদের প্লাজমায় লিপিডের মাত্রা বেশি থাকে তাদের ক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে ইসকিমিক হৃদরোগ বেশি হ'তে দেখা যায়।

(৩) এটা আরও দেখা গেছে যে প্লাজমায় যদি হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন উচ্চ মাত্রায় থাকে তাহলে ইসকিমিক হৃদরোগ কম হয় কিন্তু লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন উচ্চ মাত্রায় থাকলে ইসকিমিক হৃদরোগ বেশি হ'য়ে থাকে।

(৪) যেসব ক্ষেত্রে লিপিড বিপাকে বিশৃঙ্খলা হয় সেসব ক্ষেত্রেও ইসকিমিক হৃদরোগ বেশি হ'তে দেখা যায়, যেমন ডায়াবিটিস মেলিটাস, মিক্সিডিমা, নেফ্রোটিক সিনড্রোম ও হাইপোথায়রয়ডিজম।

(৫) ধনী দেশে প্রাচুর্য্যের মহিমায় অ্যাথিরোমেটাস রোগ গরীব দেশের লোকেদের থেকে বেশি ঘটতে দেখা যায়। আরও দেখা গেছে ধনী দেশের লোকেদের গরীব দেশের লোকেদের থেকে সিরাম কোলেসটেরল স্বাভাবিকভাবেই বেশি থাকে এবং কার্ডিয়াক ইসকিমিয়াও বেশি ঘটে থাকে।

(৬) যুদ্ধের সময়, বার-ব্রত পালনের সময়, লম্বা উপোষ প্রভৃতি অবস্থায় যেখানে খাদ্যের ও পুষ্টির যোগান ব্যাহত হয়, সেইসব ক্ষেত্রে রক্তে লিপিডের পরিমাণ কম থাকে এবং অ্যাথিরোমেটাস রোগও কম হয়।

(৭) টাইপ-II ও III লাইপিডিমিয়ার ক্ষেত্রে, যেখানে লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন সিরামে বেশি থাকে, সেখানে ইসকিমিক হৃদরোগের ঘটনা বেশি ঘটতে দেখা যায়।

(৮) সিস্‌টেমিক রক্ত চাপাধিক্যের (**High blood pressure**) ক্ষেত্রে ইসকিমিক হৃদরোগ বেশি হয়।

(৯) **ফ্রেমিংহামের বিখ্যাত গবেষণায়** প্রমাণিত হয়েছে যে **হাই ব্লাড প্রেসর, হাই সিরাম লিপিড** ও **ধুমপান** ঘনিষ্ঠভাবে ইসকিমিক হৃদরোগের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।

(১০) যে সব ক্ষেত্রে মায়েদের ওভারিদ্বয় রোগ জনিত কারণে অপারেশন দ্বারা ফেলে দেওয়া হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যাথিরোমেটাস রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয় এবং ইসকিমিক হৃদরোগও বেশি ঘটে থাকে।

উপরি উক্ত কার্য্য কারণগুলি ভারতীয় সামাজিক আচার আচরণের দৃষ্টি কোন থেকে বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে আমরা যে বার-ব্রত পালন করার জন্য উপবাস, একাদশী-অমাবশ্যায় খাদ্য সংযম, পূজা অর্চনায় উপবাস ইত্যাদি ধর্মীয় আচার পালন করি তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বোধ হয় শরীরকে ঠিক রাখা এবং এই সব আচার আচরণ গোঁড়ামী দোষদুষ্ট না হ'লে, শরীরকে নীরোগ রাখতে এবং হৃৎপিণ্ড রোগের কবল থেকে বহুলাংশে (ধর্মের বন্ধনে) নিষ্কৃতি পেতে একটি বলিষ্ঠ সামাজিক ব্যবস্থা, যা সহজেই পালন করান যায় এবং পালন করা উচিৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় সমাজ চেতনায় নৈষ্টিক আচার আচরণের মানসিকতা, ভোগ বিলাসী আজকের দুনিয়ায়, অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে।

কার্ডিয়াক ইসকিমিয়ার প্রধান কারণ, করনারী ধমনীর অ্যাথিরোমা রোগ। এই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা বেশ কিছুটা আগেই করেছি। এখন আমরা দেখব, কার্ডিয়াক ইসকিমিয়ায় কি কি লক্ষণ দেখা যায় বা রোগীর কাছ থেকে

কি কি অনুযোগ আমরা পাই। অভিজ্ঞতায় আমরা জানি কার্ডিয়াক ইসকি-মিয়ায় আক্রান্ত রোগীরা বিশেষ অনুযোগ না করতে পারে আবার কেউ কেউ কিছু কিছু নির্দিষ্ট অনুযোগ করে থাকে। সেই অনুযোগগুলিকে সমষ্টিগতভাবে অ্যানজাইনা পেকটোরিস নামে নাম করণ করা হয়েছে এবং এই নামেই এই অনুযোগ সমষ্টি (**symptom complex or Syndrom**) সমধিক পরিচিত। নিম্নে উল্লেখিত রোগগুলি একই ব্যাধির (কার্ডিয়াক ইসকিমিয়ার) প্রসার ও বিভিন্ন পরিণতি :

(১) অ্যানজাইনা পেকটোরিস (**Angina pectoris**)

(২) অ্যাকিউট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন
(**Acute myocardial Infarction**)

(৩) আনষ্টেবল অ্যানজাইনা (**Unstable Angina**)

(৪) কার্ডিয়াক ফেলিওর (**Cardiac failure**)

(৫) অ্যারিথমিয়া বা বিশৃঙ্খল হৃদপিণ্ডগতি (**Arrhythmia**)

(৬) সাডেন ডেথ (**Sudden Death**) বা হঠাৎ মৃত্যু।

অ্যানজাইনা পেকটোরিস
(Angina pectoris)

বহু পূর্বে হেবার্ডেন (**Heberden**) নামে এক গবেষক এক গুচ্ছ অনুযোগ সমষ্টিকে অ্যানজাইনা পেকটোরিস (**Angina Pectoris**) বলে চিহ্নিত করে-ছিলেন যদিও সে সময়ে জানা ছিল না এই অনুযোগ সমষ্টির কারণ, বা জানা ছিল না হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে এই অনুযোগ সমষ্টির কোন সম্বন্ধ আছে কিনা। আবিষ্কর্তার নামটি স্মরণে রাখার জন্য ঐ অবস্থাটি **হেবার্ডেনের অ্যানজাইনা** (**Heberden's Angina**) নামেও পরিচিত। বর্তমানে আমরা জানি কার্ডিয়াক ইসকিমিয়ার জন্যই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং এই ইসকিমিয়া আবার করনারী ধমনীর অ্যাথিরোমেটাস রোগের জন্য হয়ে থাকে। অনুযোগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই অবস্থাকে শ্রমঘটিত অ্যানজাইনাও (**Angina of Effort**) বলা হয়ে থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই করনারী ধমনীর অ্যাথিরোমেটাস রোগের জন্য অ্যান-জাইনা পেকটোরিস হয়ে থাকে কিন্তু সিফিলিস রোগে করনারী ধমনীর মুখ ছোট হয়ে গিয়ে জমা রক্তের বা অন্য কিছুর টুকরো করনারী ধমনীতে আটকে গিয়ে অ্যানজাইনা হতে পারে। আবার করনারী ধমনীর জন্ম গত বিভ্রাটের জন্যও অ্যানজাইনা হতে পারে।

অ্যানজাইনা পেকটোরিস-এর **প্রধান অনুযোগ হ'ল**—বুকে ব্যথা। এই ব্যথার চরিত্র, প্রসার, উত্তেজক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধ, ব্যথার স্থায়ীত্ব ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য অনুযোগ—এই সব তথ্যগুলি মিলিয়ে অ্যানজাইনা পেকটোরিসকে চিনতে হবে। নিম্নে আমরা ঐ বিষয়গুলি নিয়েই আলোচনা করছি :

ব্যথা কোথায় অনুভূত হয় :

বিভিন্ন রোগী বিভিন্নভাবে ব্যথার স্থানের কথা বলে থাকেন যেমন অনেকেই বলে থাকেন ব্যথাটি ঠিক বুকের মাঝখানে, কেউ বলেন ষ্টারনামের উপরের অর্দ্ধেকের পিছনে, কখনও ষ্টারনামের নিচে এপিগ্যাসট্রিক পিটের (**pit**) ঠিক পিছনে, ষ্টারনামের ঠিক বাঁ পাশে, কখনও ডান পাশে (বাঁ পাশেই বে[illegible]) কখনও সমস্ত বুকের মাঝখানে, কখনও ষ্টারনামের ঠিক উপরে, গলার মাঝ[illegible]ন ব্যথার কথা কেউ কেউ বলে থাকেন।

ব্যথার চরিত্র, প্রসার ও উত্তেজক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্বন্ধ :

অ্যানজাইনা পেকটোরিসের ব্যথার বিশেষত্ব হল প্রথম প্রথম রোগী বলতে থাকেন—কাজ ছিল একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম হঠাৎ বুকের মাঝে একটা তীব্র কনকনে ব্যথা, একটু দাঁড়িয়ে গেলাম-কিছুক্ষণ বাদে ব্যথা একেবারেই চলে গেল। তারপর থেকে যখনই একটু কিছু শ্রম করি, শ্রমের সাথে সাথে একই রকমের ব্যথা হয়। আরও পরে, বিশ্রামের সময়েও ব্যথা হ'তে থাকে। অর্থাৎ শ্রমের সঙ্গে বুকের মাঝখানে ব্যথার সম্পর্ক অ্যানজাইনা পেকটোরিসের ব্যথার একটি বিশেষ পরিচয়। আরও একটি ঐ ব্যথার বিশেষ পরিচয় হ'ল ঝিনঝিনে ব্যথা বুকের ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে বাম বাহুর ভিতরের দিকে ছড়িয়ে পড়া; উপবাহুর ভিতরের দিক দিয়ে কড়ে আঙ্গুলের দিকে ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে পারে। কখনও কখনও অনুরূপভাবে ডান হাতের দিকেও ব্যথা ছড়িয়ে পড়তে পারে। কখনও কখনও দু-বাহুতেই ব্যথা ছড়িয়ে যায়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ষ্টারনামের ওপরে খুব অল্প জায়গায় ব্যথা সীমাবদ্ধ থাকে। কখন কখনও নিচের চোয়ালেও ঝিনঝিনে ব্যথা অনুভূত হ'তে পারে। খুব কদাচিৎ পিছন দিকে দুটো পালকার মাঝখানে ব্যথা অনুভূত হতে পারে। কখনও কখনও গুরু ভোজনের পর ব্যথা আরম্ভ হয়; কখনও কখনও সঙ্গমের সময় ও রাগ বা অন্য রকম উত্তেজনার সময়ও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। খুবই কম ক্ষেত্রে ঘুমের মধ্যেও ব্যথা হতে পারে, ব্যথার চোটে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

কি রকমের ব্যথা রোগীকে জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলতে থাকেন—বুকের মাঝখানের গভীরে যেন কিছু চেপে ধরেছে, কেউ বলেন বুকের ভিতরে কিছু যেন মোচরাচ্ছে, আবার কেউ কেউ বলেন বুকে যেন ছুরি বিঁধছে।

ব্যথার স্থায়ীত্ব :

সাধারণতঃ ব্যথা ১-৩ মিনিট স্থায়ী হয়। ১৫ মিনিট বা এর বেশি সময়ও ব্যথা থাকতে পারে। তীব্র ব্যথা কমে যাবার পর অস্বস্তি অনেক সময় পর্যন্ত থাকতে পারে।

আনুসঙ্গিক অন্যান্য অভিযোগ :

কোন কোন রোগী অল্প শ্বাস কষ্টের কথাও বলে থাকেন। কখনও কখনও ব্যথার সঙ্গে সঙ্গে মাথাও ঘুরে যায়। কেউ কেউ বুক ধরফর করার কথা বলে।

ব্লাড প্রেসর পরীক্ষা ক'রে দেখলে—প্রেসর সামান্য বেশি বা স্বাভাবিক দেখা যায়। সাধারণতঃ আর অন্য কিছু পরীক্ষা করে পাওয়া যায় না।

রোগ নির্ণয় :

ইতিহাস : রোগী যদি ঠিক ঠিক রোগের বিবরণ দিতে পারে, যথা ব্যথার স্থান, শ্রমের সঙ্গে সম্পর্ক অর্থাৎ শ্রমের এক পর্যায়ে ব্যথার উৎপত্তি এবং বিশ্রামে ব্যথার নিবৃত্তি, বাম বা দক্ষিণ বাহুর দিকে ব্যথার প্রসার, এবং একই রকমের ব্যথা বেশ কয়েকবার হয়েছে, তা হ'লে রোগ নির্ণয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। অন্যান্য রোগে অ্যানজাইনার মত ব্যথা হ'তে পারে কিন্তু তাদের থেকে কেমন করে তফাৎ করা যাবে তা অনুসন্ধান ও বিচার বিবেচনার মাধ্যমে যেভাবে তফাৎ করতে হবে তা নিম্নে আলোচনা করছি :

ইসোফেজিয়েল রিফ্লাক্স (Oesophageal reflux) **:** যখন পাকস্থলী থেকে অম্লমিশ্রিত বস্তু খাদ্য নালীতে উঠে আসে তখন যে ব্যথা হয় তা প্রায় অ্যানজাইনা পেকটোরিসের মত। কিন্তু এই ব্যথার শ্রমের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না—সম্পর্ক থাকে শরীরে অবস্থানের সঙ্গে অর্থাৎ শুয়ে থাকলে বা সামনের দিকে হেঁট হ'লে বা খাদ্য গ্রহণের সময় ব্যথা হয়। মুখে টক টক জল উঠতে প্রায়ই দেখা যায় আর সঙ্গে ব্যথাও হয়। কখনও কখনও পেটও ফেঁপে যায়।

পেপটিক আলসার (Peptic ulcer) **:** ব্যথা পেটের উপরের দিকে থাকে এবং খাদ্য খেলে বা অম্ল নাশক ঔষধ খেলে কমে যায়।

পালমনারী এম্বলিজম (Pulmonary Embolism) **:** কখনও কখনও এই রোগের ব্যথা অ্যানজাইনার মত মনে হলেও সহজেই অ্যানজাইনা থেকে তফাৎ করা যায়। পালমনারী এম্বলিজমে মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা, শর্দিকাসির আক্রমণ, পা ফোলা এবং হালফিল শরীরের কোথাও অপারেশন হওয়ার খবর পাওয়া যেতে পারে এবং **ব্যথা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।**

সারভাইকল স্পনডাইলোসিস (Cervical Spondylosis) **:** এই রোগেও অ্যানজাইনার মত বুকে ব্যথা হ'তে পা'রে। ঘাড়ের X'রে করলে রোগটি ধরা যায়। এই ব্যথার চরিত্র—**ঘাড়ের নড়াচড়ায় ব্যথা বাড়ে।**

পিত্তথলীর রোগে (Disease of Goll-bladder) **:** এই রোগে যে

ব্যথা হয় তা অ্যানজাইনার ব্যথার সঙ্গে বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে। আবার দুটো রোগ এক সঙ্গেও থাকতে পারে। পিত্তথলীর ব্যথা খাদ্য গ্রহণের পরই বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে এবং ব্যথা ডানদিকের কাঁধে ছড়িয়ে পড়ে এবং পিত্তথলীর রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। চর্বিজাতীয় খাদ্য রোগীকে খাওয়ালে ব্যথা বাড়ে এবং পিত্তথলীর জায়গায় হাত দিয়ে টিপলে রোগী ব্যথা অনুভব করে। সাধারণতঃ পিত্তথলি বেশ বড় হ'য়ে যায় এবং হাত দিয়ে অনুভব করা যায়। অ্যানজাইনার ব্যথা নাইট্রেট খাওয়ালে বা বিশ্রাম নিলে কমে যায়।

অনুসন্ধান (Investigations) :

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram = ECG) : অ্যানজাইনা পেকটোরিসের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ রোগীর বেলায় ই সি জি (ECG)তে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। যখন ইসিজিতে দোষ পাওয়া যায়—এস-টি সেগমেণ্ট এক মিলিমিটার বা বেশি নিচের দিকে দেবে থাকতে দেখা যায়।

রেডিওলজি (Radiology) : বুকের এক্সরে-তে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না যদি না বাম নিলয়ের বা বাম অলিন্দের স্ফীতি থাকে।

রক্ত পরীক্ষা (Blood Examination) : রোগীর রক্তে লিপিডের মাত্রা পরীক্ষা করলে লিপিডিমিয়া আছে কিনা জানা যায় এবং থাকলে করনারী ধমনী রোগের উপস্থিতির সম্ভাবনা প্রবল। ইউরিক এসিড, সুগার (চিনি), থাইরয়েড গ্রন্থীর রোগ, সিফিলিস (Syphilis) রোগ আছে কিনা তা রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে জেনে নিতে হবে। সিরাম মায়োকার্ডিয়েল উৎসেচকের মাত্রা (Serum myocardial enzyme level) দেখা দরকার, কিন্তু সাধারণতঃ এই উৎসেচকের (S. G. O. T., SLD) পরিমাণ স্বাভাবিক থাকে।

করনারী অ্যানজিও গ্রাফী (Coronary Angiography) : এটি একটি উচ্চমানের পদ্ধতিগত পরীক্ষা যার দ্বারা করনারী ধমনীতে রোগ থাকলে সঠিকভাবে জানিয়ে দেয় কিন্তু অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ ছাড়া এই পদ্ধতি অবলম্বন করা কঠিন এবং আমাদের দেশে সকলের পক্ষে এই সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করার এখনও বহু অসুবিধা রয়েছে। বিদেশে এবং আমাদের দেশেও এই অনুসন্ধান কার্য্য কোথাও কোথাও করা হচ্ছে। বিদেশে এই অনুসন্ধান জনিত মৃত্যু খুবই কম (0·1 to 0·5%)।

আরোগ্য সম্ভাবনা (Prognosis) :

যে সমস্ত রোগী অ্যানজাইনা পেকটোরিসে ভুগছেন ও যাদের করনারী ধমনীর বৈকল্য সামান্য, তারা বেশ অনেক দিন সুস্থ শরীরে বা প্রায় সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকেন। ব্যথা মাঝে মাঝে হ'তে পারে তবে আবার অনেক দিন অনুযোগ শূন্যও থাকতে পারে।

বয়স বেশি হ'লে, রক্তচাপাধিক্য, ডায়াবেটিস, বাম নিলয়ের স্ফীতি থাকলে আরোগ্য সম্ভাবনা কম।

করনারী অ্যানজিও গ্রাফীতে যদি দেখা যায় মাত্র একটি করনারী ধমনী আক্রান্ত হয়েছে সে ক্ষেত্রে আরোগ্য সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু যেখানে দুটি করনারী ধমনীই আক্রান্ত সেখানে অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নয়। দেখা গেছে অনেকেই গড়ে পাঁচ বৎসর বা আরও বেশি দিন বাঁচেন। হঠাৎ করে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন হয়ে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয়।

চিকিৎসা (Treatment) :

হৃৎপিণ্ডের ইসকিমিক রোগের চিকিৎসা দুটি দৃষ্টিকোন থেকে করতে হবে—একদিকে রোগীকে আশ্বস্ত করে বোঝাতে হবে, নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চললে আরোগ্য সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অন্যদিকে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রয়োগে বা সার্জারীর মাধ্যমে রোগীর কষ্টের লাঘব সাধনে ব্রতী হতে হবে। কষ্টের লাঘব হ'লে রোগীর মনের শক্তি বেড়ে যাবে, সাথে সাথে রোগীর জীবনের মূল্যবোধ বেড়ে যাবে এবং চিকিৎসায় সুফল পাওয়া সহজতর হবে। অ্যানজাইনা রোগে যারা ভুগছেন তাদের রোগ বৃদ্ধি যাতে না হয় সেই মত সংরক্ষণ মূলক ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধের ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে।

সংরক্ষণ মূলক ব্যবস্থা পত্র :

সংরক্ষণ মূলক ব্যবস্থা পত্রের উদ্দেশ্য রোগীর সঞ্চিত হৃৎপিণ্ড শক্তি (Cardiac Reserve) যতটা আছে তা সংরক্ষণ করা ও অন্যান্য শারীরিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা এবং এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি রোগীকে অনুসরণ করতে হবে :

(১) কর্মরত অবস্থায় যখনই ব্যথা উঠুক কাজ বন্ধ করে থেমে পড়ুন। চলার পথে ব্যথা উঠলে দাঁড়িয়ে পড়ুন। বিশ্রাম নিন এবং আপনার চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

(২) আপনার ওজন বেশি থাকলে খাদ্য সংযম করে ওজন স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়ে আসুন। বয়স অনুযায়ী একটি ওজনের চার্ট দেওয়া হ'ল। এই এই চার্ট দেখে নিজের ওজন ঠিক মাত্রায় রাখুন এবং আপনার চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করুণ।

(৩) রক্ত পরীক্ষা করিয়ে অস্বাভাবিক লিপিড আছে কিনা দেখিয়ে নিন। বেশি থাকলে আপনার চিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা-পত্র অনুসরণ করুন।

(৪) আপনার রক্ত চাপ নিয়মিত দেখিয়ে নিন; বেশি থাকলে চিকিৎসা করিয়ে রক্ত চাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

(৫) ধুমপান বন্ধ করা একান্ত দরকার কারণ ধুমপান অ্যানজাইনার ব্যথা ও কার্ডিয়াক ইনফার্কসন ঘটাতে পারে।

(৬) একেবারে বসে থাকার দরকার নাই যদি-না চলা-ফেরায় ব্যথা আরম্ভ হ'য়ে যায়। যতটা চললে বা যতটা জোরে চললে ব্যথা ওঠে তার থেকে কম চলুন এবং ধীরে ধীরে চলাফেরা করুন।

(৭) আপনি কি বেশি চিন্তা-ভাবনা করেন—অযথা চিন্তা-ভাবনা করবেন না। কর্মব্যস্ত উদ্বেগপূর্ণ জীবন-যাত্রায় পরিবর্তন আনতে হবে। যদি অল্পেই অস্থির হয়ে পড়েন—কোন ট্র্যানকুইলাইজার (**calmpose, valium, serepax**) ইত্যাদি ব্যবহার করুন। মাঝে মাঝে ঘুমের ঔষধও খেতে পারেন।

(৮) আপনার কি তরল পদার্থে (Alcohol) আশক্তি আছে? নিয়মিত পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করতে পারেন। অল্প মাত্রায় গ্রহণ করলে অ্যাল্‌কোহল স্নায়ুবিক প্রশান্তি আনে, ট্র্যানকুইলাইজারের কাজ করে এবং প্রান্তীয় রক্তবাহের প্রসারণ ক'রে রক্ত চলাচলের বৈকল্য দূরীকরণে সাহায্য করে! কিন্তু কখনই বেশি মাত্রায় গ্রহণ করবেন না —অ্যাল্‌কোহল বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে হৃৎপিণ্ড শক্তি কমে যাবে।

(৯) অন্য আনুসঙ্গিক রোগ থাকলে সারিয়ে নিন।

(১০) সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করুন যা সহজে হজম হয়ে যায়। গুরুপাক খাদ্য, অতি ভোজন, সর্বদা বর্জন করুণ।

(১১) চর্বি জাতীয় খাদ্য যতটা সম্ভব বর্জন করুণ।

(১২) লবণ স্বাভাবিক মাত্রা থেকে একটু কম খেতে হবে।

ঔষধের ব্যবস্থাপত্র :

সুচিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ ব্যবহার করবেন। কখনই নিজের চিকিৎসা নিজে করবেন না। নিম্নে ঔষধ যা ব্যবহার করা হয় তার গুণাগুণ ও ব্যবহার বিধি দেওয়া হ'ল। অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলবেন।

ক্ষণস্থায়ী কার্যকরী নাইট্রেটস (Short acting Nitrates) **:**

আগে নাইট্রেটস ঔষধগুলি প্রচুরভাবে ব্যবহৃত হ'তে থাকলেও এরা কেমন ক'রে কাজ করে, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধতার অবকাশ ছিল। অধুনা গবেষণায় আমরা জানতে পেরেছি যে নাইট্রেটস প্রান্তীয় ধমনী ও শিরা উভয় রক্তবাহকেই স্ফীত (Dilate) ক'রে ডায়াস্টোল ও সিস্টোলের ভলিউম কমিয়ে দেয় এবং মায়ো-কার্ডিয়ামের কাজ কমিয়ে, অক্সিজেন চাহিদা কমিয়ে, চাহিদা ও সরবরাহের সমতা এনে হৃৎপিণ্ডের ব্যথার অবসান ঘটায়। নাইট্রেটস করনারী ধমনীকেও স্ফীত করে এবং অক্সিজেন সরবরাহে সহায়তা করে। নিম্নে ক্ষণস্থায়ী কার্যকরী ঔষধের নাম ও প্রয়োগ বিধি দেওয়া হল :

গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট (Glyceryl Trinitrate) **:** এই ঔষধ একটি ক্ষণস্থায়ী ও কার্য্যকরী ওষধি। ব্যথার সময়ে তাৎক্ষণিক ফল লাভের জন্য এই ঔষধ অত্যন্ত কার্য্যকরী। ০·৫ মিলিগ্রাম মাত্রা থেকে ২·৫ মিলিগ্রাম পর্য্যন্ত জিবের তলায় সম্পূর্ণ গলে যাওয়া পর্য্যন্ত রাখতে হয়—গিলে খেলে কাজ ভাল হয় না। সাধারণতঃ ২ মিনিটের মধ্যে ফল পাওয়া যায় এবং ঐ ফল ২০—৩০ মিনিট পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এবং সাধারণ আক্রমণে ঐ মাত্রাতেই কাজ হয়ে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এই ঔষধে কাজ না হ'লে আরও শক্তিশালী ব্যথা কমানর ঔষধ ব্যবহার করা দরকার যা আমরা হৃৎপিণ্ডের ইনফার্কসন অবস্থা আলোচনার সময় ব্যক্ত করব।

দীর্ঘস্থায়ী কার্যকরী নাইট্রেটস (Long Acting Nitrates) **:**

এই ঔষধগুলি নাইট্রেটস-এর কমপাউণ্ড ওষধি। আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট (Isosorbsde Dinitrate) ও পেণ্টাএরিথি্টল টেট্রানাইট্রেট (Pentaerythritol tetranitrate)-এই ঔষধ দুইটি বহুল প্রচলিত। এদের কাজ অনেকক্ষণ থাকে। আইসোসরবাইড ডাইনাইট্রেট ১০—৩০ মিলিগ্রাম মাত্রায় প্রতিদিন ৩—৪ বার ব্যবহার করতে হয়। পেণ্টাএরিথি্টল টেট্রানাইট্রেট ৩০—৮০

মিলিগ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ ব্যবহার করতে হবে। এই ঔষধ ব্যবহারে অ্যানজাইনার ব্যথা দমিত থাকে।

বেটা-এড্রিনোরিসেপটর ব্লকিং ঔষধ :

এই পর্য্যায়ে ঔষধগুলি খুবই কার্য্যকরী এবং বহুল প্রচলিত। সাধারণতঃ বেটা-ব্লকারদের দুই প্রধান ভাগে ভাগ করা হয় যথা :

(১) **নন-সিলেকটিভ বেটা ব্লকারস** (Non-selective Beta blokers)

(২) **কার্ডিওসিলেকটিভ বেটা ব্লকারস** (**Cordioselective Beta blockers**)।

(১) **নন-সিলেকটিভ বেটা ব্লকারস :** আমরা জানি রক্তে যে ক্যাটিকোলামাইনস (**Catecholamines—Adrenalin, Noradrenalin**) রয়েছে তারা শরীরের নানা টিস্যুতে যে সিমপ্যাথেটিকের বেটা-রিসেপটর রয়েছে তাদের উপর ক্রিয়া ক'রে তাদের উত্তেজিত করে। কিন্তু এই বেটা-ব্লকারস্‌রা সিমপ্যাথেটিকের রিসেপটরগুলি ব্লক করে দেয় যার জন্য রক্তের ক্যাটিকোলামাইনস আর কাজ করতে পারে না। এই নন-সিলেকটিভ বেটা ব্লকারস্‌রা হৃৎপিণ্ডের, ব্রনকিয়েল অরেখিত পেশী ও রক্তবাহের অরেখিত পেশীর বেটা-রিসেপটারদের ব্লক করে দেয় এবং তারা গ্লাইকোলাইসিস ও লাইপোলাই-সিসের জন্য যে সমস্ত বেটা-রিসেপটার আছে তাদের উপরও ক্রিয়া করে থাকে।

হৃৎপিণ্ডে ও ফুসফুসে সিমপ্যাথেটিকের রিসেপটারগুলি ব্লক হওয়ার দরুণ ভেগাসের কার্য্যকারিতা বেড়ে যায় যার ফলে হৃৎপিণ্ডের গতিমাত্রা কমে যায়, হৃৎপিণ্ড বিশ্রামের সময় বেশি পায় এবং কাজের চাপও কমে যায়, ফলে অ্যানজাইনার ব্যথা কম হয়ে যায়। কিন্তু ফুসফুসে ভেগাসের ক্রিয়া বাড়ার দরুণ ব্রনকিয়েল পেশী সংকোচিত হয় যার ফলে যাদের হাঁপানী রোগ আছে তাদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

রক্তবাহের অরেখিত পেশীর বেটা-রিসেপটারগুলি ব্লক হওয়ার দরুণ ক্ষুদ্র রক্তবাহগুলি স্ফীত হয়ে যায় যার ফলে প্রান্তীয় রক্তবাহে বেশি পরিমান রক্ত আটকে থাকে এবং হৃৎপিণ্ডে কম রক্ত এসে জমা হয় ফলে কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় এবং হৃৎপিণ্ডের উপর চাপ কম পড়ে। তবে কখনও কখনও অনিয়মিত ব্যবহারে এই কার্ডিয়াক আউটপুট অতিরিক্ত কমে যেতে পারে যার ফলে হার্ট ফেলিওর-এর মত অঘটনও ঘটতে পারে।

প্রোপ্রাণোলোল (Propranolol), **অ্যালপ্রিনোলোল** (Alprenolol), **অক্সপ্রিনোলোল** (Oxprenolol) প্রভৃতি ঔষধগুলি নন-সিলেকটিভ বেটা ব্লকারস্।

কার্ডিওসিলেকটিভ বেটা ব্লকারস্ (Cardio selective Beta blockers) :

প্র্যাকটোলোল (Practolol), এসিবুটালোল (Acebutalol), সোটালোল (Sotalol) প্রভৃতি ঔষধগুলি কার্ডিও সিলেকটিভ বেটা ব্লকারস্। এই ঔষধগুলি কেবল মাত্র হৃৎপিণ্ডের ক্রোনোট্রপিক ও আইনোট্রপিক রিসেপটারগুলিকে ব্লক করে যার ফলে ব্রনকিয়েল অ্যাসথমা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম এবং হার্ট ফেলিওর হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম।

সম্প্রতি প্র্যাকটোলোল (Proctolol)-এর ব্যবহার আর করা হচ্ছে না কারণ ঔষধটি প্রতিক্রিয়াশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ক্যালসিয়াম অ্যানটাগনিষ্ট (Calcium Antogonists) :

সম্প্রতি **নিফেডেপিন** (দেপিন—Depin) নামে নূতন ধরনের ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার এক রকমের ঔষধ হৃৎপিণ্ড-রক্তবাহ রোগে কার্যকরী প্রতিকাররূপে আমাদের ঔষধের ভাঁড়ারে এসে জমা হয়েছে। আসার সাথে সাথে হৃৎপিণ্ডের ইসকিমিয়া রোগে, রক্তচাপাধিক্যে ও প্রান্তীয় ধমনীর রোগে উৎসাহের সহিত ব্যবহৃত হয়ে চলেছে। এই ঔষধটির সম্বন্ধে রক্তচাপাধিক্যের চিকিৎসা যেখানে পরে আলোচনা করা হয়েছে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সার্জিকল চিকিৎসা (Surgical Treatment) :

আমরা জানি দক্ষিণ ও বাম করনারী ধমনীর ভিতরের নালী অ্যাথিরোমেটাস রোগে আক্রান্ত হ'য়ে জায়গায় জায়গায় সংকীর্ণ হ'য়ে যায়। করনারী অ্যানজিওগ্রামের মাধ্যমে কোথায় ধমনী নালী সংকীর্ণ হয়েছে তা চিহ্নিত করে বুঝে নিতে হবে। এই অপারেশনে স্যাফেনাস শিরাকে গ্রাফটিং করে নতুন করে রক্ত চলাচলের পথ সৃষ্টি করা হয় এবং এই অপারেশনকে করনারী বাইপাশ অপারেশন বলা হয়।

করনারী ধমনীবাই পাশ অপারেশন : এই অপারেশনে স্যাফেনাস শিরার টুকরো নিয়ে একদিকে মহাধমনীর সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং ঐ টুকরোর অন্য প্রান্তটি যেখানে করনারী ধমনী ব্লকট বা সংকীর্ণ হয়েছে তার নিচের অংশটির

সঙ্গে, যে অংশটা ভাল আছে, জুড়ে দেওয়া হয়। সংকীর্ণ অংশকে বাইপাশ করে অপারেশনটি করা হয় তাই এই অপারেশনকে **করনারী বাই পাশ অপারেশন** বলা হয়।

এই অপারেশনের মাধ্যমে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি ক্ষেত্রে অ্যানজাইনা দূরীভূত হয়[১] এবং শতকরা ৩০—৪০ ভাগ ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি হয়। বেশির ভাগ গ্রাফট পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ঠিকই থাকে কিন্তু এরপর রোগটি আবার সূচনা হ'য়ে যায় এবং খারাপের দিকেই চলে যায়। ভাল সেণ্টারে অপারেশনের মৃত্যু হার 2% এর কম। ঔষধের দ্বারা উপশম না হ'লে এবং বাম নিলয়ের কার্য্যকারিতা ঠিক থাকলে এই অপারেশন গ্রহণ করা উচিৎ।

(মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন)
(Myocardial Infarction)

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন একই রোগের অগ্রগতির পরিণতি অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ইসকিমিয়া যা গোড়ায় অ্যানজাইনা পেকটোরিস রূপে আবির্ভূত হয় সেই ইসকিমিয়াই যখন করনারী ধমনীর কোন অংশে অ্যাথিরোমেটাস রোগ বর্দ্ধিত হ'য়ে রক্ত স্রোতধারাকে বন্ধ করে দেয় এবং কার্ডিয়াক পেশীকে আংশিক বিনষ্ট করে দেয় তখন সেই অবস্থাকে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন বলা হয়। অবশ্য এই ইনফার্কসন জমে যাওয়া রক্তের টুকরো, জমাট অনুচক্রিকা বা অন্যরূপ কোন ক্ষুদ্র কনিকা করনারী ধমনী অভ্যন্তরে আবদ্ধ হ'য়ে গিয়েও কার্ডিয়াক ইনফার্কসন ঘটাতে পারে।

রোগীর অনুযোগ বা কমপ্লেন :

রোগীর প্রধান অনুযোগ অ্যানজাইনার মতই বুকের মাঝখানে ব্যথা, কিন্তু ব্যথা আরও তীব্র। গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট ব্যবহারেও কমে না, বিশ্রামেও কমে না। ব্যথা বুকের বাপাশে, ডানপাশে বা উভয় পাশেই হতে পারে। ব্যথা বাম বাহুর ভিতরের দিকে, ডান বাহুর ভিতরের, নিচের চোয়ালের দিকে, নিচের চোয়ালের মাড়িতে বা গলার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কখনও কখনও রোগী বলে

---

1. Desmond G. Julian, Fourth edition (ELBS) 1983, Baillere Tindall, London.

বুকের ভিতরে কি যেন চেপে ধরেছে, কি যেন আটকে গেছে, আবার কেউ কেউ বলে বুকের ভিতরে যেন ছুরি দিয়ে কাটছে। দু-একজন বুকের মাঝখান বারবার হাত দিয়ে বলতে থাকে—জ্বলে যাচ্ছে, পুড়ে যাচ্ছে। ব্যথা আধ ঘণ্টার বেশি বা কখনও কখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে থাকে। কেউ কেউ ব্যথার কথা বেশি না বলে—মাথা ঘুরছে, মাথা ঘুরছে বলতে বলতে অজ্ঞানের মত হ'য়ে যায়। শ্বাস কষ্টের কথা অনেকেই বলে। কদাচিৎ ব্যথা না-হয়েও কার্ডিয়াক ইনফার্কসন হ'তে পারে—এইরূপ উক্তি পুস্তকে দেখা যায়। চোখের সামনে মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কসনে আক্রান্ত হয়েছে এমন কতকগুলি রোগী দেখার সুযোগ হয়েছে কিন্তু ব্যথাশূন্য কোন রোগী দেখার কোন সুযোগ কোন দিনই হয়নি।

চিকিৎসায় বা আপনা-আপনি ব্যথা নিয়ন্ত্রণে আসার পর রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যেতে পারে বা নানারূপ উপসর্গ আসতে পারে (পরে আলোচনা করা হয়েছে) বা ব্যথা নিবৃত্তি না হ'য়ে বা হ'য়েও হার্ট ফেলিওর হ'য়ে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

আক্রান্ত রোগীকে পরীক্ষা করলে যা দেখা যায় :

প্রথমেই রোগীকে দেখে মনে হয়—রোগী অত্যন্ত বেদনা ক্লিষ্ট, হাত-পা ঠাণ্ডা, শরীরটি ঘামে ভর্ত্তি, অত্যন্ত অস্থির, কোন অবস্থাতেই যেন আরাম পাচ্ছে না এবং আতঙ্কগ্রস্থ। একটু পরে অর্থাৎ এক ঘণ্টা, দু-ঘণ্টা বা কয়েক ঘণ্টা পরে ব্যথা কমে যাওয়া অবস্থায় রোগীকে দেখলে মনে হয়—রোগী চিন্তান্বিত, অস্থিরতা নাই, মুখটা কিছু ফ্যাকাশে তাছাড়া দেখে অন্য কিছু অস্বাভাবিকতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় না। নিম্নে অন্যান্য পরীক্ষায় যা যা দেখা যায় তা একটি একটি ক'রে বিবৃত করছি :

পাল্‌স :

পাল্‌স চিকিৎসককে কখনও কখনও বিভ্রান্ত করতে পারে কারণ অনেক সময় পাল্‌স স্বাভাবিক গতিময় থাকতে পারে এবং ভলিউমও স্বাভাবিক দেখা যেতে পারে। কিন্তু আক্রমণ তীব্র হ'লে, পাল্‌স দ্রুত লয়ে চলে, ক্ষীণ, অনিয়মিত আবার কখনও মিনিটে গুণতিতে সংখ্যা খুব কম (**Bradycardia**) পাওয়া যায়।

জুগুলার ভেনাস পাল্‌স :

জুগুলার ভেনাস পাল্‌স লিপিবদ্ধ করলে দেখা যাবে স্বাভাবিকতা বজায় রয়েছে। আবার কখনও কখনও প্রথম উর্দ্ধমুখী রেখাটি একটু দীর্ঘ দেখায়।

রক্ত চাপ (Blood Pressure) :

রক্তচাপ মাপলে হৃৎপিণ্ড বৈকল্যের হদিস দিতে পারে। রক্তচাপ বার বার মাপতে হবে। শুরুতে রক্তচাপ একেবারে কমে যায়। কখনও কখনও রক্তচাপ এত কমে যায় যে মাপাই যায় না। কার্ডিওজেনিক শকের জন্য হাইপোটেনসন এমন পর্য্যায় আসে যে তার কোন উন্নতি ঘটতে দেখা যায় না। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে ভালর দিকে যেতে পারে। রোগীর স্বাভাবিক রক্তচাপ যা থাকে তার থেকে বেশ কম হয়ে যায় এবং ক্রমশঃ ঘণ্টায় ঘণ্টায় ও দিন দিন কমতে থাকে এবং প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই রকম চল্‌তে চল্‌তে সপ্তাহ শেষে খুবই নিচের দিকে নেমে যায়। এক সপ্তাহ পর ক্রমশঃ আবার রক্তচাপ বাড়তে থাকে এবং দুই-তিন সপ্তাহ ধরে বাড়তে বাড়তে প্রায় স্বাভাবিক স্তরের কাছাকাছি এসে যায়।

হার্ট ও হার্ট সাউণ্ডস :

প্রথম ও দ্বিতীয় হার্ট সাউণ্ড, উভয় সাউণ্ডেরই ধ্বনি ক্ষীণভাবে শোনা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাট্রিয়েল সাউণ্ড অর্থাৎ চতুর্থ হার্ট সাউণ্ড পাওয়া যায়। হার্ট ফেলিওরের অবস্থা এসে গেলে বা কার্ডিওজেনিক শক থাকলে তৃতীয় হার্ট সাউণ্ড পাওয়া যায়। বাম নিলয়ের স্ফীতি বা প্যাপিলারি পেশীর (Papillary muscle) বৈকল্যের জন্য মাইট্রাল রিগারজিটেসন হয় যার জন্য কার্ডিয়াক এপেক্সের জায়গায় সিস্টোলিক, ডায়াস্টোলিক উভয় শব্দই শুনতে পাওয়া যায়। কখনও কখনও স্টারনামের বাম পাশে খুব জোরে জোরে সিষ্টোলিক মারমার শুনতে পাওয়া যায়। উভয় নিলয়ের পার্টিসান দেওয়াল ছিঁড়ে গেলে ঐ উচ্চ শব্দের সিষ্টোলিক মারমার শুনতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে অনেক সময় পেরিকার্ডিয়াম-এর সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ঘর্ষণ শব্দ (Pericardial Rub) শুনতে পাওয়া যায়। হাত দিয়ে হার্টের এপেক্স অনুভব করা কঠিন হয়ে যায় এবং সাধারণতঃ বামদিকে স্থানচ্যুত থাকতে দেখা যায়।

ফুসফুস :

ফুসফুসের বেসে (Base) ক্রেপিটেসনের শব্দ (Crepitation) বেশ কিছু

ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। এই শব্দ যখন দুই দিকেই বিস্তৃত জায়গা জুড়ে পাওয়া যায় তখন বুঝতে হবে পালমনারী ইডিমা (**Pulmonary** oedema) স্বরু হয়ে গেছে।

অন্যান্য প্রতিক্রিয়া :

ইনফার্কসন শুরু হওয়ার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর অল্প জ্বর হয় তবে এই জ্বর ১০১°**F**-এর বেশি হয় না এবং সাধারণতঃ এক সপ্তাহের মধ্যে সেরে যায়।

রক্ত পরীক্ষায় রক্তের শ্বেত কণিকা অল্প মাত্রায় বাড়ে এবং ই. এস. আরও বাড়ে। ক্যাটিকোলামাইনস্, কোলেসটেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড, অধিক পরিমানে রক্তে থাকতে পারে।

সিরাম উৎসেচক (Serum Enzymes) **:**

কতকগুলি উৎসেচক যথা সিরাম গ্লুটামিক অকজ্যালো ট্রানসঅ্যামাইনেজ (**S. G. O. T.**), সিরাম ক্রিয়েটিনিন ফসফোকাইনেজ (**Serum creatinine** phosphokinase = **SCK**) ও সিরাম ল্যাকটেট ডিহাইড্রোজিনেজ (**Serum** Lactate Dehydrogenase = **SLDH**) হৃৎপিণ্ডে প্রচুর পরিমানে থাকে। মায়োকার্ডিয়ামের নিক্রোসিস হওয়ার পর এই উৎসেচক গুলি রক্তে ছড়িয়ে পরে। অবশ্য এই উৎসেচকগুলি শরীরের আরও অন্য টিস্যুতেও থাকে। এ-কারণ ঐ তিনটি উৎসেচকের পরিমাণ রক্তের সিরামে কতটা আছে পরীক্ষা করলে যদি প্রত্যেকটিরই পরিমাণ বেশি দেখা যায় সে ক্ষেত্রে ইনফার্কসন হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে, অবশ্য অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার বিবেচনা করতে হবে।

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electrocardiogram=ECG) **:**

তাৎক্ষনিক রোগ নির্ণয়ের জন্য ই সি জির ভূমিকা অপরিহার্য্য। প্রথম কয়েক ঘণ্টা ই সি জি ট্রেসিং স্বাভাবিক হয়ে থাকে বা থাকতে পারে সেই জন্য নিরবিচ্ছিন্নভাবে ইসিজি ট্রেসিং নিয়ে যেতে হবে (**Continuous monitering**), বিশেষ ক'রে যেখানে চিকিৎসক মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন হয়েছে সন্দেহ করছেন। মায়োকার্ডিয়ামের ইনফার্কসন হওয়ার পর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডে যে পরিবর্তন আসে সেই পরিবর্তনের স্বরূপ ইসিজি যন্ত্রে ধরা সম্ভব, তাই নিরবিছিন্ন ই সি জি ট্রেসিং একান্ত প্রয়োজন এবং মায়োকার্ডিয়ামের ইনফার্কসন-রোগ নির্ণয়ে ই সি জি একটি বলিষ্ট প্রক্রয়া।

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায়, কলকাতা-হাওড়ার মত বড় সহরেও দু-চারটি বড় হাসপাতাল ছাড়া এই নিরবিছিন্ন ইসিজি পরীক্ষার সুযোগ আজও সহজ লভ্য হয় নাই।

মায়োকার্ডিয়াম ইনফার্কসনে ইসিজি কি বলে ঃ

ই-সি-জি মায়োকার্ডিয়াম-এ ইনফার্কসন ঘটেছে এই কথাই যে শুধু জানায় তা নয় ই-সি-জি থেকে আমরা জানতে পারি হৃৎপিণ্ডের কোন্ অংশ আক্রান্ত হয়েছে এবং জখমের পরিধি কতটা বিস্তৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এও আমাদের জানিয়ে দিতে পারেন আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা কতটা আশা করা যায়।

কিউ ওয়েভের অস্বাভাবিকতাই ইনফার্কসনকে চিহ্নিত ক'রে দেয়। বাম চেষ্ট লিডস-এ কিউ ওয়েভের গভীরতা যদি ২ মিলিসিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং সময়ের নিরিখে যদি ০·০৩ সেকণ্ডের মধ্যে যতটা চওড়া হওয়া দরকার ততটাই হয় তাহ'লে তাকে আমরা স্বাভাবিক কিউ ওয়েভ বলব। যদি কিউ ওয়েভ ০·০৪ সেকেণ্ডের বেশি সময় নিয়ে বেশি চওড়া দেখায় তা হ'লে ইনফার্কসন যে হয়েছে তা সঠিক বলা যেতে পারে।
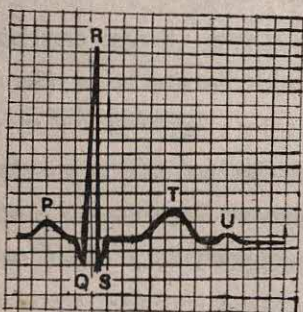
স্বাভাবিক ই, সি, জির রেখিত নক্সা

এস-টি সেগমেণ্ট যদি বেশি উপরের দিকে উঠে থাকে এবং **টি-সেগমেণ্ট যদি উল্টোমুখো** (Inverted) হয় তা হ'লেও অস্বাভাবিক কিউওয়েভের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে আরও নির্দিষ্ট ভাবে ইনফার্কসন হয়েছে এ-কথা বলা যাবে। তাহলে অস্বাভাবিক কিউ ওয়েভ, এস-টি সেগমেণ্টের উর্দ্ধে অবস্থিতি এবং টি-ওয়েভের উল্টো মুখো হয়ে থাকা—এই এয়ী ই-সি-জি চিত্র মায়োকার্ডিয়ামের যে ইনফার্কসন হয়েছে এ-কথা আমাদের জানিয়ে দেবে।

কার্ডিয়াক ইনফার্কসনের উপসর্গ

ইনফার্কসন হওয়ার পর বহু গুরুতর উপসর্গ আসতে পারে। কতকগুলি উপসর্গ আক্রমণের সাথে সাথে বা অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ঘটতে দেখা যায়

আবার কতকগুলি উপসর্গ রোগী সুস্থ হয়ে যাওয়ার বেশ কিছু দিন বাদে ঘটতে দেখা যায়। তাই উপসর্গগুলি দু-ভাগে ভাগ ক'রে যথা **প্রাথমিক উপসর্গ** (Early Complications) ও **বিলম্বে আগত উপসর্গ** (Delayed Complications) এই দুই শিরনামায় আলোচনা করা হয়েছে :

প্রাথমিক উপসর্গ (Early Complications) :

অ্যারিথমিয়াজ (Arrhythmias) : ইনফার্কসন আক্রমণের পর হৃৎপিণ্ড চন্দবদ্ধ স্পন্দদে অক্ষম হয়ে পড়ে। শতকরা ৯৫ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে অনিয়মিত স্পন্দণ গতির বিকাশ হ'তে দেখা যায়। সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, (দ্রুত হৃৎপিণ্ড গতি) সাইনাস ব্র্যাডিকার্ডিয়া (মন্থর হৃৎপিণ্ড গতি), অরিকুলার ফিব্রিলেশন (অলিন্দ পেশী কোষের অনিয়মিত স্পন্দন), ভেনট্রিকুলার একটপিক বিট (নিলয়ের নিয়মিত ইমপাল্‌সের পরিবর্তে অনিয়মিত ইমপাল্‌সে সাড়া দিয়ে স্পন্দন), হার্ট ব্লক (ইমপালসের গতি পথে বাধা জনিত মন্থর স্পন্দন গতি), ভেনট্রিকুলার ফিব্রিলেশন (নিলয় পেশী কোষের অনিয়মিত স্পন্দন) প্রভৃতিকে উপসর্গ হিসাবে বলা হয়।

কার্ডিওজেনিক শক (Cardiogenic Shock) : ইনফার্কসন হওয়ার পর হৃৎপিণ্ড আঘাত জনিত বৈকল্যের শীকার হ'য়ে পড়ে যার জন্য, রক্ত সরবরাহে (হৃৎপিণ্ড শরীরে ও অন্য টিস্যুর) বিঘ্ন ঘটে এবং সারা শরীরের ক্রিয়াকান্ড যেন হঠাৎ ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় সারা শরীর ঘেমে নেয়ে যায়, হা-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়, রক্তচাপ একেবারে পড়ে যায়। ঠোঁটের কোল, হাতের ও পায়ের আঙ্গুলগুলি নীলাভ (অক্সিজেনের অভাবের জন্য) দেখায়। রোগীর শরীরে অক্সিজেনের অভাবের জন্য এসিডোসিসের (Acidosis) লক্ষণ ক্রমশঃ প্রতীয়মান হয়, প্রস্রাব প্রায় বন্ধ হ'য়ে যায় এবং রোগী ক্রমশঃ সম্পূর্ণ নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। রক্তচাপ এতই পড়ে যায় যে যন্ত্র দ্বারা আর মাপা যায় না। অ্যারিথমিয়া ও হার্টফেলিওর এক সঙ্গেই থাকে এবং এই অবস্থা চলতে থাকলে শতকরা প্রায় আশি থেকে নব্বুই ভাগ রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিকিৎসায় কোন ফল হয় না তবে কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষ ক'রে অ্যারিথমিয়া যদি চিকিৎসায় সেরে যায়, অনুকুল পরিস্থিতির সৃষ্টি হ'য়ে রোগী বেঁচেও যেতে পারে। উপরি উক্ত ঘটনা প্রবাহ হৃৎপিণ্ডের বিস্তৃত অংশ (৪০%) নিক্রোসিস হওয়ার জন্য হ'য়ে থাকে এবং ঐ ঘটনা প্রবাহকে **কার্ডিওজেনিক শক** বলা হয়।

অনুকূল অবস্থায় অর্থাৎ সেখানে ইনফার্কসনের পরিধি অল্প সে-সব ক্ষেত্রে শক হয় কিন্তু অল্পক্ষণ স্থায়ী হবার পর রোগী শকের ধাক্কা সামলে নিয়ে ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে অগ্রসর হয়। এই অবস্থাকে কার্ডিওজেনিক শক আখ্যা দেওয়া হয় না। এটি শুধু ব্যথার জন্য সাময়িক শক যা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

বামনিলয়ের ফেলিওর (Left Vent.icular failure) **:** বাম নিলয়ের ফেলিওর ইনফার্কসনের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণতঃ হয় না। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পরে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নিলয়ের ফেলিওর হ'তে দেখা যায়। এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ—হৃৎপিণ্ড গতির বৃদ্ধি, ফুসফুস দ্বয়ের বেসে (**Bases of lungs**) বিস্তৃত জায়গায় ক্রেপিটেসনের আর্বিভাব, এবং হৃৎপিণ্ড স্টেথোসস্কোপ দ্বারা পরীক্ষা করলে তৃতীয় হার্ট সাউণ্ড (**Third Heart Sound**) শুনতে পাওয়া যায়। **X**-রে করলে পালমনারী ইডিমার লক্ষণ পাওয়া যায়। কার্ডিয়াক ক্যাথিটিরাইজেসন দ্বারা পালমনারী ওয়েজ প্রেসর (**Pulmonary wedge pressure**) মাপলে ২০ **mm Hg**-এর উর্দ্ধে থাকতে দেখা যায়।

দক্ষিণ নিলয় ফেলিওর (Right Ventricular failure) **:** দক্ষিণ নিলয়ের ইনফার্কসনের জন্য দক্ষিণ হার্ট ফেলিওর হয়ে থাকে এবং ইনফার্কসন সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের নিম্ন তলকে আক্রমণ করে। জুগালার শিরার চাপ বেশি থাকে। শকও কখনও কখনও হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে না হ'লেও বেশ কিছু দিন পরে রাইট হার্ট ফেলিওরের লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ যকৃত (**Liver**) বেড়ে যায়, পা ফুলে যায় এবং পেটে জলও জমে যেতে পারে (এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা হয়েছে)।

পালমনারী এমবলিজম (Pulmonary Embolism) **:** মায়োকর্ডিয়ামের ইনফার্কসন হওয়ার বেশ কিছু দিন বাদে যখন হাটাৎ ক'রে রোগীর রক্তচাপ কমে যায়, বুকে প্লুরিসির মত ব্যাথা বা কখনও কখনও কাসির সঙ্গে রক্ত ও রাইট হার্ট ফেলিওরের লক্ষণ দেখা যায় তখন পালমনারী এমবলিজমের কথা ভাবতে হবে। কারণ হিসাবে বলা হয় যে আগে পায়ের পেশীর শিরায় রক্ত জমার জন্য এবং পরে সেই জমা রক্তের টুকরো রক্ত চলাচলের সঙ্গে ঘুরে ফিরে ফুসফুসীয় শিরায় এসে আটকে যাওয়ার জন্য ঐ অবস্থার সৃষ্টি করে।

ফুসফুসীয় শিরা ছাড়া শরীরের অন্য যে-কোন জায়গায় ঐ রক্তের টুকরো আটকে সেই স্থানের এমবলিজম ঘটাতে পারে। বাম অলিন্দে বা নিলয়ে রক্ত

জমে থ্রমবাই (জমা রক্তের টুকরো)-এর সৃষ্টি করতে পারে। ঐ জমা রক্তের টুকরো মগজের রক্তরাহে আটকে হেমিপ্লিজিয়া ঘটাতে পারে।

নার্ভ বিভব (Impulse) সংবহনে বিশৃঙ্খলা : হৃৎপিণ্ডের নিম্ন তলের ইনফার্কসনে নার্ভ বিভব সংবহনে বাধার সৃষ্টি হ'তে পারে কারণ সাইনাস নোড ও এ-ভি নোড বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দক্ষিণ করনারী ধমনী দ্বারা সেবিত হয়। সম্পূর্ণ হার্ট ব্লক হ'য়ে স্টোকস অ্যাডামস সিনড্রোম (Stoke's Adams Syndrome) হ'তে পারে এবং পেশ মেকার লাগাতে হ'তে পারে।

প্যাপিলারী মাসল ছিঁড়ে যেতে পারে (Rupture of papillary muscle) : প্যাপিলারী মাসল ছিঁড়ে গেলে বাম নিলয়ের ফেলিওর হ'য়ে করেক ঘণ্টার বা কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে। পেশীটি যদি আংশিক ছিঁড়ে যায় সে ক্ষেত্রে রোগীকে পরীক্ষা করলে মাইট্রাল রিগারজিটেসনের লক্ষণ পাওয়া যায় এবং সঙ্গে বাম হার্ট ফেলিওর-এর অবস্থা প্রায়ই থাকে।

হৃৎপিণ্ড ফেটে যেতে পারে (Rupture of Heart) : শতকরা ১০ জন আক্রান্ত রোগীর বাম নিলয় ফেটে মৃত্যু হ'তে দেখা গেছে। সাধারণতঃ বয়স্ক রোগীরা যারা অনেক দিন থেকে রক্তচাপাধিক্যে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটতে বেশি দেখা যায়। মৃত্যু সাথে সাথেই হ'তে পারে।

ইণ্টারভেনট্রি কুলার সেপটাম ফেটে যেতে পারে (Rurture of interventricular Septum) : মায়োকার্ডিরাম ইনফার্কসনের শুরুতে ইণ্টারভেনট্রিকুলার সেপটাম ছিঁড়ে যেতে পারে। শত করা ০·৫ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই উপসর্গ ঘটতে দেখা যায়। রোগী নিয়ন্ত্রনে রয়েছে এমন সময় হঠাৎ ক'রে এই উপসর্গ এসে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাম নিলয় ফেলিওয়ের লক্ষণ এসে হাজির হয়। স্টারনামের বাম প্রান্তে হাত দিয়ে অনুভব করলে থ্রিল অনুভব করা যায় এবং স্টেথোসস্কোপ দিয়ে শুনলে সিস্টোলিক মারমার ও থ্রিল উভয় দোষই শুনতে পাওয়া যায়। অল্প দিনের মধ্যে রোগী মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

পেরিকার্ডাইটিস (Pericarditis) : ইনফার্কসন আক্রমনের ২৪ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে[1] শতকরা ৭ থেকে ১৫ জনের ক্ষেত্রে পেরিকার্ডাইটিস হ'তে

---

1. Sir Ronald Brodley Scott, Price's Text Book of the practice of Medicine, Low priced Edition, English Language Book Society and Oxford University press, 12th Edition Reprint, 1982.

পারে। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের সামনের তলের ইনফার্কসন হ'লে এই অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে। এই অবস্থা সাময়িক এবং আপনাআপনি ভাল হ'য়ে যায়।

বিলম্বে আগত উপসর্গ (Delayed Complications) :

একবার ইনফার্কসন হওয়ার পর রোগী ভালর দিকে যেতে যেতে, নিয়মিত স্পন্দন, শকের অবসান, ব্যথার অবসান, কিছু সুস্থতার অনুভূতি চলছে এমন সময় কয়েক দিনের মধ্যে বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হঠাৎ আবার ইনফার্কসনের লক্ষণ দেখা দিতে পারে। অ্যারিথমিয়া অবার ফিরে আসে এবং সব কিছু উল্টো-পাল্টা হয়ে গিয়ে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আরও পরের উপসর্গ ভেনট্রিকুলার অ্যানিউরিজম (Ventricular Aneurism), সোলডার-হ্যাণ্ড সিনড্রোম (Shoulder-Hand Syndrome) এবং পোষ্ট মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কসন (Post Myocardial Infarction Syndrome) সিনড্রোম।

ভেনটিকুলার অ্যানিউরিজম (ventricular Aneurism) : শতকরা ১০-২০ ভাগ রোগী বেশ অনেকটা ভাল হ'য়ে যাওয়ার পর যে জায়গায় ইনফার্কসন হয়েছিল সেই জায়গার পেশী কোষ নষ্ট হ'য়ে গিয়ে সংযোজক কলা দিয়ে ভর্ত্তি হ'য়ে যায় এবং হৃৎপিণ্ডের আক্রান্ত জায়গাটি সংকোচনের সাথে সাথে ফুলে ওঠে। সংকোচক টিস্যু (পেশী কোষ) নষ্ট হওয়ার দরুণ অবশিষ্ট সুস্থ পেশীকলার উপর কাজের চাপ বেশি পড়ার দরুণ হার্ট ফেলিওর শুরু হ'য়ে যেতে পারে বা নিলয়ে রক্ত জমে থ্রমবাস তৈয়ার হ'তে পারে যার সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া অনেক কিছু অঘটন ঘটাতে পারে যা আমরা আগেই জেনেছি।

বুকের এক্সরে ফিলমে বা স্ক্রীনিং-এ অ্যানিউরিজমে ধরা পড়ে। একোকার্ডিওগ্রাফীর মাধ্যমে বা বাম ভেনট্রিকিউলোগ্রাফীতে জিনিসটি স্পষ্ট দেখা যাবে। ইসিজি-তে চেষ্ট লিড্সে এস-টি সেগমেণ্ট-এর উর্দ্ধে অবস্থিতি এবং কিউ-ওয়েভের বরাবর উপস্থিতি কার্ডিয়াক অ্যানিউরিজম-এর প্রধান লক্ষণ।

শিরার থ্রমবোসিস (Venous-Thromboembolism) : ইনফার্কসন হওয়ার এক থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে শিরায় রক্ত জমে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রতিরোধ হিসাবে অ্যান্টিকোয়াগুলেসন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা যায়।

সোলডার-হ্যাণ্ড সিনড্রোম (Shoulder-Hand Syndrome) : কোন কোন বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে ইনফার্কসন হওয়ার কয়েক সপ্তাহ থেকে এক মাসের মধ্যে এই উপসর্গ হ'তে পারে। যে সমস্ত রোগীকে বহুদিন বিছানায় আটকে

রাখা হয় এবং নড়াচড়া বন্ধ রাখা হয় তাদের ক্ষেত্রেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। বাহু নাড়াছাড়া করতে গেলেই কাঁধের সন্ধিতে ব্যথা, বাহু-উপবাহুর সন্ধিতে, কব্জির সন্ধিতে ব্যথা ও অঙ্গুলে রস জমা ও হাতের তালুতে ছোট ছোট গোটা উঠতে দেখা যায়। এটা মনে করা হয় বহুদিন হাত ব্যবহার না করার দরুণই এই অবস্থার উদ্ভব হ'য়ে থাকে। আস্তে আস্তে হাতের সন্ধিগুলি নাড়াচাড়া করলে সেরে যায়।

পোষ্ট মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন সিনড্রোম (Post-Myocardial Infarction Syndrome) : এই অবস্থার প্রধান লক্ষ্যণ হল—অল্প অল্প জ্বর, বুকে টাটানি ব্যথা এবং পরীক্ষা করলে—পেরিকার্ডিয়াল ঘর্ষণ শব্দ, প্লুরার ঘষণ শব্দ শোনা যায় এবং রক্তে শ্বেত কণিকার বৃদ্ধি দেখা যায়। সাধারণতঃ ইনফার্কসন হওয়ার কয়েক সপ্তাহ বা কয়েক মাস পরে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেন এই অবস্থা **ইমিউন প্রতিক্রিয়া** যা মৃত হৃৎপিণ্ড পেশী কোষের বিরুদ্ধে জীবন্ত টিসুর যুদ্ধ বা প্রতিক্রিয়া।

রোগ নির্ণয় :

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসনে বিশেষ ধরণের বুকে ব্যথা, সঙ্গে প্রচুর ঘাম, হাত-পা ঠাণ্ডা, শ্রমের সঙ্গে সম্বন্ধ বিহীন ব্যথা, গ্লিসারিল ট্রাইনাইট্রেট ব্যবহারে ব্যথার উপশম না-হওয়া এবং ব্যথা ১৫ মিনিটের বেশিক্ষণ স্থায়ী হওয়া—এই অনুযোগগুলি মায়োকার্ডিয়ামের ইনফার্কসনকে **অ্যানজাইনা পেকটোরিসের ব্যথা** থেকে স্পষ্টই আলাদা করে দেয়। ছন্দহীন হৃদপিণ্ড স্পন্দন, নিম্নমুখী রক্তচাপ, তৃতীয় হার্ট সাউণ্ডের উপস্থিতি, সামান্য জ্বর, রক্তে শ্বেত কণিকার আধিক্য এবং ই-এস-আর বৃদ্ধি সব মিলিয়ে, কার্ডিয়াক ইনফার্কসন হয়েছে আরও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়। ই-সি-জির বিশেষ ধরণের পরিবর্তন এবং রক্তে বিশেষ সিরাম উৎসেচকের যথা সিরাম ক্রিয়েটিনিন ফসফোকাইনেজ (SCK), সিরাম গ্লুটামিক অক্সালো এসিডিক ট্রানসঅ্যামাইনেজ (S. G. OT) ও সিরাম ল্যাকটেট ডি হাইড্রোজিনেজ (SLDH) উপযুক্ত সময়ে বৃদ্ধি রোগ নির্ণয়ে কোন সন্দেহের কোন অবকাশ দেয় না।

অস্থায়ী অ্যানজাইনা কখনও কখনও ধাঁধায় ফেলে দেয় কারণ এই অবস্থায় ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে, ব্যথা শ্রমের সঙ্গে সম্বন্ধ নাও থাকতে পারে। কিন্তু এখানে ইসিজি ও সিরাম উৎসেচকের কোন পরিবর্তন হয় না। জ্বর থাকে

না, ই-এস-আর বৃদ্ধি হয় না এবং রক্তে শ্বেত কণিকার বৃদ্ধিও দেখতে পাওয়া যায় না।

ফুসফুসের এমবলিজম (Pulmonary Embolism) **:** এই রোগ বিশেষ করে অনেকটা জায়গা জুড়ে আক্রমণ করলে, মায়োকার্ডিয়ামের ইনফার্কসন থেকে তফাত করা খুবই কঠিন হ'য়ে যায়। কিন্তু ফুসফুসীয় এমবলিজমে, তুলনা মূলক ভাবে, কার্ডিয়াক ইনফার্কসন থেকে ব্যথা কম কিন্তু শ্বাস কষ্ট বেশি হয়। ফুসফুসীয় এমবলিজমের ক্ষেত্রে ইসিজি-তে কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। সিরাম উৎসেচক গুলির বৃদ্ধিও দেখা যায় না। এক্সরে-তে ফুসফুসীয় ইনফার্কসন ধরা যায়। ফুসফুসীয় অ্যানজিওগ্রাফী ও রেডিও-আইসোটোপ স্ক্যানিং, রোগ নির্ণয়ে দুটি উপযুক্ত হাতিয়ার।

মহাধমনীর ডিসেকটিং অ্যানিউরিজম : ডিসেকটিং অ্যানিউরিজম কখনও কখনও সন্দেহ জাগাতে পারে। এই রোগও মায়োকার্ডিয়ামের ইনকার্কসনের মত বুকের মাঝখানে গুরুতর ব্যথা সৃষ্টি করে যার জন্য এই দুটি রোগকে তফাত করা অনেক সময় খুবই কঠিন হ'য়ে পড়ে। ডিসেকটিং অ্যানিউরিজমের ক্ষেত্রে ব্যথার একটি বিশেষত্ব হল' এই ব্যথা শিরদাঁড়ার মাঝের দিকে ছুটে যায় এবং উপরের পেটের দিকেও ছুটে যায়। এখানে ইসিজি ত্রাণকর্তা। ইসিজি-তে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসনের কোন চিত্র দেখা যায় না।

নতুন পেরিকার্ডাইটিস (Acute Pericarditis) **:** এই রোগেও বুকে ব্যথা হয় কিন্তু এই রোগের উৎপত্তির আগে রোগী সাধারণতঃ শর্দি-কাশিতে ও জ্বরে ভুগতে থাকে তারপর হঠাৎ ক'রে বুকে ব্যথা শুরু হ'য়ে যায়। কিন্তু ব্যথার চরিত্র ভিন্ন—জোরে নিশ্বাস নিলে ব্যথা বাড়ে, নড়াচড়া করলে ব্যথা বাড়ে, শুলে ব্যথা বাড়ে। এখানে মনে করতে হবে যে মায়োকার্ডিয়ামের ইনফার্কসনের বেলায় যে জ্বর হয় সেই জ্বর ইনফার্কসন হওয়ার প্রায় ১২—১৪ ঘণ্টা পরে হয়। আরও আমরা নিশ্চিত হ'তে পারি ইসিজি থেকে। পেরিকার্ডাইটিসের বেলায় ইসিজি-তে কোন অস্বাভাবিক কিউ-ওয়েভ পাওয়া যায় না যদিও এস-টি সেগমেণ্ট উপরের দিকে উঠে থাকতে পারে ও টি-ওয়েভও উল্টোমুখো থাকতে পারে।

আরোগ্য সম্ভাবনা (Prognosis) **:**

যত রোগী মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসনে আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে এক-চতুর্থাংশ আক্রান্ত হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যায় সুতরাং চিকিৎসকের

ঐ রোগীগুলিকে দেখার কোন সুযোগই হয় না। যে রোগীগুলি বাঁচে এবং যাদের চিকিৎসকরা চিকিৎসা করার সুযোগ পান তাদের সম্বন্ধে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা কতটুকু এবং কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তা আমরা নিচে আলোচনা করছি :

বয়স ও আরোগ্য সম্ভাবনা : অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে বয়স বাড়ার সঙ্গে তাল রেখে মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন জনিত মৃত্যু বেড়ে চলে। ৫০ বৎসর বয়সের রোগীদের ক্ষেত্রে মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ১০ থেকে ২০ জনের মধ্যে ঘটে থাকে ; পঞ্চাসের উর্দ্ধে কিন্তু ষাটের নিচে যাদের বয়স তাদের মধ্যে শতকরা ২০ জন, ষাটের উর্দ্ধে যারা তাদের মধ্যে শতকরা ৩০ জন এবং বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে শতকরা ৪০—৫০ জনের মৃত্যু ঘটে থাকে।

নারীদের ক্ষেত্রে : অল্প বয়স্ক নারীদের কার্ডিয়াক ইনফার্কসন প্রায় হয় না বললেই চলে কিন্তু বয়স্থা (৪০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধে) নারীরা যারা কার্ডিয়াক ইনফার্কসনে আক্রান্ত হন তাদের পুরুষদের তুলনায় মৃত্যু সংখ্যা বেশি হ'তে দেখা যায়।

প্রথম ও পরবর্তী আক্রমণ ও আরোগ্য সম্ভাবনা : আমরা জানি প্রথম মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন আক্রান্ত রোগীদের তুলনায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারের আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা বেশি ঘটে থাকে।

সময় গতি ও আরোগ্য সম্ভাবনা : আগেই বলা হয়েছে সমস্ত আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এক চতুর্থাংশ রোগী আক্রমণের কয়েক মিনিটের মধ্যে মারা যান। তবে এটা দেখা গেছে প্রথম কয়েক ঘণ্টায় মৃত্যু সংখ্যা সব থেকে বেশি হয় তার পর বেশ অনেকটা কমে যায়। মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসনে যত লোক আক্রমনের পর থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে মারা যায় তাদের মধ্যে শতকরা ষাট ভাগ বা তারও বেশি লোক প্রথম দুদিনের মধ্যেই মারা যায়।

কিছু লক্ষণ ও আরোগ্য সম্ভাবনা : আগেই বলা হয়েছে কার্ডিও-জেনিক শকে[১] শতকরা প্রায় ৮০-৯০ জন রোগী মারা যায়। দক্ষিণ নিলয়ের ফেলিওর, স্থিতিশীল বৰ্দ্ধিত হৎপিণ্ড গতি, ভেনট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া এবং গুরুতর উপসর্গ যথা ফুসফুসীয় এমবলিজম এবং ইনফার্কসনের বিস্তৃতি প্রভৃতি লক্ষণগুলি খুবই গুরুতর এবং যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যু ঘটাতে পারে।

1, 2. G. D. Julian, cardiology, English Language Book Society and Balliere Tindall, London, ELBS, 4th edition 1983.

রক্তে উর্দ্ধ মাত্রায় এস-জি-ও-টি, এস-এল-ডি-এইচ ও সি-পি-কে-এর উপস্থিতি ক্ষতিকারক এবং অধিক মাত্রায় মায়োকার্ডিয়ামের টিস্যুর ধ্বংস নির্দেশ করে এবং ফলাফল নৈরাশ্য জনক।

ইনফার্কসন পরবর্তী জীবন :

ইনফার্কসনের ধাক্কা যারা সামলে নিয়ে বেশ কিছুদিন সুস্থ থাকেন, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হার্ট ফেলিওর ও অ্যানজাইনা—এই সব উপসর্গ যদি না থাকে তাদের ক্ষেত্রে আরোগ্য সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যারা ইনফার্কসনে আক্রান্ত হয়ে সেরে উঠেছেন তাদের মধ্যে শতকরা ৮০—৯০ জন একবৎসর বেঁচে থাকেন। প্রায় ৭৫ ভাগ ৫ বৎসর, ৫০ ভাগ ১০ বৎসর এবং ২৫ ভাগ ২০ বৎসর বেঁচে থাকেন।

কার্ডিয়াক ইনফার্কসনের চিকিৎসা :

হৃৎপিণ্ডের ইনফার্কসন হয়েচে, এ-বিষয়ে নিশ্চিত হলেই চিকিৎসকের প্রধান কাজ হবে রোগীর ব্যথা নিবারণ করা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট কাছাকাছি যে হাঁসপাতালে আছে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া। আমাদের দেশে বর্তমানে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের সুযোগ সুবিধা চিকিৎসা কেন্দ্রের সর্ব স্তরে সংযোজিত হয়নি; বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরও যতেষ্ট অভাব রয়েছে, সে-কারণে যে চিকিৎসকই প্রাথমিক চিকিৎসায় ব্রতী হবেন তাঁকেই কিছুটা বিশেষজ্ঞের ভূমিকা পালন করতে হবে। রোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেকখানি জানতে পেরেছি তাই প্রাথমিক চিকিৎসকের উপর যে গুরু দায়িত্ব এসে পড়বে সেই দায়িত্ব যাতে চিকিৎসক সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন তার জন্য পরিবারের লোকজনদের চিকিৎসা প্রয়োগ সম্বন্ধে চিকিৎসককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে।

ব্যথা কেমন করে দূর করা যাবে :

প্রথমেই চিকিৎসককে বুঝে নিতে হবে হৃৎপিণ্ড গতি বা পাল্‌স গতি মিনিটে কত আছে, রক্তচাপ কত আছে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস গতি মিনিটে কত আছে। ব্র্যাডিকার্ডিয়া থাকলে অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড গতি মিনিটে ৬০ সংখ্যার কম থাকলে, সিস্টোলিক রক্তচাপ ১০০mmHg-এর কম (**Hypotension**) এবং শ্বাস-প্রশ্বাস দমিত থাকলে (প্রতি মিনিটে ১৫ বার বা আরও কম) শিরার মাধ্যমে মরফিন

সালফেট ১০-১৫ মিলিগ্রাম সাথে অ্যাট্রপিন সালফ ০.৫ মিলিগ্রাম মিশিয়ে ইনজেকসন করতে হবে। শ্লথ গতি পাল্‌স না থাকলে, রক্তচাপ স্বাভাবিক বা অল্প কম-বেশি থাকলে ও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকলে মরফিন সালফেটের সঙ্গে অ্যাট্রপিনের পরিবর্তে পারক্লোরপেড়াজাইন (**Perchlor Perazine**) মিশিয়ে ইনজেকসন করতে হবে।

পেথিডিন ১০০ মিলিগ্রাম, ফেনারগান ২০ মিলিগ্রাম, ফোর্টউইন ইনজেকসন, অপেক্ষাকৃত মৃদু আক্রমণে পেশীতে ইনজেকসনও কেউ কেউ ব্যবহার করে থাকেন।

বর্তমানে পেথিডিনকে মায়োকার্ডিয়াক ইনফার্কসনে যে গুরুতর ব্যথা হয় তার উপযুক্ত নিরাময়কারী ঔষধ বলে সর্বজন স্বীকৃত হচ্ছে না। পেথিডিন মরফিনের মতই হাইপোটেনসন ঘটায় অধিকন্তু মরফিনের থেকে কম ব্যথা নিবারক। পেথিডিনের আর একটি দোষ—এই ঔষধ হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে দেয় এবং অনেক রোগী ইনজেকসনের পর বমি করে থাকে।

মরফিন দিয়ে ব্যথা না কমলে নাইট্রাস অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস সমান সমান ভাগে মিশিয়ে শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগে ব্যথা কমান যায়।

মরফিন-অ্যাট্রপিন ইনজেকসন পেশীর মধ্যেও দেওয়া যেতে পারে তবে মরফিনের মাত্রা বেশি হবে (৩০ মিলিগ্রাম)।

শকের চিকিৎসা :

মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে ধাক্কা কার্ডিওভ্যাসকুলার সিস্টেমের উপর পড়ে সেই ধাক্কায় হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শক্তি কমে যায় যার ফলে কার্ডিয়াক ভলিউম কমে যায়, প্রান্তীয় ধমনীর বাধা ও রক্তচাপও কমে যায়। হৃৎপিণ্ডের ছন্দবদ্ধ স্পন্দন বিঘ্নিত হয়ে অনিয়মিত স্পন্দন হতে থাকে। এর সঙ্গে এক প্রকার প্রাণান্তকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে রোগী সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। সর্ব শরীরে ঘাম, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সেই অবস্থাকে 'শক' বলে চিহ্নিত করা হয়। এই শকের গুরুত্ব ও স্থায়ীত্ব ইনফার্কসনের বিস্তৃতির উপর নির্ভর করে। বেশি জায়গা জুড়ে ইনফার্কসন হ'লে—প্রারম্ভিক শক কার্ডিওজেনিক শকে রূপান্তরিত হয়। কার্ডিওজেনিক শক অত্যন্ত ভয়াবহ উপসর্গ যার থেকে রেহাই পাওয়া খুবই কঠিন। প্রারম্ভিক বিশৃঙ্খল হৃৎপিণ্ড গতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা একান্ত দরকার—নিয়ন্ত্রনে আনতে না পারলে কার্ডিওজেনিক শক হওয়ার সম্ভাবনা খুবই প্রবল। তাই এই অবস্থায়

চিকিৎসা সাধারণ চিকিৎসকের সামর্থের বাহিরে থাকে। দরকার অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত ধারাবাহিক চিকিৎসা যা ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক ইউনিটেই সম্ভব। শকের জন্য বেটামেথাসোন (**Betnesol**) ২০ মিলিগ্রাম পেশীতে ইনজেকসনও করা হ'য়ে থাকে।

হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শক্তি বাড়াবার জন্য অল্প মাত্রায় ডোপামাইন (**Dopamine**) ও ডোবুটামাইন (**Dobutomine**) ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। রক্তের ভলিউম বাড়ানর জন্য পরিমিত মাত্রায় ডেক্সট্রোজ (**Dextrose**) বা ডেক্সট্রান (**Dextran**) ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু পালমনারী ইডিমার (**Pulmonary oedema**) কথা স্মরণ রেখে পরিমাণ সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে এবং রক্তচাপের উপরও লক্ষ্য রাখতে হবে।

শ্বাসকষ্ট ও হার্ট ফেলিওর থাকলে ফ্রুসেমাইড (**Frusemide**), ডিজিটেলিস (**Disitalis**) ও অক্সিজেন ব্যবহার করা দরকার। ঐ সব ব্যবস্থায় সুফল পাওয়া না গেলে রক্তবাহ প্রসারিত করে (**Vasodilator**) এমন ঔষধ যথা আইসো-সরবাইড ডাইনাট্রেট (**Isorbide Dinitrate**), প্র্যাজোসিন ও হাইড্রালাজাইন (**Hydralazine**) ব্যবহার করা যেতে পারে কিন্তু ইসিজি মনিটারিং দ্বারা ঐ ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

বিশৃঙ্খল হৃৎপিণ্ড গতির চিকিৎসা (Treatment of Arrhythmeas) **:**

এই চিকিৎসা হাসপাতাল বা ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট ছাড়া করা সম্ভব নয়। অবস্থা ভেদে নিম্নরূপ চিকিৎসা করা হয়ে থাকে :

ভেনট্রিকুলার ফিব্রিলেসনে (Ventricular fibrilation) **:** ২০০ জোল্স (**Joules**) মাত্রায় (ডি সি) শক (**d c, shock**) প্রয়োগে সাইনাস রিথম (**Sinus Rhythm**), রক্তচাপ ও জ্ঞান ফিরে আসে। অবশ্য যত তাড়াতাড়ি এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যায় তত সুফল পাওয়া যায়। এই অবস্থায় এসি-ডোসিস (**Acidosis**) অল্প সময়ের মধ্যে এসে যায় সে কারণে সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ৫০-৭৫ এম মোল (**m mol**) শিরার মধ্যে প্রয়োগ করা দরকার। ধমনীর রক্তের পি এইচ (**pH**) দেখে কাজ করা উচিত। অ্যান্টি অ্যারিথমিক ঔষধ যথা প্রোকেনামাইড শিরার মাধ্যমে ইসিজি নিয়ন্ত্রণে ৫০ মিলিগ্রাম প্রতি মিনিটে অ্যারিথমিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত দেওয়া হ'য়ে থাকে।

অরিকুলার ফিব্রিলেসন ও ফ্লাটার (Auricular fibritation and Flutter) :

এই অবস্থায় ডিগক্সিন (Digoxin) ০·৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় শিরার মাধ্যমে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে গত এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী ডিজিটেলিস ব্যবহার করেছে কি করেনি। ব্যবহার করা থাকলে মাত্রা আরও কম হবে। হার্ট রেট নিয়ন্ত্রণে এসে গেলে ডিগক্সিন মুখ দিয়ে ব্যবহার করান যেতে পারে। ডিগক্সিন ০·২৫ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট দিন একটি করে ব্যবহার করতে হবে এবং সপ্তাহে একদিন করে ডিগক্সিন বন্ধ রাখতে হবে।

যদি রোগীর রক্তচাপ স্বল্পতার সঙ্গে পাল্‌সের গতি কম থাকে (ব্র্যাডি-কার্ডিয়া) বা ভেনট্রিকুলার একটপিক বিট থাকে—রোগীকে ০·৬ মিলিগ্রাম অ্যাট্রপিন শিরার মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী দ্বিতীয়বার ইনজেকসন দিতে হ'তে পারে কিন্তু কোন অবস্থাতেই ট্যাকিকার্ডিয়া যাতে না আসে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সম্পূর্ণ হার্ট ব্লক থাকলে স্পেসিং করাই বাঞ্ছনীয়।

রক্তবাহে রক্ত যাতে জমে না যায় তার চিকিৎসা (Anticoagulant Therapy) :

এই চিকিৎসা করা উচিত কি অনুচিত এই নিয়ে মতদ্বৈধতা আছে। তবে বয়স্কদের ক্ষেত্রে যেখানে দীর্ঘকাল অচল অবস্থায় থাকার দরুণ পেশীর শিরায় রক্ত জমে যাবার সম্ভাবনা বেশি সেখানে এই অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট চিকিৎসা করায় সুফলই পাওয়া যায়। ওয়ারফেরিন (**Uniwarfin – Unichem** = ৪ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট) প্রথমে ১০-১৫ মিলিগ্রাম মাত্রায় প্রত্যহ ব্যবহার করতে হবে তারপর রক্তে প্রোথ্রমবিনের পরিমাণ কিরূপ আছে তার উপর ওয়ারফেরিনের মাত্রা নির্ভর করবে এবং মাত্রা কম বা বেশি করতে হবে। দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ১-২ বৎসর ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। তবে যাদের আগে পেপটিক আলসার, যকৃতের সিরোসিস এবং অল্পেই অধিক পরিমাণে রক্তপাতের ইতিহাস আছে তাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট ঔষধ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ।

স্ট্রেপটোকাইনেজ (Streptokinase) :

সম্প্রতি স্ট্রেপটোকাইনেজ নামে একটি ঔষধ, যেটি মূলত একটি ফিব্রিনো-

লাইটিক বস্তু, ব্যবহার করে উৎসাহবঞ্চক ফল দেখা যাচ্ছে। কার্ডিয়াক ক্যাথিটারের সাহায্যে যে করনারী ধমনীতে রক্ত জমে বন্ধ হ'য়ে গেছে সেই ধমনীতে সরাসরি স্ট্রেপটোকাইনেজ ইনজেকসন ক'রে অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া যাচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে কিছু আশার আলো দেখতে পাওয়া সম্ভব হ'তে পারে।

আক্রমণের সময়, সেবা ও পরিচর্যা

মায়োকার্ডিয়াম ইনফার্কসনে আক্রান্ত রোগীদের সেবা ও পরিচর্য্যা খুবই দক্ষ, অভিজ্ঞ ও কর্তব্যনিষ্ঠ সেবক বা সেবিকা দ্বারা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রোগের ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে অভিজ্ঞতার নৈপুণ্য প্রয়োগ ক'রে রোগীর আরোগ্য লাভে সহায়তা করাই প্রকৃষ্ট সেবা পরিচর্য্যা করার প্রধান লক্ষ্য হবে।

শয্যা বিন্যাস থেকে আরম্ভ করে, ঔষধ, পথ্য, পাল্‌স, শরীরের উত্তাপ, শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রস্রাব, পায়খানা, রক্তচাপ, ইসিজি মনিটারিং, সর্ব বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে অবস্থা ভেদে চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে সময়োচিত সকল ব্যবস্থা নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করতে হবে।

শয্যা :

যে সমস্ত রোগীর ইনফার্কসন হওয়ার পর রক্তচাপ খুব কমে যায় তাদের ক্ষেত্রে শিরার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রোগীর বেডের পায়ের দিকটি মাথার দিকের থেকে উঁচু ক'রে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে, বিশেষ ক'রে বয়স্ক লোকেদের ক্ষেত্রে, দু-পায়ের কাফ-মাস্‌ল মেসাজ ক'রে রক্ত প্রবাহকে সক্রিয় রাখতে সাহায্য করতে হবে।

প্রস্রাব ও পায়খানা :

রোগী প্রথম প্রথম বিছানাতেই ইউরিন্যাল ও বেড প্যান ব্যবহার করবেন। ৪।৫ দিন বাদে রোগী অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকলে বিছানার পাশে রাখা কমোডে বা বিছানার উপর বসে বেড প্যানে পায়খানা করতে পারেন। আরও পরে কমোডেই পায়খানা করবেন।

সাধারণ অনুযোগ ও প্রতিকার :

রোগী যখন আরোগ্যের পথে এগিয়ে চলেছেন তখন ছোট ছোট অনুযোগ যথা কোষ্টকাঠিন্য, প্রস্রাব আটকে যাওয়া, যা বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, কারণ উঠে বসার অবস্থা থাকে না বা বসতে দেওয়া হয় না, সেগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কোষ্ঠকাঠিন্যে লিকুইড প্যারাফিন প্রত্যহ এক আউন্স ব্যবহার করলে সমস্যা সমাধান হ'তে পারে। প্রস্রাব আটকে গেলে ক্যাথিটার ব্যবহার ক'রে প্রস্রাব করিয়ে দিতে হবে।

পথ্য :

যে সব রোগীর ওজন বেশি তাদের কম ক্যালরীর পথ্য দিতে হবে। গুরুতর অসুস্থদের ক্ষেত্রে অল্প অল্প মাত্রায়, ২/৩ আউন্স, বারে বারে তরল খাদ্য, (দুধ, হরলিক্স, ফলের রস) খাইয়ে দিতে হবে। ৪/৫ দিন পর থেকে অবস্থার উন্নতি হ'লে ক্যালরী বাড়ান দরকার এবং সেই অনুযায়ী খাদ্যের পরিমাণও বাড়বে এবং রোগী বিছানায় বসে নিজ হাতে খেতে পারেন। সুস্থতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প ক'রে শক্ত খাবার খেতে দিতে হবে যেমন নরম ভাত, ছোট ছোট মাছ, ছিবড়ে ও খোসাবিহীন সবজি ও নানা রকম ফল দেওয়া চলবে। মাঠাতোলা দুধ দৈনিক আধলিটার পর্য্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। ভাজাভুজি খাদ্য চলবে না। সিদ্ধ সবজি খুব অল্প নুন ও মসলা (গোটা) সহযোগে দেওয়া যেতে পারে। বাজারের গুঁড়া মসলা বর্জন করাই বিধেয়।

রক্তচাপ বেশি থাকলে বা রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড ও কোলেসটেরল বা চিনি ও ইউরিয়া বেশি থাকলে খাদ্য নির্বাচন করে দিতে হবে।

যে খাদ্যই দেওয়া হউক তা কখনই পেট ভর্ত্তি দেওয়া উচিৎ নয়। খাদ্য সর্বদা অল্প অল্প করে দিতে হবে। পেটে গ্যাস হয় এমন খাদ্য বর্জন করাই বাঞ্ছনীয়।

চলাফেরা ও কর্মে যোগদান :

ইনফার্কসন হওয়ার পর থেকেই রোগীকে প্রথমে মেসাজ, অস্থিসন্ধির নাড়াচাড়া করিয়ে দিতে হবে। তারপর সপ্তাহের শেষের দিক থেকে উপসর্গ বিহীন রোগীরা ঘরের মধ্যে ইজি চেয়ারে বসা, ঘরের মধ্যে অল্প চলাফেরা করতে থাকবে।

তারপর ঘরের বাহিরে অল্প অল্প চলাফেরা করবে এবং প্রত্যহ একটু একটু করে চলাফেরার দূরত্ব বাড়াতে হবে।

তিন বা চার সপ্তাহ বাদে উপসর্গ বিহীন রোগীরা যে যার পেশায় যোগদান করা বাঞ্ছনীয় কিন্তু অতীতে যাদের পেশা উড়োজাহাজ চালানো বা ভারি লড়ি ছালান ছিল তাদের পেশা বদল করা একান্ত দরকার। সময় মত কাজে নিযুক্ত হ'তে না পারলে রোগী মানসিক দিক থেকে কমজোরী হ'য়ে পড়বে এবং আস্তে আস্তে অকর্মন্যও হ'য়ে যেতে পারে।

রোগীকে সর্বদা নিয়ম ক'রে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ সর্ব বিষয়ে মেনে চলা উচিৎ হবে।

হার্ট ফেলিওর

(Heart Failure)

হার্ট ফেলিওরের যথাযথ সঙ্গা জ্ঞাপন করা খুবই দুরূহ ব্যাপার। সাধরণ কথায় হার্টের কাছ থেকে আমরা যা পেতে চাই তা যখন হার্ট আমাদের দিতে অক্ষম হয় তখন হার্টের ঐ অবস্থাকে হার্ট ফেলিওর অবস্থা বলা যেতে পারে, যেমন ধরুন কোন লোক একটু তাড়াতাড়ি যেতে চাইছেন কিন্তু দু-পা গেলেই হাঁপিয়ে পড়ছেন বা বুকের মাঝ খানটা কনকন করছে—লোকটির শরীরে অন্য কোন রোগ নাই—আবার একটু থামলেই অনেকটা সুস্থ বোধ করেন—অর্থাৎ সামান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হৃৎপিণ্ড যখন কাজ করতে পারছে না তখন ঐ অবস্থাকে হার্ট ফেলিওর বলা যেতে পারে।

শারীরতত্ত্ববিদরা বলেন নিলয়গুলি যখন সংকোচন দ্বারা পরিমিত কার্ডিয়াক আউটপুট রাখতে পারছে না তখন বুঝতে হবে হার্ট ফেলিওর অবস্থা রয়েছে।

সার থোমাস লুইস (**Sir Thomas Lewis**) বলেছেন হার্ট ফেলিওর তখনই বলা হয় যখন হৃৎপিণ্ড তার গহ্বরের রক্ত যতেষ্টভাবে নিক্ষেপ করতে পারে না।

পল উড (**Paul wood**) বলেছেন—হার্ট ফেলিওর তখনই বলা যায় যখন হার্ট, ভেনাস রক্তের চাপ (**Venous pressure**) যতেষ্ট থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে রক্ত সঞ্চালন করতে অক্ষম হয়।

ম্যাকেজি (**Mackenzee**) বলেছেন বুকে ব্যথা (**Angina**) হওয়া হার্ট ফেলিওরের লক্ষণ কারণ ব্যথা না ঘটিয়ে নিজ গহ্বরের রক্ত হৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করতে পারে না।

হৃৎপিণ্ড বিশেষজ্ঞরা বলেন যখন বিভিন্ন অঙ্গে ও শিরায় রক্তাধিক্য দেখা যায় ও টিস্যুতে জলীয় পদার্থ জমে যায় তখন সেই অবস্থাকে হার্ট ফেলিওর অবস্থা বলা যায়।

উপরি উক্ত ধ্যান-ধারনার পরিপ্রেক্ষিতে, টিস্যুতে জলীয় পদার্থ ও শিরায় রক্তাধিক্য হেতু যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে কনজেসেটিভ হার্ট ফেলিওর (**Congestive heart failure**) বলা হয়। কনজেসটিভ হার্ট ফেলিওর বলতে কেউ কেউ বলেন যে দু-রকমের কনজেসেটিভ হার্ট ফেলিওর আছে—যথা বাম হৃৎপিণ্ড ও দক্ষিণ হৃৎপিণ্ড ফেলিওর। যখন ফুসফুসীয় শিরাতন্ত্রে রক্তাধিক্য জমে থাকে তখন তাকে বাম হৃৎপিণ্ড ফেলিওর (বাঁম অলিন্দ ও নিলয়) এবং যখন বৃহত্তর শিরাতন্ত্রে রক্তাধিক্য দেখা হায় তখন তাকে দক্ষিণ হার্ট ফেলিওর (দক্ষিণ

অলিন্দও নিলয়) বলে। বাম অলিন্দ ও নিলয়ের ফেলিওরের শেষ ফল হিসাবে পশ্চাৎ রক্ত চাপের ধাক্কায় দক্ষিণ নিলয় ও অলিন্দও ফেল হয়ে থাকে।

আমরা জানি ও প্রায়ই খবরের কাগজে দেখি, অমুক জায়গায় অমুক লোক হঠাৎ 'করনারী অ্যাটাক' হয়ে মারা গেছেন। আবার শুনি অমুক লোক বহুদিন ধরে হৃদরোগে ভুগতে ভুগতে মারা গেছেন। এই দু-রকম অবস্থাই হার্ট ফেলিওরের জন্য হয়ে থাকে। কেউ কেউ এই দুই অবস্থাকে আলাদা করে চিহ্নিত করেন—(i) অ্যাকুউট হার্ট ফেলিওর (**Acute heart fatlure**) অর্থাৎ হঠাৎ হার্ট ফেলিওর যেমন করনারী অ্যাটাক, এবং (ii) ক্রনিক হার্ট ফেলিওর বা বিলম্বিত হৃৎপিণ্ড বিকলতা, যেমন হার্ট ফেলিওরের জন্য হাত পা ফুলে অনেকদিন ধরে ভোগার পর মৃত্যু।

ঐ ক্রনিক হার্ট ফেলিওর বা বিলম্বিত হৃৎপিণ্ড বিকলতাকে কনজেসটিভ হার্ট ফেলিওর বলে চিহ্নিত করা হয়। বহুদিন ধরে হৃৎপিণ্ড নানা অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে করতে যথা রোগাগ্রস্থ হৃৎপিণ্ড কপাটিকা, রক্তচাপাধিক্য, ইসকিমিয়া প্রভৃতি রোগের আঘাতে ভুগতে ভুগতে নিজস্ব সঞ্চিত শক্তি (**Cardiac reserve**) হারিয়ে ফেলে যার ফলে নিম্ন লিখিত বিরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যাকে হার্ট ফেলিওরের লক্ষণ বলা হয় :

(১) কার্ডিয়াক আউটপুট কমে যায় — হৃৎপিণ্ড গতি বেড়ে যায়। / রক্তচাপ কমে যায়।

(২) শিরায় রক্তাধিক্যের চাপ সর্বদা থেকে যায়। ঐ রক্তাধিক্যের চাপের জন্য নিম্নলিখিত বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায় :

(i) শ্বাস কষ্ট।
(ii) গলার শিরা ফুলে থাকে এবং দপদপ করে দেখা যায়।
(iii) টিস্যুতে সোডিয়াম লবণ ও জল জমে থাকে কারণ এডি্রনেল গ্রন্থির অতিমাত্রার অ্যালডেসটেরোনের ক্ষরণ।
(iv) পা, হাত, মুখ ফুলে যাওয়া, পেটে জল জমে যায় এবং বুকেও জল জমে যেতে পারে।
(v) হাতের নোখ ও ঠোঁট অক্সিজেনের অভাবে নিলাভ হয়ে যায়
(vi) লিভার ও প্লীহা বড় হয়ে যায়।
(vii) হৃৎপিণ্ড গতি বেড়ে যায়।
(viii) রক্তচাপও কমে যায়।

রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগ

(High Blood Pressure And Heart Disease)

মুখবন্ধ :

রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগ আজকের এই যান্ত্রিক যুগে স্বাস্থের পক্ষে একটা বড় সমস্যা কারণ সঠিক সমাধান আজও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সুখ সুবিধা যেমন বেড়েছে, প্রগতির ছোঁয়াচ লেগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে মানুষ যেমন এগিয়ে চলেছে, নানাবিধ প্রচার মাধ্যম যতটা মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন ক'রে তুলেছে ঠিক ততটাই মানুষ নিজ সৃষ্ট প্রতিকুলতার জালে আবদ্ধ হ'য়ে রোগের আক্রমণে হাবুডুবু খেয়ে কালাতিপাত করছে। আগেকার দিনের সহজ সরল জীবন যাত্রা প্রগতির করাল গ্রাসে অবলুপ্তির সীমানায় এসে পড়েছে। আর মানুষ ছুটে চলেছে নূতনের সম্ভাবনাময় আশা আকাঙ্খার পিছু পিছু। এই ছোটার নেশায়, মানসিক প্রতিক্রিয়ায় রক্ত-চাপাধিক্য ও হৃদরোগ বেড়েই চলেছে সমান তালে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে দেশ যত সমৃদ্ধ, যে দেশ যত যন্ত্রদানবের উপর নির্ভরশীল, রসনা তৃপ্তির ভোগ্য সম্ভার যেখানে যত সহজ লভ্য, সেই সব দেশে রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগ তত বেশি। অ্যামেরিকা, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, সুইজারল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলি জ্ঞানে, গুণে, সম্পদে, বিজ্ঞানে ও যান্ত্রিকতায় খুবই উন্নত কিন্তু ঐ সব দেশে রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগ আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের থেকে অনেক বেশি। তবে আমাদের দেশেও রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। জীবন যাত্রার মান যেমন বেড়ে চলেছে, যান্ত্রিকতার প্রভাব যত বেড়ে চলেছে, কৃত্রিমতার অবলম্বন আমাদের সমাজ জীবনে যতই ছড়িয়ে পড়ছে, যতই উদ্বেবপূর্ণ অতি ব্যস্ত জীবন যাত্রা বেড়ে চলেছে ততই যেন এই বিধ্বংশী রোগ উত্তর উত্তর বেড়েই চলেছে।

ভাবতে অবাক লাগে, পশ্চিমের উন্নত দেশগুলি সুখের জন্য কতই-না-কি ক'রে চলেছে কিন্তু এই সুখ সুবিধার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুঃখও বেড়ে চলেছে। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি ঐ সব দেশে রক্ত চলাচল তন্ত্রের রোগ যাবতীয় মৃত্যুর ৫০ ভাগই ঘটিয়ে চলেছে। রক্তচাপাধিক্য রোগকে আলাদা ক'রে দেখলে দেখা যাবে ১০-২০ ভাগ মৃত্যু রক্তচাপ বৃদ্ধি ও আনুসঙ্গিক কারণ থেকে ঘটে থাকে। রক্তচাপাধিক্যের বিরূপ প্রভাব করনারী, রেনাল ও মস্তিষ্ক ধমনীর উপর পড়ে এবং

হৃৎপিণ্ডকেও সর্বদা একটা মাত্রাতিরিক্ত চাপে কাজ ক'রে যেতে হয়। এই রক্তচাপাধিক্যের প্রধান আঘাতটা তাই হৃৎপিণ্ডের উপর পড়ে এবং কার্ডিয়াক ইসকিমিয়া, ইনফার্কসন, করনারী থ্রমবোসিস প্রভৃতি জীবননাশী রোগের প্রাদুর্ভাব এত বেশি ক'রে ঘটতে দেখা যাচ্ছে এবং অকালেই বহু সম্ভাবনাময় জীবন মৃত্যুর করাল গ্রাসে নিপতিত হচ্ছে। তাই আমাদের এই করাল ব্যাধির রহস্য উদ্ঘাটনে চেষ্টা করতে হবে এবং ভাবতে হবে কেমন ক'রে এই বিষম ব্যাধির বিষম প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

রক্তচাপ সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়

আগেই আমরা এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছি। এখন আমরা এ বিষয়ে একটু ভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে আলোচনা করব এবং অধ্যয়নের সংযোগ রক্ষা করার ও সুবিধার জন্য কিছু পুনরালোচনাও করব।

দুটি মুখ্য বিষয়ের উপর নির্ভর ক'রে, রক্তচাপ মাত্রা বিশ্রামের সময়, একটা সীমার মধ্যে থাকে। এই দুটি মুখ্য বিষয় হচ্ছে—(১) কার্ডিয়াক আউটপুট অর্থাৎ সংকোচনের সময় কত পরিমাণ রক্ত হৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করছে ও (২) ক্ষুদ্র ধমনীগুলির প্রান্তীয় বাধা (Peripheral Arterial resistance)। এই দুটি বিষয়ই মানুষে মানুষে তফাৎ হ'য়ে থাকে, এমন কি একই মানুষে বিভিন্ন সময়ে তফাৎ হয়ে থাকে। কিন্তু এই তারতম্য দেখা গেলেও, স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত-চাপের সামান্যই হেরফের হ'তে দেখা যায়। কারণ কার্ডিয়াক আউটপুট ও ক্ষুদ্র ধমনীর প্রান্তীয় বাধা উভয়ে একে অন্যের পরিপূরক। অর্থাৎ কার্ডিয়াক আউটপুট বাড়লে প্রান্তীয় ধমনীর বাধা কম হয়ে যায় এবং কার্ডিয়াক আউটপুট কমলে প্রান্তীর বাধা বেড়ে যায়। দীর্ঘস্থায়ী রক্তচাপাধিক্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রান্তীয় ধমনীর বাধাই রক্তচাপাধিক্যের প্রধান কারণ কেননা এই সমস্ত ক্ষেত্রে কার্ডিয়াক আউটপুট স্বাভাবিকই থাকে।

উপরি উক্ত তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে প্রান্তীয় ধমনীগুলির সংকোচন বা এই সমস্ত রক্তবাহ দেওয়ালের পরিবর্তন জনিত রক্তবাহ নালীর সংকীর্ণতা রক্তচাপাধিক্য রোগের প্রধান কারণ।

যদি কোন ব্যক্তির, দিন-রাত অবিরতভাবে রক্তচাপ মেপে দেখা যায়, তা

হ'লে দেখা যাবে, জাগা অবস্থার থেকে ঘুমন্ত অবস্থায় রক্তচাপ, ৩০-৪০ mmHg. কম থাকে।

আগেই আমরা আলোচনা করেছি রক্তচাপের গতি-প্রকৃতি, নারী-পুরুষে তফাৎ এবং উত্তেজনায়, বিশাল শরীর প্রভৃতির সঙ্গে রক্তচাপ কত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধযুক্ত। আর একটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করেছি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণতঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, রক্তচাপ বাড়লেও কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে রক্তচাপ বাড়ে না। প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে বয়স বাড়ার সঙ্গে রক্তচাপ বৃদ্ধির কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

আগেই বলা হয়েছে একই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম রক্তচাপ দেখা যায় আবার একই বয়সের লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন রকম রক্তচাপ দেখা যায়। তবে একটি বিষয় সর্বদা সত্য যে যাদের রক্তচাপ সর্বদা বেশি থাকে সিস্টোলিক বা ডায়াস্টোলিক যাই হউক, তাদের রক্তচাপ বৃদ্ধি জনিত রোগ যথা বাম নিলয়ের স্ফীতি (Hyperpophy), বাম নিলয়ের ফেলিওর, করনারী ধমনী ঘটিত রোগ মস্তিস্ক রক্তবাহ ঘটিত ও বৃক্কের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

আগেই আমরা স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক রক্তচাপ এবং অস্বাভাবিক রক্তচাপের শ্রেণী বিন্যাস, বিভিন্ন বয়সে, নারী পুরুষে প্রভৃতি বিষয়ে ১১৭—১২০ পাতায় আলোচনা করেছি। এখন আমরা শুধু রক্তচাপ স্বল্পতা (Low blood pressure) সম্বন্ধে অল্প কিছু আলোচনা করব।

রক্তচাপ স্বল্পতা (Low Blood Pressure) :

আমরা আগেই জেনেছি একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের সুস্থ শরীরে, বিশ্রামের পর, স্বাভাবিক সিস্টোলিক রক্তচাপ ১১০—১৪৫ mm.Hg এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৬০—৮০ mm.Hg. থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী-লোকদের ক্ষেত্রে সিস্টোলিক রক্তচাপ ৫ mm.Hg কম থাকে।

যদি কোন ব্যক্তির রক্তচাপ উপরোক্ত স্বাভাবিক স্তরের নিচে থাকে, এবং রোগীর পাল্‌সের গতি প্রকৃতি ঠিক থাকে, শকের কোন লক্ষণ না থাকে ও রোগীর কোন অনুযোগ না থাকে সে সব ক্ষেত্রে রোগীকে রক্তচাপ সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। কারণ স্বাভাবিক স্তরের নিচে রক্তচাপ থাকলেও কোন ব্যক্তির যদি কোন অনুযোগ না থাকে এবং পাল্‌স গতি ঠিক থাকে সে সব ক্ষেত্রে ঔষধ দিয়ে

চিকিৎসার কোন দরকার হয় না। সার্জিকল অপারেশনের পর, অনেক রোগীর সিস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ **mmHg.** তে নেমে যেতে দেখা যায় কিন্তু রোগীর আরোগ্য সম্ভাবনায় কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করতে দেখা যায় না বা কোনরূপ বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায় না যদি না রক্তচাপ ক্রমশঃ নিচের দিকেই নামতে থাকে। যে ব্যক্তি স্বাভাবিক কাজ কর্ম ঠিকই করে যাচ্ছেন, কোন অনুযোগ নাই অথচ পরীক্ষায় তার রক্তচাপ স্বাভাবিক স্তরের নিচে রয়েছে দেখা যায় সে ক্ষেত্রে তাঁকে রক্তচাপ কম রয়েছে (**Low Pressure**)—একথা একবার বললেই সেই দিন থেকেই তিনি রোগী হয়ে পড়বেন। এই সম্বন্ধে কেউ কেউ বলে থাকেন— **"Physician induced disease"** অর্থাৎ **চিকিৎসক-সৃষ্ট রোগ।**

তাই চিকিৎসক তাঁর বিচার বিবেচনা প্রয়োগে রক্তচাপ সম্বন্ধে রোগীকে কিছু না বলাই যুক্তি যুক্ত।

মুস্কিল হচ্ছে, আজকাল রক্তচাপাধিক্য সম্বন্ধে প্রচার লোককে যতটা সজাগ ক'রে তুলেছে ততটাই তাদের বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলেছে। কোন ব্যক্তির রক্তচাপ মাপার পরই রোগী ডাক্তারকে পীড়াপীড়ি করতে থাকেন, কত তার রক্তচাপ জানার জন্য। না বলেও কোন উপায় থাকে না। অতএব এই 'চিকিৎসক-সৃষ্ট রোগকে' উপযুক্ত প্রচার ব্যতিরেখে এড়ান খুবই কঠিন। অনেক সুস্থ ব্যক্তির গাঢ় ঘুমের প্রথম অবস্থায়, সিস্টোলিক রক্তচাপ ৮০ **mm, Hg.**-এর নিচেও নেমে যেতে দেখা যায়। এই অবস্থাকে ঠিক রোগ বলা যায় না এবং এই সব লোকের চিকিৎসারও দরকার নাই। কিন্তু কিছু ওত্যুৎসাহী চিকিৎসক এই সব অবস্থায় রাজসিক চিকিৎসা করার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়েন এইটাই দুঃখের বিষয়।

রক্তচাপাধিক্য কেন হয় বা এর কারণ কি

রক্তচাপাধিক্যের কারণগুলি খুজে দেখার আগে রক্তচাপ বৃদ্ধির অধিযন্ত্রবাদ (**Mechanism**) সম্বন্ধে আগেই যা জেনেছি তা একটু ঝালিয়ে নেব। রক্ত সম্পূর্ণ বদ্ধ টিউবের মধ্য দিয়ে চলাচল করে, সে জন্য রক্তের ভলিউম যদি বাড়ে, প্রান্তীয় ধমনীর বাধা যদি বাড়ে তা হ'লে রক্তচাপ বাড়বে বা অন্য যে কোন কারণে প্রান্তীয় ধমনীর নালীর ব্যাস যদি কমে যায়, রক্তের ভলিউম এক থাকলেও রক্তচাপ বাড়বে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে সবাইত রক্তচাপাধিক্যে ভোগেন না, কিছু কিছু লোক

ভোগেন। এই কিছু লোক ভোগেন কেন, তার কারণগুলি কি, তাই এখন আলোচনা করব।

যত লোক রক্তচাপাধিক্যে ভোগে তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র পাঁচ জনের ক্ষেত্রে রক্তচাপাধিক্য অন্য রোগের উপসর্গ রূপে দেখা যায় এবং সেকারণে এই সমস্ত রক্তচাপাধিক্যের ঘটনাকে **সেকেনডারী রক্তচাপাধিক্য** (Secondary Hypertension) বা **ঔপসর্গিক রক্তচাপাধিক্য** বলা হয়। বাকি ৯৫ জনের ক্ষেত্রে যে রক্তচাপাধিক্য দেখা যায় তাদের রক্ত চাপাধিক্যের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই যে সমস্ত রক্তচাপাধিক্যের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না তাদের **প্রাইমারি** বা **প্রাথমিক রক্তচাপাধিক্য** বলা হয়। এই সমস্ত রক্তচাপাধিক্যের ঘটনাকে **এসেনসিয়েল রক্তচাপাধিক্য** (Essential Hypertension) ও বলা হয়ে থাকে।

সেকেনডারি রক্তচাপাধিক্যের কারণ

উপসর্গ হিসাবে বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন রোগে রক্তচাপাধিক্য হ'তে পারে। নিম্নলিখিত রোগগুলি সেকেনডারি রক্তচাপাধিক্যের প্রধান কারণ :

(১) **বৃক্কের** (Kidney) **রোগ :**

- (i) গ্লোমিরিউলোনেফ্রাইটিস (Glomirulonephritis)।
- (ii) প্যায়েলো-নেফ্রাইটিস (Pyelo-Nephritis)।
- (iii) বৃক্কের টিউমার (Renal Tumour)।
- (iv) বৃক্ক ধমনীর স্থায়ী সংকোচন (Renal Stenosis)।
- (v) বৃক্কের পলিসিসটিক রোগ (Polycystic disease of Kidney)।

(২) **মহাধমনীর কো-আর্কটেসন** (Coarctation of Aorta)।

(৩) **প্রি-এক্লামসিয়া ও এক্লামসিয়া** (Preeclampsia and Eclampsia)।

(৪) **নূতন পরফাইরিয়া** (Acute Porphyria)।

(৫) **মস্তিষ্কের ব্যাধি :**

- (i) মস্তিস্কের টিউমার (Brain Tumour)।
- (ii) বালবার পোলিওমায়লাইটিস (Bulbar Poliomyelitis)।

(৬) **অন্তঃক্ষরীয় গ্রন্থীর রোগ :**

(i) প্রাথমিক অ্যালডসটেরোনিজম (**Primary Aldosteronism**)।

(ii) ফিয়োক্রোমোসাইটোমা (**Phacochrymocytome**)

(iii) কুসিংস সিনড্রোম (**Cushing Syndrome**)

(৭) **কতিপয় ঔষধ সেবনে :**

(i) জন্মনিরোধক বটিকা (**Oral contraceptives**)

(ii) এ সি টি এইচ (**ACTH**)

(iii) কর্টিকোস্টেরয়ড (**Corticosteroid**)

(iv) লিকরিস (**Liquoricc**)

(v) রক্তবাহ সংকোচক নাকের ঔষধ (**Vasoconstrictor nasal Drops**)

বৃক্কের রোগ ও ঔপসর্গিক রক্তচাপাধিক্য
(Renal Disease And Secondary Hypertension)

নূতন গ্লোমিরিউলোনেফ্রাইটিস (Acute Glomerulonephritis) :

এই রোগে অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে রক্তচাপাধিক্য একটি প্রধান লক্ষণ। তবে এই রক্তচাপাধিক্য চিরস্থায়ী নয়। রোগ মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এই রক্তচাপাধিক্যও চলে যায়। সাধারণতঃ একটা অ্যাকিউট স্ট্রেপটোকককাল জীবাণু ঘটিত কোন রোগের পর (After an attack of acute Streptococcal infection), হঠাৎ ক'রে জ্বর, তার সঙ্গে প্রস্রাব কম, হাত, পা, মুখ ফোলা ফোলা হ'য়ে যাওয়া, মাথা ধরা, খাদ্যে অরুচি, বমি বমি ভাব প্রভৃতি লক্ষণ ও কষ্ট এই ব্যাধির আনু-সঙ্গিক ঘটনা। আক্রমণের তিব্রতা যে সব ক্ষেত্রে প্রবল সেই সব কোন কোন ক্ষেত্রে (সমস্ত রোগীর প্রায় $\frac{1}{8}$ অংশ) কার্ডিয়াক ফেলিওরও হ'তে পারে।

ঠিক কেমন ক'রে, কোন্ বস্তুর প্রভাবে এই রোগের উৎপত্তি হয় বা এই রোগের অধিযন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আজও সঠিক ভাবে কিছু জানা নাই। তবে এইটুকু জানা যে এই রোগে সোডিয়াম ও জলীয় পদার্থ টিস্যুতে জমে যায় কারণ বৃক্কের টিবিউলগুলি রোগের প্রাদুর্ভাবে বহুলাংশে অকেজো হ'য়ে পড়ে যার ফলে জল ও সোডিয়াম, প্রস্রাবের মাধ্যমে নিষ্কাশিত হ'তে পারে না।

পায়েলোনেফ্রাইটিস (Pyelonephritis)

পুরাতন পায়েলোনেফ্রাইটিসে যারা ভুগছেন তাদের মধ্যে বেসিরভাগ লোকই রক্তচাপাধিক্যে ভুগে থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এই রক্তচাপাধিক্য বেড়ে গিয়ে ম্যালিগনানট হাপারটেনসনে পরিণত হ'তে পারে।

বৃক্কের টিউমার ও পলিসিসটিক রোগে (Polycyotic disease and tumour of Kidney) :

বৃক্কের টিউমার ও পলিসিসটিক রোগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রক্তচাপাধিক্য রোগ হ'তে পারে। জন্মগত পলিসিসটিক রোগে কারো কারো রক্তচাপাধিক্য নাও হ'তে পারে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই হ'য়ে থাকে।

বৃক্ক ধমনীর স্থায়ী সংকোচন (Renal artery Stenosis) :

বৃক্কের ধমনীর স্থায়ী সংকোচন, অ্যানিউরিজম, গঠন বিকৃতি যথা ধমনী
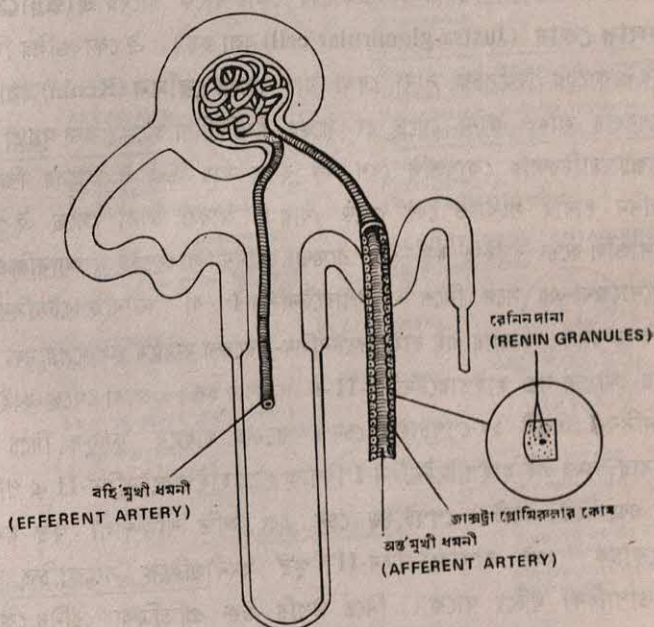
দেওয়াল গঠনে সংযোজক ও পেশী কলার মাত্রারিক্ত বৃদ্ধি এবং অ্যাথিরোমা রোগাক্রান্ত হ'য়ে রেনাল ধমনীর ভিতরের নালী সরু হয়ে যাওয়া প্রভৃতি

ক্ষেত্রে রক্তচাপাধিক্য রোগ হয়ে থাকে। শিরার মাধ্যমে পায়েলোগ্রাফি, আইসোটোপ রেনোগ্রাফি ও রেনাল অ্যানজিওগ্রাফি রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করবে।

বৃক্কের রোগ হ'লেই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় রক্তচাপাধিক্য রোগ এসে হাজির হয়েছে। অনেকেই বলেন এবং গবেষণার দ্বারা দেখা গেছে বৃক্কের রোগে পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটে থাকে (**chain reaction**) যার প্রতিক্রিয়ার জন্য রক্তচাপাধিক্য রোগের উৎপত্তি হয়। যে ঘটনা প্রবাহগুলি পর পর ঘটে থাকে তাদের **রেনিন হাইপারটেনসিন সিসটেম** বলা হ'য়ে থাকে।

রেনিন-হাইপারটেনসিন-সিসটেম (Renin Hypertensin System) **:** গবেষণার দ্বারা জানা গেছে বৃক্কের কর্টেক্স (**Renal cortex**) ও মেডালার (**Medulla**) সন্ধিস্থলে যে গ্লোমিরুলাসগুলি থাকে তাদের অ্যাফারেণ্ট ধমনীর টিউনিকা মিডিয়ায় এক প্রকারের কোষ থাকে যাদের **জাক্সট্রাগ্লোমিরুলার কোষ** (**Juxtra-glomirular cell**) বলা হয়। ঐ কোষগুলির ভিতরে এক প্রকারের উৎসেচক দানা দেখা যায় যাদের **রেনিন** (**Renin**) বলা হয়। গবেষণায় আরও জানা গেছে যে বৃক্কের ইসকিমিয়া হ'লে (রক্ত স্বল্পতা) ঐ জাক্সট্রাগ্লোমিরুলার কোষগুলি বেশ বড় হ'য়ে যায় এবং ঐ কোষের ভিতরের রেনিন দানার সংখ্যাও বেশ বেড়ে যায়। আরও জানা গেছে ঐ রেনিন দানাগুলি রক্তে বাহিত হয় এবং রক্তের রেনিন সাবসট্রেট (অ্যানজিওটেনসিনোজেন)-এর সঙ্গে মিশে হাইপারটেনসিন-**I** বা অ্যানজিওটেনসিন-**I**-এ পরিণত হয়। তারপর এই হাইপারটেনসিন-**I** রক্তের মাধ্যমে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে ঘুরে আসার পর হাইপারটেনসিন-**II**-এ পরিণত হয়। জানা গেছে হাইপারটেনসিন-**I** একটি ১০-পেপটাইড চেন। রক্তের মাধ্যমে ফুসফুস দিয়ে ঘুরে আসার সময় এই হাইপারটেনসিন-**I** বিপাক হ'য়ে হাইপারটেনসিন-**II** এ পরিণত হয় এবং এটি একটি ৮-পেপটাইড চেন এবং অতি শক্তিশালী ক্ষুদ্র ধমনীর সংকোচক। এই হাপারটেনসিন-**II** ক্ষুদ্র ধমনীগুলিকে সংকোচিত ক'রে রক্তচাপাধিক্য ঘটিয়ে থাকে। নিম্নে উপরি উক্ত প্রতিক্রিয়ায় রেনিন কোথায় কেমন ক'রে রক্তে আসে ছবির সাহায্যে দেখান হল **:**

CENTRALLY ACTING
clonidine
METHYLDOPA
Reserpine
Propranolol
BARORECEPTOR REFLEX
STIMULATOR
veratrum
GANGLION-BLOCKERS
Hexamethonium
Mecamylamine
Pentalinium
ADRENERGIC NEURON BLOCKERS
Guanethidine
CATECHOLAMINE DEPLETOR
Reserpine
β-ADRENERGIC BLOCKERS
Propranolol, Metoprolol, Labetalol
Timolol. Bevantolol. Bufuralol,
Butoxamine, sotalol, Tolamolol,
α-ADRENERGIC BLOCKERS
Prazosin
Phentolamine
Phenoxybenzamine
ALDOSTERONE ANTAGONISTS
Spironolactone
VASODILATORS
ARTERIAL VASODILATORS
Hydrallazine
Minoxidil
Diazoxide
Thiazides
ARTERIAL & VENOUS VASODILATORS
Prazosin
Sodium nitroprusside
Suprarenal gland
ANGIOTENSIN II BLOCKER
Saralasin
ALDOSTERONE
ANGIOTENSIN II
(8 PEPTITE CHAIN)
RETENTION
PASSAGE THROUGH LUNGS
PLASMA SUBSTRATE
INCREASE IN BLOOD VOLUME
ANGIOTENSIN I
(10 PEPTITE CHAIN)
RENAL PERFUSION PRESSURE
RENIN RELEASE
J.G. CELLS
RENIN BLOCKERS
β-Blockers
DIURETICS
Indapamide
Thiazides
Furosemide
Tienilic acid
Triamterene
Ethacrynic acid
Amiloride
ANGIOTENSINASE BLOCKER
Captopril

মহাধমনীর কোআর্কটেসন (Coarctation of Aorta) **:**

মহাধমনীর কোআর্কটেসন একটি জন্মগত রোগ। এই রোগে সাধারণত অ্যায়োটিক গোলার্দ্ধ (**Aortic arch**) থেকে বাম সাবক্লেভিয়ান ধমনী ওঠার পরই, অ্যায়োটিক গোলার্দ্ধ ও নিম্নগামী বক্ষীয় মহাধমনীর সংযোগস্থলে জন্মগত ত্রুটির জন্য ঘটির গলার মত সংকীর্ণ থাকতে দেখা যায় যার ফলে রক্ত নিম্নগামী হওয়ার পথে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং মাথা ও বাহুর দিকে রক্ত বেশি চাপে সঞ্চালিত হয়। এর ফলে বাহুর রক্তচাপ বেশি ও পায়ের রক্তচাপ কম থাকে। ছেলেবেলায় অপারেশন করে কোঁচকান জায়গাটা কেটে ফেলে দিয়ে উপর-নিচু জুড়ে না দিলে হার্ট ফেলিওর থেকে রক্ষা পাওয়া খুবই কঠিন।

প্রি-এক্লামসিয়া ও এক্লামসিয়া (Pre-eclamsia and Eclampsia) **:**

এটি একটি বিশেষ ধরণের রোগ যা সন্তান-সম্ভবা মায়েদের গর্ভধারনের শেষ তিন মাসে কখনও কখনও ঘটতে দেখা যায়। প্রথম সন্তান-সম্ভবা মায়েদেরই এই রোগ বেশি হ'য়ে থাকে। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বা পরের সন্তানের বেলাও হ'তে পারে।

প্রথম প্রথম তিনটি প্রধান লক্ষণ যথা পা ফোলা, প্রস্রাবে অ্যালবুমিন ও রক্তচাপ বৃদ্ধি (লক্ষণ ত্রয়ী) দেখা যায়। এই অবস্থায় চিকিৎসা করলে অনেকে সেরে যান।

উপরি উক্ত অবস্থা সেরে না গেলে বা চিকিৎসা না করলে রোগটি বাড়তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা, গা বমি বমি ভাব, বমি ও ঝিমুনি ভাব হ'য়ে থাকে। এই অবস্থাকে **প্রি-এক্লামসিয়া** বলা হয়।

প্রি-এক্লামসিয়া অবস্থা চলতে চলতে হঠাৎ রোগীর হাত-পা খেঁচতে থাকে, মুখ থেকে গাঁজলা বেরুতে থাকে এবং রোগী অনেক সময়ই অজ্ঞান হ'য়ে যায়। খেঁচুনি বা ফিটের আক্রমণ হ'লেই ঐ অবস্থাকে **এক্লামসিয়া** বলে।

এর পরের অবস্থায় উপসর্গ হিসাবে মস্তিস্কের ধমনী ছিঁড়ে যেতে পারে, বৃক্কের কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে (**Renal failure**) এবং বাম ও দক্ষিণ দিকের হার্ট ফেলিওরও হ'তে পারে। রক্তচাপ খুব বেশি থাকলে সন্তান নষ্টের সম্ভাবনাও খুব বেশি থাকে।

প্রি-এক্লামসিয়া ও এক্লামসিয়া কেবল মাত্র সন্তান সম্ভবা জননীদেরই হ'য়ে থাকে। কেন বা কি কারণে এই রোগ কেবলমাত্র সন্তানসম্ভবা মায়েদেরই আক্রমণ করে তা আজও সঠিকভাবে জানা যায় নাই।

চিকিৎসা ঃ চিকিৎসা হাসপাতালে হওয়াই বাঞ্ছনীয় কারণ যখন যেমন অবস্থা হবে সেইমত ব্যবস্থা হাসপাতালে হওয়াই সম্ভব। একটি বিষয় খুবই স্পষ্ট যে সন্তান প্রসব হ'য়ে গেলেই রোগের উপশম হ'য়ে থাকে। তাই চিকিৎসায় ফল না হ'লে যে কোন উপায়েই প্রসব করিয়ে দিতে হবে। এখন এইসব ক্ষেত্রে সিজেরিয়েন অপারেশন করে সন্তান প্রসব করিয়ে দেওয়া হ'য়ে থাকে।

ঔষধের দ্বারা চিকিৎসা সাধারণতঃ প্রথমের দিকে ফলপ্রসূ হ'য়ে থাকে। প্রি-এক্লামসিয়ার লক্ষণ দেখার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে। নুন খাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রাখতে হবে ও ঔষধ দ্বারা রক্ত চাপাধিক্যকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে।

রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য মিথাইলডোপা (Amedo) ঔষধ সব থেকে উৎকৃষ্ট বলে অনেকেই মনে করেন, কারণ এই ঔষধের উপসর্গ বা প্রতিক্রিয়া অন্যান্য ঔষধ যথা প্রস্রাব কারক ঔষধ (Thiazides), ও বেটা অ্যাড্রিনার্জিক ব্লকিং ঔষধ অপেক্ষা অনেক কম। আগেই বলা হয়েছে ঔষধে কাজ না হ'লে গর্ভাবস্থার অবসান ঘটান একান্ত দরকার।

নূতন পরযাইরিয়া, মস্তিষ্কের টিউমার ও বালবার পলিওমায়লাইটিস ঃ

ঐ সমস্ত রোগের ক্ষেত্রে রক্তচাপাধিক্য লক্ষণ হিসাবে থাকে কিন্তু অন্য লক্ষণগুলি এতই প্রবল থাকে এবং চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা এতই নৈরাশ্যজনক যে ঔষধ ব্যবহারের সুযোগ প্রায় থাকেই না।

প্রাথমিক অ্যালডসটেরোনিজম (Primary Aldosteronism) ঃ

এই রোগ কন্‌স সিড্রোম (Conn's syndrome) নামেও পরিচিত। এড্রিনেল গ্রন্থির কর্টেক্সের টিউমার (Tumour of Adrenal Cortex) হওয়ার দরুণ অত্যধিক অ্যালডেসটেরোন হরমোণ ক্ষরণের জন্য এই রোগ হ'য়ে থাকে। [illegible]রা জানি এড্রিনেল গ্রন্থি কর্টেক্সের গঠনে তিনটি বিভিন্ন কোষস্তর থাকে[illegible] (বাহির থেকে ভিতর দিকে) স্ট্রেটাম গ্লোমিরিউলোসা, স্ট্রেটাম ফ্যাসিকিউ[illegible] ও স্ট্রেটাম রেটিকুলারিস। এই কোষ স্তরগুলির মধ্যে স্ট্রেটাম গ্লোমিরিউলোসা[illegible] থেকে অ্যালডেসটেরোন হরমোণ ক্ষরিত হয়। আমরা আরও জানি অ[illegible] ডেসটেরোন বৃক্কের প্রান্তীয় কনভলিউটেড টিবিউল-এর (Secondary c[illegible]

voluted tubule) উপর কাজ করে এবং ঐ টিবিউলের জলীয় পদার্থ থেকে সোডিয়াম টেনে নিয়ে রক্তে সঞ্চালন করে এবং রক্ত থেকে পটাসিয়াম টেনে নিয়ে টিবিউলের জলীয় পদার্থে ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ শরীরে সোডিয়ামের সঞ্চয় বাড়ে ও পটাসিয়ামের সঞ্চয় কমে যায়।
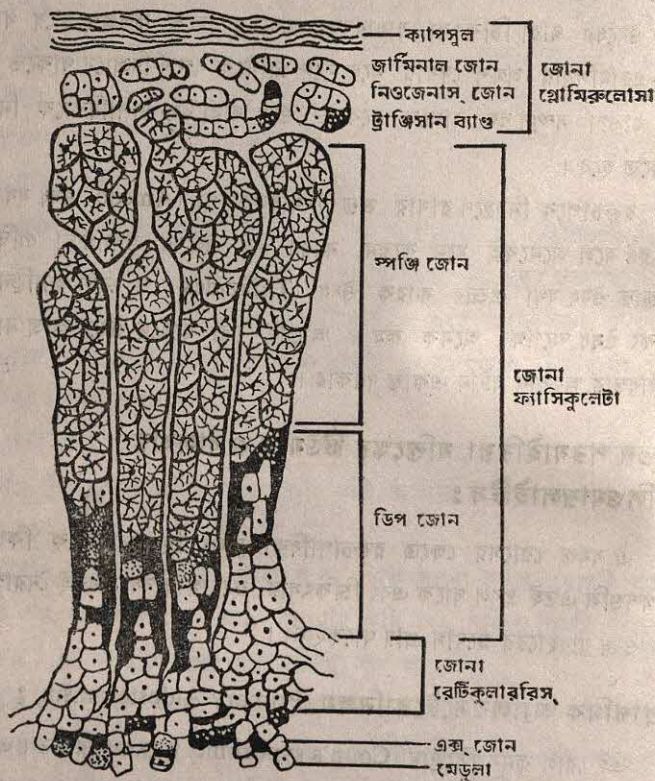
যে হেতু অ্যালডেসটেরোন বৃক্কের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে শরীরে সোডিয়ামের সঞ্চয় বাড়িয়ে দেয় সেজন্য এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সোডিয়াম আধিক্যজনিত লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে যথা হাইপোক্যালিমিয়া (**Hypo-kalaemia**), রক্তচাপাধিক্য (**Hypertension**) ও শরীরের টিস্যুতে জলীয় পদার্থের আধিক্য দেখা যায় যেমন হাত, পা, মুখ ইত্যাদি জায়গা ফুলে যায়।

রোগ নির্ণয়ঃ এই সমস্ত ক্ষেত্রে রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে রক্তে

পটাসিয়ামের স্বল্পতা, সোডিয়ামের আধিক্য ও ক্লোরাইডের স্বল্পতা। প্রস্রাবে অতিরিক্ত পটাসিয়ামের ক্ষয় আর একটি প্রধান লক্ষণ।

চিকিৎসা ঃ এই সমস্ত রোগীদের অধিক মাত্রায় অ্যালডেসটেরোন প্রতি-রোধক ঔষধ যথা অ্যালডেকটোন (**Spiranolactone**) ব্যবহার করলে যদি সুফল পাওয়া যায় অর্থাৎ যদি রক্ত চাপাধিক্য কমে যায় সে ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় সহজ হ'য়ে যায়। রোগ নির্ণয় ঠিক হয়ে গেলে শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে এড্রিনেল গ্রন্থির টিউমার কেটে ফেলে দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে।

ফিয়ো ক্রোমোসাইটোমা

এই রোগ ক্রোমাফিন টিস্যুর টিউমার জনিত হয়ে থাকে এবং এড্রিনাল গ্রন্থি বা অন্য জায়গার ক্রোমাফিন টিস্যুতে এই রোগ আক্রমণ করে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই জাতীয় উপবৃদ্ধি বা টিউমার সাধারণ উপবৃদ্ধি (**Benigu Tumour**)। কেবলমাত্র শতকরা ৫ ভাগ রোগীদের ক্ষেত্রে এই টিউমারগুলি ম্যালিগনাণ্ট হয়ে থাকে।

এই টিউমারগুলি নরএড্রিনেলিন (**Noradrenaline**) ও এড্রিনেলিন অধিক মাত্রায় ক্ষরণ করে থাকে এবং এরই জন্য রক্তচাপাধিক্য হ'য়ে থাকে।

এইসব রোগীদের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে হঠাৎ ক'রে রক্তচাপ বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আবার স্থায়ীভাবেও এই সব রোগী রক্ত চাপাধিক্যে ভুগতে পারে। যখন হঠাৎ ক'রে এই রোগের আক্রমণ হয় তখন রোগী—দু-দিকেরই মাথার অসহ্য যন্ত্রণা, সঙ্গে সঙ্গে ঘাম, বুক ধরফরানি—অনুযোগ করতে থাকে। এই সময়ে রোগীকে দেখলে—মুখের চেহারা ফ্যাকাসে দেখায়। অনেক সময় ভুল ক'রে এইরূপ অবস্থাকে উদ্বায়ু (**Neurotic**) রোগ বলে অবহেলা করা হ'য়ে থাকে কারণ এইরূপ লক্ষণগুলি স্বল্পস্থায়ী—কয়েক মিনিট থেকে প্রায় এক ঘণ্টা মাত্র থাকতে পারে।

যে সব ক্ষেত্রে রক্তচাপ বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে থাকে সেই সব রোগীর ক্ষেত্রে গুরুতর রক্তচাপাধিক্যের যে সব লক্ষণ পাওয়া যায় তাই বর্তমান থাকে। অতিরিক্ত এড্রিনেলিন ক্ষরণের জন্য এইসব রোগী অত্যধিক বিপাকীয় প্রতিক্রিয়ার শিকার হয়ে থাকে যার ফলে তাদের শরীর ক্রমশঃ রোগা হ'তে থাকে।

রোগ নির্ণয় ঃ বারে বারে প্রথমোক্ত ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি, এবং স্থায়ী রক্ত চাপাধিক্যের ক্ষেত্রে, রোগী এই রোগে (ফিয়ো ক্রমোসাইটোমা) ভুগছে

কিনা তা চিন্তা করতে হবে। এই সব রোগীর প্রস্রাবে মোট মেটানেফ্রিণ (Metanephrines) অথবা ভ্যানিলিলম্যানডেলিক এসিড (Vanillylmandelic Acid বা সংক্ষেপে VMA) যদি বেশি থাকে তখন বুঝতে হবে রোগী ফিয়োক্রোমোসাইটোমা রোগে ভুগছে। অবশ্য এই পরীক্ষা করার আগে রোগী রিসারপাইন (reserpine), মিথাইলডোপা (Methyldopa), বহুমুখী কার্য্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক (Broad Spectrum Antibiotic), গোয়ানেথিডিন (Guanethidine) ও ফেনোথায়াজাইন (Phenothiazines) ঔষধ ব্যবহার করেনি এ বিষয়ে নিশ্চিত হ'তে হবে। রক্তে ক্যাটিকোলামাইনের (Catecolamine assay) পরিমাণ জানতে পারার সুযোগ থাকলে রোগ নির্ণয় আরও সহজতর হ'তে পারে।

চিকিৎসা : শল্য চিকিৎসাই এই রোগ নিরাময়ে প্রকৃষ্ট পন্থা। উপযুক্ত অজ্ঞানকারী চিকিৎসক এবং বিশিষ্ট ফিজিসিয়েন সকলের মিলিত প্রয়াসে অপারেশন কার্য্য সম্পন্ন করলে ফলাফল ভালই হতে পারে। রক্ত চাপাধিক্য যতটা সম্ভব বিটা ও আলফা এড্রিনার্জিক ব্লকার ঔষধ যথা লেবেটালোল (Labetalal) দ্বারা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

কুসিংস সিনড্রোম :

কুসিংস সিনড্রোম কতকগুলি লক্ষণের সমষ্টি। রক্তচাপাধিক্য (শতকরা ৮০ ভাগের ক্ষেত্রে), পেশীর দুর্বলতা, অস্টিওস্পোরোসিস, পাছায় অত্যধিক চর্বি জমে যাওয়া, কাঁধের উপর থেকে ঘাড়ের নিচে পর্য্যন্ত অত্যধিক চর্বি জমে থাকা (Buffalo hump), গোলাকৃতি মুখাবয়ব (Moon facies), রক্তে চিনি বেশি (Diabetes) থাকা এবং চামড়ায় রক্ত-বেগুনি রেখার আবির্ভাব এবং গায়ে অত্যধিক চুল (Hersutism)—এই লক্ষণ সমষ্টিকে কুসিংস সিনড্রোম বলে। মহিলারাই এইরোগে বেশি ভোগেন এবং সাধারণতঃ এরা খুবই মোটা হ'য়ে থাকেন।

এই সিনড্রোম শরীরে কর্টিসল (Cortisol) হরমোন বেশি থাকার জন্য হয়ে থাকে। এড্রিনেল কর্টেক্সের ফ্যাসিকুলার স্তর (Zona fasciculate) থেকে নির্গত হয়ে থাকে এই কর্টিসল হরমোন। এড্রিনেল কর্টেক্সের টিউমার, কোষ বৃদ্ধি বা পিটুইটারি গ্রন্থির ক্রোমোফোব কোষের টিউমার হ'লে এই সিনড্রোম হয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয় : তিনটি প্রধান লক্ষণ যথা (১) রক্তচাপাধিক্য, (২) ডায়াবিটিস মেলাইটাস এবং (৩) পাছার উপর চর্বির আধিক্য এই রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। ডেক্সামেথাসোন সাপ্রেসন (Dexamethasone Suppression) টেষ্ট দ্বারা এই রোগের উপস্থিতি বোঝা যায়।

চিকিৎসা : কারণ অনুযায়ী শল্য চিকিৎসা দরকার। অর্থাৎ টিউমার থাকলে উভয় এড্রিনেল গ্রন্থির শল্য চিকিৎসার দ্বারা অপসারণ, পিটুইটারি টিউমার থাকলে তার অপসারণ বা পিটুইটারি গ্রন্থির উপর রঞ্জন রশ্মি প্রয়োগ দ্বারাও অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়।

হাইপারথাইরয়ডিজম (Hyperthyroidism) :

থাইরয়ড গ্রন্থির থাইরক্সিন হরমোন অতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য কতকগুলি লক্ষণ দেখা যায়। সেই লক্ষণগুলিকে সমষ্টিগতভাবে নামকরণের মাধ্যমে পরিচিত করা হয়েছে একটি নাম দিয়ে যাকে **হাইপারথাইরয়ডিজম** রোগ বলা হয়। লক্ষণগুলি নিম্নে সংক্ষেপে বিবৃত হইল :

(১) বুক ধরফর করা, অল্প প্রয়াসে ক্লান্তি, সর্ব শরীরে গরম ভাবের অনুভূতি অথচ ঘামের জন্য হাত-পা ভিজে ভিজে থাকা, সামান্য গরম আবহাওয়ায় অস্থিরতা, মানসিক উত্তেজনা, শ্বাস কষ্ট, হাত-পা কাঁপা (Tremor), অত্যধিক ক্ষুধা, আহারও বেশি কিন্তু ওজন ক্রমশঃ কমে যাওয়া, বেশি প্রস্রাব, মেয়েদের ক্ষেত্রে মাসিকের গোলমাল, তুচ্ছ কারণে রেগে যাওয়া ইত্যাদি রোগীর অনুযোগ থাকে।

(২) রক্ত চাপাধিক্য (High blood pressure)—বিশেষ ক'রে সিস্টোলিক চাপ। কিন্তু শিথিলতা চাপ (Diastolic Pressure) স্বাভাবিক থাকে।

(৩) চোখ দুটি খুব বড় বড় দেখায়, কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয় চোখ দুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে (Exopthalmos)। রোগীকে কানের দিকে চোখ ঘোরাতে বললে ঠিকমত ঘোরাতে অক্ষমতা (Paresis of External rectus muscle of eye ball) প্রভৃতি লক্ষণগুলি এই রোগে **চোখের বিশেষ লক্ষণ**।

(৪) হৃৎপিণ্ড গতি বেশি, স্বাভাবিক অবস্থায়, ১০০ বিট প্রতি মিনিটে বা আরও বেশি এবং ঘুমের সময়ও এই বর্দ্ধিত হৃৎপিণ্ড গতি দেখা যায়।

(৫) শরীরে বিপাকীয় ক্রিয়া (Metabolism) বেশি হওয়ার দরুণ বেসাল (Basal) মেটাবলিক রেট (BMR) বেশি হ'য়ে থাকে।

(৬) হৃৎপিণ্ড বড় হ'য়ে যায় এবং রোগী অনেকদিন থেকে ভুগতে থাকলে রাইট হার্ট কিম্বা লেফট হার্ট ফেলিওর হ'তে পারে।

(৭) ইসিজি-তে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না।

(৮) এক্সরেতেও প্রথম দিকে বিশেষ কিছু না-পাওয়াও যেতে পারে।

রোগ নির্ণয়ঃ উপরি উক্ত লক্ষণগুলি থাকলে রোগ নির্ণয়ে বিশেষ অসুবিধা হয় না। কিন্তু শুধুই যদি লক্ষণগুলি রক্তচলাচল তন্ত্রের উপর নিবদ্ধ থাকে সে সব ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয় কঠিন হয়ে থাকে। সাইনাস ট্যাকিকার্ডিয়া, অরিকুলার ফ্লাটার বা ফিব্রিলেসন থাকলে হাইপারথাইরয়ডিজম সন্দেহ করা যেতে পারে, বিশেষ করে যখন হৃৎপিণ্ডের অন্য কোন রোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। হার্ট ফেলিওরও হ'তে পারে এবং এ ক্ষেত্রেও হার্ট ফেলিওরের যদি সুনির্দিষ্ট কারণ খুঁজে না পাওয়া যায় তখন হাইপারথাইরয়ডিজিমের কথা চিন্তা করা উচিত।

রক্তে থাইরক্সিনের আধিক্য, প্রোটিন-বাউণ্ড আইডিনের (**PBI**) আধিক্য কিম্বা থাইরয়ড গ্রন্থির অধিক মাত্রায় আইডিন গ্রহণ শক্তি বৃদ্ধি (**Incrcased uptake of Iodine I-131**) হ'লে হাইপারথাইরয়ডিজম হয়েছে এটা সঠিকভাবে বলা যেতে পারে।

চিকিৎসাঃ হাইপারথাইরয়ডিজেমের চিকিৎসা রক্ষণশীল উপায়ে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা করা হ'য়ে থাকে এবং এর জন্য অ্যান্টিথায়রয়ড ঔষধ যথা কারবিমাজোল (**Carbimazole**), প্রপাইলথায়োইউরেসিল (**propylthiouracil**) ও রেডিও আইডিন ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া যায়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায় না সে সব ক্ষেত্রে আংশিকভাবে থাইরয়ড গ্রন্থি কেটে (**Partial Thyroidectomy**) ফেলে দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে থাকে।

বুক ধরফরানি আয়ত্বে আনার জন্য প্রোপানোলোল ঔষধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

কতিপয় ঔষধের প্রতিক্রিয়াঃ

কতকগুলি ঔষধ ক্রমাগত স্থায়ীভাবে ব্যবহার করলে রক্তচাপিক্য হ'তে দেখা যায় যা আগেই বলা হয়েছে। এখন আমরা ঐ ঔষধগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করবার চেষ্টা করব:

জন্মে নিরোধক বটিকা (**Contraceptive pills**) **:** "ছোট পরিবার—সুখী পরিবার" এই পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনায় অনেক মায়েরাই আজকাল জন্ম নিরোধক পিল ব্যবহার করছেন। এটা ভালভাবেই আমরা জেনে গেছি যে জন্ম নিরোধক পিল বরাবর ব্যবহার করলে রক্তচাপাধিক্য ঘটতে পারে। তবে আক্রান্ত মায়েদের সংখ্যা এমন নয়, যে কারণে এই পিল ব্যবহার করা একেবারেই অনুচিত হবে। যাদের রক্তচাপাধিক্য রয়েছে বা বংশগতির ইতিহাসে রক্ত-চাপাধিক্যের প্রবণতা খুব বেশি তাদের পিল ব্যবহার না ক'রে অন্য রকমের জন্মনিরোধক ব্যবস্থা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে এই পিল ব্যবহারের দরুণ ম্যালিগনাণ্ট হাইপারটেনসন হ'তেও দেখা গেছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বৃক্কের বায়পসি (**Biopsy**) করে দেখলে দেখা যাবে যে বৃক্ক ধমনী (**Renal Artery**) বিকারগ্রস্থ হয়ে রয়েছে যেমন ধমনীগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাসের সংকীর্ণতা, আকার-প্রকারে অসমতা ও মাইক্রো-থ্রমবাই-এর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যাবে। রক্তের মধ্যে অধিক মাত্রায় অ্যালডেসটেরোণ ও অ্যানজিওটেনসিন ও থাকতে দেখা গেছে।

যে সমস্ত মায়েদের রক্তচাপ স্বাভাবিক ও জন্ম নিরোধক পিল ব্যবহার করছেন তাঁদের ক্ষেত্রে জন্মনিরোধক পিল ব্যবহারে কোন বাধা নাই কিন্তু তাঁদের মাঝে মাঝে রক্তচাপ পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া উচিত এবং এক-বছর, দু-বছর অন্তর অন্তর রক্তে কোলেস্টেরল ও ইউরিয়ার পরিমানগত অবস্থা দেখিয়ে নেওয়া উচিত এবং মাঝে মাঝে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে।

এ-সি-টিএইচ (ACTH), কর্টিকোস্টেরয়ড (Corticosteroid) লিকরিস ও রক্তবাহ সংকোচক নাকের ঔষধ : উপরি উক্ত ঔষধগুলি ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া ব্যবহার করা উচিৎ নয় কারণ এই সমস্ত ঔষধের প্রতিক্রিয়ায় রক্তচাপাধিক্য ও অন্যান্য উপসর্গ শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

মস্তিষ্ক ও মানসিক বিকারের ভূমিকা : কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রমাগত পারিপার্শ্বিক উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে স্বল্পস্থায়ী থেকে দীর্ঘস্থায়ী রক্তচাপাধিক্য হ'তে পারে। সাধারণতঃ সাময়িক উত্তেজনা মূহুর্তে হঠাৎ ক'রে যেমন রক্তচাপ বেড়ে যায়, উত্তেজনা প্রশমনে আবার আস্তে আস্তে রক্তচাপ স্বাভাবিক হ'য়ে যায়।

মনরোগে আক্রান্ত রোগীদের রক্তচাপাধিক্যের উপর কোন প্রভাব থাকতে

দেখা যায় না। কোন কোন সূত্র থেকে জানা যায়, যে সব ক্ষেত্রে মানসিক বিকার জনিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ হয় না সে সব ক্ষেত্রে রক্তচাপাধিক্য হ'তে পারে। মনের প্রতিক্রিয়া ও রক্তচাপাধিক্যের প্রতিক্রিয়ার অধিযন্ত্রবাদ সম্বন্ধে অনেকের ধারণা কেন্দ্রীয় মস্তিষ্কের বহির্মুখী নার্ভ বিভব সিমপ্যাথিটিকের বহির্মুখী নার্ভ বিভবের মাধ্যমে রক্তচাপাধিক্য ঘটিয়ে থাকে বা ব্যারোরিফ্লেক্সকে দমিত করে রক্তচাপাধিক্য ঘটিয়ে থাকে। গবেষণার দ্বারা দেখা গেছে হাইপোথ্যালামাসে ডিফেন্স এরিয়াকে উত্তেজিত করলে সমস্ত রিফ্লেক্স বন্ধ হ'য়ে যায় ও রক্তচাপাধিক্য ঘটে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যোগ অভ্যাসে মানসিক চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটাতে পারলে রক্তচাপাধিক্য কম হ'য়ে যায়। তবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বিশেষ কোন তথ্য আজও সংগঠিত হয় নাই।

প্রাথমিক বা এসেনসিয়েল রক্তচাপাধিক্য (Primary or Essential Hypertension)

প্রাথমিক বা এসেনসিয়েল রক্তচাপাধিক্যের কোন সুনির্দিষ্ট কারণ আজও আমরা জানতে পারিনি। তবে কিছু কিছু পারিপার্শ্বিক ঘটনা পর্যালোচনা করলে কিছু কিছু তথ্যনির্ভর বিষয়কে কারণ রূপে অনেকেই চিহ্নিত করে থাকেন, নিম্নে ঐ বিষয়গুলি সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে :

প্রাথমিক রক্তচাপাধিক্য একটি জিন ঘটিত রোগ :

হাইপারটেনসিভ রোগীদের পারিবারিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—একই পরিবারের লোকেদের ও জ্ঞাতিগোষ্ঠিদের মধ্যে রক্তচাপাধিক্য রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি সংখ্যায় হয়ে থাকে।

১৯৬৭-এর দশকে প্ল্যাট (Platt) নামক একজন গবেষক উপরি উক্ত ঘটনা প্রবাহের ভিত্তিতে বলেছিলেন—এসেনসিয়েল হাইপারটেনসন একটি বংশগতিক রোগ এবং **এই রোগ বংশগতি প্রবাহে একটি ডোমিনেন্ট জিন দ্বারা সংঘটিত হয়।** কেউ কেউ আবার বলে থাকেন—একটি জিন নয় অনেকগুলি জিন মিলিত ভাবে এই রোগ ঘটিয়ে থাকে। বর্তমানে মোজেক (Mosaic) কনসেপ্ট-এর প্রাধান্য বেশি তথ্য নির্ভর বলে ধারণা করা হচ্ছে। অর্থাৎ এদের মতে **এসেনসিয়েল হাইপারটেনসন বহু জিন ঘটিত একটি বংশগতিক রোগ :**

অধিক মাত্রায় লবণ (Sodium Chloride) গ্রহণ :

সোডিয়াম গ্রহণের সঙ্গে রক্তচাপের সম্বন্ধ আছে কি-নাই, এই নিয়ে মত দ্বৈধতা আছে। যারা এই লবণ সূত্রের প্রবক্তা তারা বলেন, লবণ গ্রহণের সঙ্গে রক্তচাপের প্রবল সম্বন্ধ রয়েছে এবং রক্তচাপাধিক্যের যাবতীয় উপসর্গ যথা কার্ডিয়াক ইসকিমিয়া, স্ট্রোক ইত্যাদি এই লবণ গ্রহণের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত। তারা উদাহরণ স্বরূপ বলেন জাপানের লোকেরা অধিক মাত্রায় মাছ (মাছে সোডিয়াম বেশি মাত্রায় থাকে) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার ক'রে থাকে এবং দেখা যায় যে জাপানীদের গড় রক্তচাপাধিক্য রোগের সংখ্যা বেশি। আমরা আরও জানি রক্তচাপাধিক্যের জন্য ধমনীর ক্ষয়-ক্ষতি সেই সব জায়গায় বেশি ঘটতে দেখা যায় যেখানে সফ্‌ট জল (**Soft water**) পানীয় হিসাবে সরবরাহ করা হ'য়ে থাকে কারণ সফ্‌ট জলে মিশ্রিত খনিজ পদার্থ যথা সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রণ থাকে। হার্ড জলে অপেক্ষাকৃত ক্যালসিয়ামের আধিক্য দেখা যায়। তবে কেমন ক'রে এইরূপ প্রতিক্রিয়া হ'য়ে থাকে তার অধিযন্ত্রবাদ (**Mechanism**) সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

কেউ কেউ আবার লবণ সূত্র মানতে চান না। তাঁরা বলতে চান সোডিয়াম গ্রহণ ও তার নিষ্কাশন সহজেই পরিমাপ করা যায় এবং তাঁদের মত হ'ল, জনগোষ্টির রক্তচাপের উপর লবণের কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। তাঁরা বলতে চান, একই পরিবারে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একই প্রকার খাদ্য গ্রহণ করে থাকেন এবং তাদের মধ্যে উভয়ের একই প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

সাম্প্রতিক কালে **গথেনবাড়গের** (Gothenburg) **গবেষণা** থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে সোডিয়াম নিষ্কাশনের উপর রক্তচাপের দুর্বল নেতিবাচক সম্বন্ধ রয়েছে। তাই রক্তচাপের উপর সোডিয়ামের সম্পর্ক আজও জটিলতার অবরণে আবদ্ধ রয়েছে। তাই রক্তচাপের উপর সোডিয়ামের সম্পর্ক আজও জটিলতার আবরণে অবদ্ধ রয়েছে কারণ রক্তচাপাধিক্যে সোডিয়াম গ্রহণ ও সোডিয়ামের নিষ্কাশনের মধ্যে যে তফাৎ দেখা যায় তা সোডিয়াম বেশি গ্রহণের জন্য না রক্তচাপাধিক্যের জন্য তা আজও সঠিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি।

উপরিউক্ত গবেষণা, ও বিভিন্ন সূত্র, লবণ গ্রহণের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বলিষ্ট নির্দেশ দিতে না পারলেও রক্তচাপাধিক্যে ও হৃদরোগে লবণের ব্যবহার সংকোচিতই রয়েছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে লবণ ব্যবহারে কৃচ্ছতায় সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

ব্যারোসেপ্টার প্রতিবর্ত শক্তির হ্রাস (Diminished Baroreflex Sensitivity) **ঃ**

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং দীর্ঘকাল ধরে রক্তচাপাধিক্যের প্রভাবে ব্যারোসেপ্টারদের উত্তেজিত হওয়ার শক্তি কমে যায় তাই হৃৎপিণ্ড গতি ও রক্তচাপ যখন বেড়ে যায় তখন তারা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড গতি বা রক্তচাপাধিক্যকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয় না। অর্থাৎ ব্যারোসেপ্টারগুলি রিসেট (Reset) হ'য়ে যায় অর্থাৎ হৃদগতি ও রক্তচাপ বৃদ্ধি—ঐ রিসেপটগুলির গা-সওয়া হয়ে যায় কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না।

রক্তে রাসায়নিক পদার্থের পরিমাণগত তারতম্য ও রক্তচাপাধিক্য ঃ

কোন কোন পর্য্যবেক্ষক মনে করেন রক্তে ক্যাটিকোলামিনের আধিক্য হওয়ার জন্য প্রাথমিক রক্তচাপাধিক্য হ'য়ে থাকে। আবার কেউ কেউ মনে করেন রিসেপ্টারগুলি অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার জন্য রক্তচাপাধিক্য হয়ে থাকে। রেনিন-অ্যানজিওটেনসিন প্রতিক্রিয়া সম্ভাব্য রক্তচাপাধিক্যের কারণ একথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। প্রসটাগ্লানডিন নিয়েও অনেক কাজকর্ম চল্ছে তবে এখনও এ বিষয়ে সঠিক কোন আলোকপাতের রেখা দেখা যাচ্ছে না। তবে অনেকে মনে করেন এক্লামসিয়া রোগে যে রক্তচাপাধিক্য হয় তা লিপিড বিপাকে বিশৃঙ্খলার জন্য ঘটে থাকে[১]। তাঁরা বলতে চান লিপিডবিপাকে বিশৃঙ্খলার জন্য প্রসটাগ্ল্যানডিন সৃষ্ট পরিমিত হ'তে পারে না যার ফলে অ্যানজিওটেনসিন-II রক্তে অধিক মাত্রায় থেকে যায় এবং রক্তচাপাধিক্য ঘটিয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় প্রসটাগ্ল্যানডিন অ্যানজিওটেনসিন-II কে দমিত রাখে।

উপরিউক্ত বিভিন্ন আলোচনা থেকে এই কথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে এসেনসিয়েল হাইপারটেনসন কোন একটি নির্দিষ্ট কারণের জন্য সংঘটিত হয় না। জানিত, অজানিত বহু কারণ সমষ্টি এই রোগ সৃষ্টির জন্য দায়ী, যাদের কিছু কিছু আমরা চিহ্নিত করতে পেরেছি কিন্তু নির্দিষ্টভাবে প্রামানিক তথ্য আজও আমরা জানতে পারি নাই।

১। D. C. Dutta, Text Book of obstetrics, Central Educational Enterprizes, Calcutta, First Edt. 1983.

রক্তচাপাধিক্যের বিকারতত্ব
(Pathology of Hypertension)

রক্তচাপাধিক্যের জন্য বিকারত্ব, হৃৎপিণ্ড ও ধমনী উভয়ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত হ'তে দেখা যায়। দুটি পর্যায়ে বিকারত্বকে ভাগ করা হ'য়ে থাকে, প্রথম ও দ্বিতীয়। প্রথম পর্যায়ে যে সমস্ত পরিবর্তন দেখা যায় সেগুলিকে **অভিযোজিত পরিবর্তন** (Adaptive changes) বলা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে সমস্ত পরিবর্তন দেখা যায় সেগুলিকে **বিনষ্টকারী ক্ষয়শীল পরিবর্তন (Degeneretive changes)** বলা হয় এবং এই পরিবর্তনে ধমনী দেওয়ালের গঠন প্রকৃতিতে বিকারত্ব দেখা যায়।

অভিযোজিত পরিবর্তন (Adaptive changes)

হৃৎপিণ্ড : রক্তচাপাধিক্যের গোড়ার দিকে হৃৎপিণ্ডে বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। রোগীকে পরীক্ষা করে, এক্সরে ও ইসিজি করেও কিছু পাওয়া যায় না। দীর্ঘদিন ধরে এই অবস্থা চলতে থাকে কিন্তু চাপে কাজ করতে করতে আস্তে আস্তে বাম নিলয় বড় (**Hypertrophy**) হয়ে যায়। হৃৎপিণ্ডের ওজন বেড়ে যায়, প্রতিটি হৃৎপিণ্ড কোষ বড় হ'য়ে যায় এবং এই কোষগুলির আয়তন বৃদ্ধির জন্যই হার্টের আয়তনও বেড়ে যায়। এই পরিবর্তন অস্থায়ী হতে পারে আবার স্থায়ী হয়ে আরও অবনতির দিকে অগ্রসব হ'তে পারে। রক্তচাপকে যদি চিকিৎসার দ্বারা কমিয়ে রাখা যায় হৃৎপিণ্ড আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে অর্থাৎ উপরিউক্ত অবস্থা পরিবর্তনশীল।

ধমনী : হৃৎপিণ্ডের মত ধমনীগুলিও শাখা-প্রশাখাসহ, বিশেষ ক'রে ধমনিকাগুলি, অভিযোজিত পরিবর্তনের (**Adaptive changes**) সামিল হ'য়ে থাকে। ছোট ছোট ধমনীর বা ধমনিকার টিউনিকা মিডিয়া বা পেশী স্তরটি বেশি চাপে কাজ করতে করতে হৃৎপিণ্ডের মতই পুরু হয়ে যায় কারণ এক্ষেত্রেও প্রতিটি পেশী কোষের আয়তন বেড়ে যায়। ছোট ধমনীর ক্ষেত্রে তাদের দেওয়াল সামান্যতম পুরু হ'য়ে গেলেও তার প্রতিক্রিয়া গুরুতর হ'য়ে থাকে কারণ প্রান্তীয় বাধা বহুলাংশে বেড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপও বেড়ে যায়।

বিনষ্টকারী ক্ষয়শীল পরিবর্তন (Degenerative Changes) :

রক্তচাপাধিক্য অবনমিত না হ'য়ে বৃদ্ধির পথে এগিয়ে চললে অভিযোজিত পরিবর্তনের পর হৃৎপিণ্ড ও ধমনী উভয়েই ক্ষয়-ক্ষতির সামিল হ'য়ে থাকে। নিম্নে পরিবর্তনগুলি আলাদা আলাদাভাবে দেওয়া হইল :

হৃৎপিণ্ড : অতিযোজিত পরিবর্তন চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় না হ'লে বা বহুদিন ধরে রক্তচাপাধিক্য চলতে থাকলে হৃৎপিণ্ডের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয় তা তিন প্রকারে প্রকাশ পেতে দেখা যায় যা নিম্নে বিবৃত হইল :

(১) **হৃৎপিণ্ড কোষাবয়ব বৃদ্ধিজনিত পরিবর্তন :** আগেই বলা হয়েছে অভিযোজিত পরিবর্তনে প্রতিটি হৃৎপিণ্ড কোষ বেশ বড় আকারের হ'য়ে যায়। আমরা জানি অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহকে সহজলভ্য করার জন্য প্রতিটি কোষ চারিদিক থেকে ধামনিক জালক (**capillaries**) দ্বারা আবদ্ধ থাকে। কোষগুলি বড় হওয়ার দরুন প্রতিটি কোষের এক দেওয়াল থেকে অন্য দেওয়ালের দূরত্ব বেড়ে যায় এবং দুই দেওয়ালের ধামনিক জালকদের মধ্যেও দূরত্ব বেড়ে যায় যার ফলে কোষের অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ বিঘ্নিত হয়, বিশেষ ক'রে কোষের মাঝখানের অংশটির। এবং এই অক্সিজেন ও পুষ্টির অভাবের দরুন প্রতিটি কোষের মাঝখানের অংশ বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ঐ বিনষ্ট অংশের স্থান সংযোজক কলার দ্বারা পূরণ হয়ে যায়। কোষের এই অবস্থাকে **ইসকিমিক ফাইব্রোসিস** বলা হয়।

(২) **হৃৎপিণ্ড দেওয়ালের পরিবর্তন :** নিলয় দেওয়াল পুরু হওয়ার দরুণ এপিকার্ডিয়াম থেকে এণ্ডোকার্ডিয়ামের দূরত্ব বেড়ে যায় এবং এর ফলে মায়োকার্ডিয়ামের ভিতরের এক-তৃতীয়াংশকে সরাসরি রক্তের চাপের দ্বারা পিষ্ট হ'তে হয়। এর ফলে এপিকার্ডিয়ামের দিকের পেশী থেকে এণ্ডোকার্ডিয়ামের দিকের পেশীর অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবরাহ অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং **ইসকিমিয়ার লক্ষণ** দেখা যায়।

(৩) **করনারী ধমনীর পরিবর্তন :** রক্তচাপাধিক্যের ফলে করনারী ধমনীতে অ্যাথিরোমেটাস রোগের আক্রমণ হ'তে দেখা যায়। এ জন্য আগের পরিবর্তনগুলি আরও বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ডে ইসকিমিক ফাইব্রোসিস বেড়ে যায় এবং ইনফার্কসনও হতে পারে।

রক্তচাপাধিক্যের দরুন উপরোক্ত পরিবর্তনের ফলে হার্ট ফেলিওরও হ'তে পারে যা রক্তচাপাধিক্যের চরম পরিণতি।

ধমনী ঃ রক্তচাপাধিক্যের জন্য হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনীগুলি আরও ব্যাপক-ভাবে বিকারগ্রস্থ হ'য়ে পড়ে। অতিরিক্ত রক্তচাপের জন্য অধিক মাত্রায় প্লাজমা ধমনী জালক থেকে টিস্যুতে চলে যায় এবং ধমনীর ভিতর দেওয়ালে লাইপোপ্রোটিন, ফিব্রিনোজেন জাতীয় পদার্থ আটকে থাকে এবং পরে লাইপোপ্রোটিন ভেঙ্গে কোলেসটেরল হয়ে যায়, ক্যালসিয়াম, ক্ষয়িত কোষ প্রভৃতি মিলে এক প্রকারের জৈব রাসায়নিক পদার্থে পরিণত হয় যাকে **অ্যাথিরোমেটাস প্লেক** বলে। আর যে সমস্ত জায়গায় ঐ লাইপোপ্রোটিন পদার্থ প্রবেশ করে থাকে ধমনী দেওয়ালের সেই সেই জায়গায় ক্ষয় ক্ষতি জনিত বিকারত্ব দেখা যায় যা ১৪৯ পাতায় বর্ণনা করা হয়েছে।

ধমনীগুলি যে জায়গায় শাখায় বিভক্ত হয় সেই জায়গায় রক্ত প্রবাহের ধাক্কা বেশি লাগার দরুণ ধমনীর এণ্ডোথিলিয়াল স্তরটি আঘাত জনিত জখম হ'য়ে যায় ফলে স্বাভাবিক ভাবেই বিকৃতি ঘটতে দেখা যায়।

আগেই বলা হয়েছে রক্তচাপাধিক্যের দরুণ ধমনী দেওয়ালের টিউনিকা মিডিয়া ও ইনটিমা পুরু হ'য়ে যায় এবং মস্তিষ্কের ও বৃক্কের ধমনীদের ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বৃক্ক ধমনীর শাখা প্রশাখার দেওয়াল পুরু হ'য়ে যাওয়া রক্তচাপাধিক্যের সব থেকে প্রথম লক্ষণ। ধমনীর টিউনিকা মিডিয়া, স্থিতিস্থাপক কলা ও টিউনিকা ইন্টিমার বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিবর্তনগুলি রক্তচাপাধিক্যের কুফল এবং এই প্রতিক্রিয়া বৃক্কের ক্ষেত্রে ব্যাপকতর হ'লে বৃক্কে অতিমাত্রায় রক্ত স্বল্পতার দরুণ বৃক্কের কার্য্য বন্ধ হ'য়ে যেতে পারে বা রেনাল ফেলিওরও হ'তে পারে।

রক্তচাপাধিক্য দীর্ঘদিন চলতে থাকলে ঐ প্রতিক্রিয়াশীল পরিবর্তনগুলি করনারী, মস্তিস্ক, বৃক্ক ও অন্যান্য ধমনীতে অ্যাথিরোমেটাস রোগ তাড়াতাড়ি ঘটে থাকে যার ফলে ধমনী দেওয়াল শক্ত হয়ে যায় এবং স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় এবং রক্তচাপ আরও বাড়তে সাহায্য করে।

আরও অন্যান্য পরিবর্তন

চারকট বুচার্ড এনিউরিজম (Charcot Bouchard Aneurism) ঃ এ এক প্রকার ধমনীর বিকার যেখানে রক্তচাপাধিক্যের দরুণ অতি ক্ষুদ্র ধমনীর

দেওয়াল স্থানীয় ভাবে ফুলে যায় এবং এই ফোলা জায়গাগুলি মাপে প্রায় এক মিলিমিটার লম্বা এবং আনুবীক্ষণীক পরীক্ষায় দেখা যায় যে এই এনিউরিজম-এর স্থানগুলিতে টিউনিকা মিডিয়ায় পেশী কোষ থাকেই না তার পরিবর্তে দেখা যায় শুধু কিছু সংযোজক ও স্থিতিস্থাপক কলার অংশ বিশেষ ও হায়ালিন পদার্থ।

ঐ রকমের পরিবর্তন বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। মস্তিষ্কের থ্যালামাস ও ইণ্টারনাল ক্যাপসুল প্রভৃতি স্থানে এই রকম পরিবর্তন বেশি ঘটতে দেখা যায়। মস্তিষ্কের রক্তপাত জনিত যে স্ট্রোক হয় চারকট বুচার্ড এনিউরিজমের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা মস্তিষ্কের থ্রমবোসিস ও এমবলিজমের কথা প্রায়ই শুনি। চারকট বুচার্ড এনিউরিজম থেকে ঐরূপ প্রতিক্রিয়া হয় না। ঐরূপ প্রতিক্রিয়া বড় ধমনীর যথা মিড্‌ল সেরিব্রেল ও ক্যারটিড ধমনীর অ্যাথিরোক্লেরোসিসের জন্য হয়ে থাকে। এমবলিজমের ক্ষেত্রে ছোট ছোট প্লেটলেট থ্রমবাই রেটিনাল ধমনীতে বা মস্তিষ্কের ধমনীতে বা অন্য কোন অংশের ধমনীতে আটকে গিয়ে সাময়িক ইসকিমিয়া ঘটিয়ে থাকে। যখন ঐ থ্রমবাই কিছু পরে ভেঙ্গে যায় তখন আবার প্রতিক্রিয়া যা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে যায়।

ফিব্রিনয়ড নিক্রোসিস (Fibrinoid Necrosis) :

প্রাথমিক রক্তচাপাধিক্যে অনেকদিন ধরে ভুগছেন এমন রোগীদের কখনও কখনও হঠাৎ ক'রে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং ম্যালিগনানট পর্য্যায়ে চলে যায় এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় এবং বিধিমত চিকিৎসা না করলে ছয় মাস থেকে এক বৎসরের মধ্যে রোগীর জীবন অবসান হ'তে পারে।

আগে এই হঠাৎ ক'রে পরিবর্তনের কারণ সম্বন্ধে নানান মতবাদ ছিল। বর্তমানে আমরা জানি এই পরিবর্তনের মূল কারণ—প্রান্তীয় ছোট ধমনীগুলির দেওয়ালে ফিব্রিনয়ড নিক্রোসিসের আক্রমণ। এই আক্রমণের জন্য ছোট ধমনী-গুলির ভিতরের নালীপথ খুব সরু হয়ে যায়, প্রান্তীয় বাধা খুবই বেড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্তচাপও খুব বেড়ে যায় এবং এর ফলে রেটিনাতে ও বৃক্কে **মাইক্রোইন্‌ফার্কসন**-এর সৃষ্টি হয়। মস্তিষ্কেও ছড়ান ছিটান রক্তপাত ও জায়গায় জায়গায় রসস্ত (ocdema) হওয়া প্রভৃতি বিকারত্ব দেখা যায়।

জন্তুর উপর কৃত্রিমভাবে রক্তচাপাধিক্য ঘটিয়ে দেখা গেছে যে অতিরিক্ত রক্তচাপের জন্য ধমনিকার এণ্ডোথিলিয়াম স্তর জায়গায় জায়গায় ছিঁড়ে যায় এবং

ধমনিকার দেওয়ালের মধ্যে প্লাজমা ঢুকে যায় এবং খুব তাড়াতাড়ি মিডিয়ার পেশী স্তরটি নষ্ট করে দেয় এবং প্লাজমা পেশী স্তরের স্থান অধিকার করে। স্টেন (**Stain**) করার পর অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করলে ঐ জায়গাগুলি ফাকাসে লাল দেখায় যা দেখে বোঝা যায় যে ফিব্রিন জাতীয় বস্তু ঐ রং গ্রহণ করেছে। পেটের অন্ত্রের ধমনীগুলি পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে তাদের দেওয়াল জায়গায় জায়গায় সরু আবার জায়গায় জায়গায় বেলুনের মত ফোলা। ঐ ফোলা অংশ-গুলিতে ফিব্রিনয়ড পরিবর্তন দেখা যায়। জন্তুদের বেলায় চিকিৎসা ক'রে ঐ অবস্থার পরিবর্তন হ'য়ে সেরে যায় এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশা করতে পারি যে মানুষের বেলায়ও সুচিকিৎসার মাধ্যমে ঐ অবস্থার পরিবর্তন ঘটান সম্ভব।

আগেই আমরা উল্লেখ করেছি ম্যালিগনানট হাইপারটেনসনে রেটিনার ধমনী আগেই আক্রান্ত হয় এবং তার দরুণ দৃষ্টির নানা রকম ব্যাঘাত ঘটে এবং অপথ্যালমোস্কোপ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করলে বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায় যাকে **হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি** বলা হয়।

অতিরিক্ত রক্তচাপাধিক্যের দরুণ কখনও কখনও রোগী অজ্ঞান হয়ে যায় এবং চিকিৎসার দ্বারা রোগী আরোগ্য লাভ করে এবং পরে তার কোন রকম অঙ্গহানি বা অন্যরূপ বৈকল্য ঘটতে দেখা যায় না। এই অবস্থাকে **হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি** বলা হয়। নিম্নে এই দুটি অবস্থার বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি :

হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি (Hypertensive Retinopathy) :

হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি একটি অবস্থা যেখানে রেটিনাল ধমনী রক্ত-চাপাধিক্যের ফলে বিকল হয়ে পড়ে যার জন্য রেটিনায় যে পরিবর্তন দেখা যায় তাকে **হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি** বলা হয়। ঐ বিশেষ পরিবর্তন-গুলির উগ্রতা হাইপারটেনসনের উগ্রতার উপর নির্ভরশীল। রোগের গুরুত্ব অনুযায়ী কিথ (**Keith**) ও ওয়েজেনার (**wegener**) এবং বার্কার (**Barker**) হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথির বিকার তত্ত্বকে রেনিস্কোপযন্ত্র দ্বারা চক্ষুর ফানডাস পরীক্ষা দ্বারা যা জানা যায় তাকে চারটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করেছেন যা নিম্নে বর্ণনা করা হচ্ছে :

পর্য্যায়—১ ও ২ :

(১) রেটিনাল ধমনী আঁকা-বাঁকা, কোথাও সরু, কোথাও বেলুনের মত ফোলা দেখা যায় কারণ রক্তচাপাধিক্যের দরুন ধমনী স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।

(২) রেটিনাল শিরা ও ধমনীর যে জায়গায় পরস্পর পরস্পরকে আড়া-আড়িভাবে অতিক্রম করে সেই সংযোগ স্থলে রেটিনাল শিরায় খাঁজ হ'য়ে থাকতে দেখা যায়।

পর্য্যায়—৩ :

(১) উপরিউক্ত পরিবর্তনের উপর রেটিনার কোন কোন অংশ ইনফার্কসনে আক্রান্ত হয় যার ফলে রেটিনায় জলীয় পদার্থ জমে এবং ঐ জায়গাগুলি পেঁজা তুলার মত দেখা যায়।

(২) রক্তবাহ ছিঁড়ে যেতে পারে এবং যে যে জায়গায় ছিঁড়ে যায় সেই জায়গাগুলি দীপশিক্ষার মত লাল লাল দেখা যায়।

পর্য্যায়—৪ :

(১) অপটিক ডিস্কে জলীয় পদার্থ জমে যায় যার ফলে অপটিক ডিস্কের স্বাভাবিক কাপের আকার থাকে না ও এর কানা অস্পষ্ট হয়ে যায় এবং এই অবস্থাকে **প্যাপিলোডিমা** (**Papilloedema**) বলা হয়।

এটা ধারণা করা হয় যে রক্তচাপাধিক্যের জন্য মস্তিস্কের ধমনীগুলি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ (**Autoregulation**) হারিয়ে ফেলে যার ফলে সারা মস্তিস্কটা জল জমে ফুলে যায় (**Oedema of brain**) এবং এই কারণেই প্যাপিলোডিমা হ'য়ে থাকে।

হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথির বিবরণ যা দেওয়া হল তা অন্যান্য বহু অবস্থায় কম বেশি দেখা যায়। **আর্টারিওসক্লেরোসিস রোগে** যা বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দেখা যায়, রেটিনোস্কোপিক চিত্রটি প্রায় একই রকম, যথা আঁকা-বাঁকা রেটিনাল ধমনী, ধমনী-শিরার সংযোগ স্থলে শিরাটি চেপে যাওয়া এবং তামার তারের (**Copper wire**) মত দেখতে (অধিক মাত্রায় আলোর প্রতিবর্তন)। রূপার তারের (**Silver wire**) মত না তামার তারের মত এই অবস্থা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হবে। রূপার তারের মত যখন দেখায় তখন বুঝতে হবে ধমনীর মধ্যে রক্ত জমে রয়েছে (**Thrombosis of Artery**)।

আরও অন্য অবস্থায় যথা **অতিরিক্ত রক্তশূন্যতা, ইউরিমিয়া, অক্সিজেন স্বল্পতা, কোলাজেন রোগ** (Systemic Lupus Erythematosis) যেখানে ধমনী দেওয়ালের প্রদাহ হয়ে থাকে, রেটিনাতে জলীয় পদার্থ জমে যেতে পারে। নতুন জীবাণু ঘটিত **এণ্ডোকার্ডাইটিসেও** ঐরূপ অবস্থা হ'তে পারে।

হাইপারটেনসিভ রোগীদের ক্ষেত্রে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১২৫ বা এর উর্দ্ধে গেলে সাধারণতঃ রেটিনোপ্যাথি হ'তে দেখা যায়। এই কারণে **হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি একটি জরুরী অবস্থা** যেখানে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ ক'রে রক্তচাপকে কমিয়ে আনতে হবে। শিরার মাধ্যমে নাইট্রোপ্রুসাইড ইনজেকসন এই সব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হ'য়ে থাকে। ডায়াজকসাইড ১৫০ মিলিগ্রাম শিরার মধ্যে ইনজেকসন করা যেতে পারে। যেমন ক'রেই হউক রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।

হাইপারটেনসিভ এনসেফ্যালোপ্যাথি (Hypertensive Encephalopathy):

অত্যধিক রক্তচাপ বৃদ্ধির জন্য অনেক সময় আক্রান্ত রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে (**coma**) কিন্তু চিকিৎসার দ্বারা এই সব রোগী সেরে যায়—কোন অঙ্গ বৈকল্য থাকে না। কখনও কখনও রোগীর আগে খেঁচুনী হয় এবং পরে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। এই অবস্থাকে **হাইপারটেনসিভ এনসেফালোপ্যাথি** বলে।

মস্তিস্কে জলীয় পদার্থ জমে ফুলে যাওয়া (**oedema of brain**), মস্তিস্কে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তপাত, ধমনী কোথাও সরু কোথাও ফোলা—এইরূপ অবস্থা মস্তিস্কে হওয়ার জন্য ঐরূপ অবস্থা হ'য়ে থাকে।

রক্তচাপাধিক্য রোগের বিকার তত্ত্বের সারাংশ:

(**Summary of Pathology of Hypertension**)

হৃৎপিণ্ড:

(১) বাম নিলয়ের বৃদ্ধি (**Left Ventricular Hypertrophy**)।

(২) বাম নিলয়ের বৃদ্ধি ও হার্ট ফেলিওর (**Left Ventricular Hypertrophy and Heart failure**)।

(৩) হৃৎপিণ্ড দেহের রক্তস্বল্পতা (**Ischoemia of Heart**)।

(৪) হৃৎপিণ্ডের ইনফার্কসন (**Cardiac Infraction**)।

(৫) করনারী ধমনীর অ্যাথিরোসক্লেরোসিস (**Coronary Athero-sclerosis**)।

ধমনী :

(১) ধমনী দেওয়ালের বৈকল্য (**Chages in the arterial Wall**)

(i) অ্যাথিরোসক্লেরোসিস (**Atherosclerosis**)।

(ii) ধমনী দেওয়াল কোথাও ফুলে যাওয়া আবার কোথাও সরু হ'য়ে যাওয়া।

(iii) চারকট বুচার্ড এনিউরিজম।

(iv) ফিব্রিনয়ড নিক্রোসিস।

চক্ষুর রেটিনা :

(১) হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি।

বৃক্কের পরিবর্তন :

(১) বৃক্ক ধমনীর অ্যাথিরোসক্লেরোসিস।

(২) ইউরিমিয়া ও বৃক্কের কাজ বন্ধ হ'য়ে যাওয়া।

মস্তিস্ক :

(১) সেরিব্রোভ্যাসকুলার অ্যাকসিডেন্ট (**CVA**)।

(i) ধমনী ছিঁড়ে রক্তপাত (**Cerebral Haemorrhage**)।

(ii) এমবলিজম (**Cerebral embolism**)।

(iii) সেরিব্র্যাল থ্রমবোসিস (**Cercbral Thrombosis**)।

(২) হাইপারটেনসিভ এনসেফ্যালোপ্যাথি।

রক্তচাপাধিক্য রোগীর অনুযোগ ও লক্ষণ

(Symptoms and signs of Hypertensive Patients)

হাইপারটেনসন এমন একটি রোগ যেখানে এই রোগের ধাক্কা হার্ট নীরবে দীর্ঘদিন ধরে নিজে এই রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে বিরূপ অবস্থার সামাল দিয়ে থাকে, রোগী কিছুই জানতে পারে না অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে রোগী এই রোগের আক্রমণে আক্রান্ত হ'লেও রোগীর কোন অনুযোগ বা কমপ্লেন থাকে না।

আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে জানতে পারার পরও বহুদিন রোগীর তরফ থেকে কোন অনুযোগ থাকে না। রোগীর কাছ থেকে অনুযোগ যখন আসে তখন রোগ অনেক দূর গড়িয়ে এমন পর্য্যায়ে এসে গেছে যেখানে রক্তচাপাধিক্যের উপসর্গগুলির জন্যই রোগীর অনুযোগ হয়ে থাকে। ঐ অনুযোগগুলি কি ধরণের হ'য়ে থাকে তা নিম্নে বিবৃত করছি ঃ

শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানী ঃ

রোগীর প্রধান ও প্রথম অনুযোগ হাঁপিয়ে পড়া বা শ্বাসকষ্ট, প্রথম প্রথম অল্প পরিশ্রমের পর, যেমন দু-এক পা হাঁটলে বা দু-চারটি সিঁড়ি চড়লেই হাঁপিয়ে যাওয়া যা আগে হ'ত না। তারপর বিশ্রান অবস্থায়ও শ্বাসকষ্ট হওয়া।

বুকের মাঝখানে ব্যাথা ঃ

রোগী সাধারণতঃ বলতে থাকে, অমুক দিন একটা জরুরী কাজ ছিল—একটু তাড়াতাড়ি হাঁটছিলাম, হঠাৎ বুকের মাঝখানে খুব জোর ব্যাথা করে উঠল। একটু দাঁড়িয়ে পড়লাম তারপর ব্যাথা কমে গেল। এই রকম ব্যাথা আজকাল প্রায়ই হচ্ছে।

বিভিন্ন স্থান থেকে রক্তপাত ঃ

অনেক সময় দেখা যায়, নাক দিয়ে, দাঁতের গোড়া থেকে, গুহ্যদ্বার থেকে, কাসির সঙ্গে রক্তপাত প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটি অনুযোগ নিয়ে রোগী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য আসেন। পরীক্ষা ক'রে দেখা যায় ঐ রোগীদের মধ্যে বেশ কিছু লোক রক্তচাপাধিক্য রোগে আক্রান্ত হয়েছেন যার ফলে ঐরূপ রক্তপাত হচ্ছে। অতএব কখনও কখনও রক্তপাতই হাইপারটেশনের প্রথম লক্ষণ বা অনুযোগ হ'তে পারে।

হাপানী ও হাত-পা ফোলা ঃ

প্রাথমিক অবস্থার বেশ কিছুদিন পরে, রোগীর হাঁপানী থেকেই যায় তার উপর পায়ের পাতা ফুলে থাকে, পায়ের উপরের দিকেও ফোলা বাড়তে থাকে, এমন কি পেটে জল জমে পেটও ফুলে যায়। এই লক্ষণগুলি রাইট হার্ট ফেলিওরের দরুণ হ'য়ে থাকে।

মাথাধরা ঃ

সাধারণ মানুষ মাথা ধরলেই অনেক সময় ভেবে থাকেন যে তাদের ব্লাড প্রেসার হ'য়েছে এবং এই অনুযোগ নিয়ে, বিশেষ ক'রে কিছু কিছু শিক্ষিত বা

স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সজাগ ব্যক্তিরা, তাদের ব্লাড প্রেসর হ'য়েছে—এই ভেবে ডাক্তারের কাছে রক্তচাপ মাপাতে এসে থাকেন। মাথাধরা এত বিভিন্ন কারণ থেকে ঘটে থাকে যে এই অনুযোগকে রক্তচাপাধিক্যের জন্য মনে করা, বিশেষ ক'রে রোগের প্রথম অবস্থায় বড়ই কঠিন।

ম্যালিগনানট রক্তচাপাধিক্যে ভুগছেন এমন রোগীরা গুরুতর মাথাধরার কমপ্লেন করেন। সকালের দিকে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই মাথা ধরে এবং ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং খুবই অসহ্য হ'য়ে যায়। এ সব ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেসার মাপলেই মাথা ধরার কারণটি খুঁজে পাওয়া যায়।

উপসর্গজনিত অনুযোগ :

ব্লাড প্রেসরজনিত ক্ষয়-ক্ষতি সুরু হয়ে গেলে রোগী অনেক রকম কমপ্লেন করতে থাকে যথা শ্বাসকষ্ট যা আগেই বলা হয়েছে। প্রথমে চলাফেরায়, তারপর বসে থাকা অবস্থায় শ্বাস কষ্ট হয় ; মধ্যরাত্রে শ্বাস কষ্টে ঘুম ভেঙ্গে যায় কিন্তু উঠে বসলে কতকটা উপশম হয়, এইরূপ কমপ্লেন রোগীর কাছ থেকে পাওয়া যায়। রাত্রে বারে বারে প্রস্রাব যেতে হয় এবং পরে পরে ঐ সব কষ্ট বাড়তেই থাকে। ঐ কমপ্লেনগুলি হার্ট ফেলিওরের লক্ষণ। করনারী ধমনীতে রক্তচলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় অ্যানজাইনা ও ইনফার্কসনের লক্ষণসমূহ এসে যেতে পারে। মগজের রক্তবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে যার জন্য স্ট্রোকও হ'তে পারে। হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথির জন্য দৃষ্টি স্পল্পতা বা দৃষ্টিহীনতাও হ'তে পারে। হাইপারটেনসিভ এনসেফ্যালোপ্যাথির জন্য রোগীর খেঁচুনী হতে পারে এবং অজ্ঞানও হ'য়ে যেতে পারে। বৃক্ক বা কিডনী আক্রান্ত হ'য়ে রক্তশূন্যতা, সহজেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়া, বমি বমি ভাব, হেঁচকি, বমি, হাত-পা ফুলে যাওয়া এবং ইউরিমিয়ার জন্য অজ্ঞান হ'য়ে যাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ এসে হাজির হ'তে পারে।

হাইপারটেনসিভ রোগীর লক্ষণ

হাইপারটেনসন বা রক্তচাপাধিক্য এমন একটি রোগ যা রোগটি নির্নিত হওয়ার পরও বহুদিন রোগীর কাছ থেকে কোন অনুযোগ বা তাকে পরীক্ষা ক'রে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। রোগটি যখন অনেক দূর গড়িয়ে পড়েছে তখন তাকে পরীক্ষা করলে যে যে লক্ষণগুলি পাওয়া যায় তা নিম্নে বিবৃত করছি :

এপেক্স বিট (Apex beat) : বাম নিলয় বড় হ'য়ে যাওয়ার দরুন খালি বুক ভাল ক'রে নজর দিয়ে দেখলে এবং হাত দিয়ে অনুভব করলে দেখা যাবে—

এপেক্স বিট স্থানচ্যুত হয়েছে এবং খুব জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে ; স্বাভাবিক অবস্থায় এপেক্স বিট বাম পঞ্চম ইণ্টারকসট্যাল স্পেসে, শরীরের মধ্য রেখা থেকে ৮-১০ সেন্টিমিটার দূরে অবস্থিত থাকে। রক্ত চাপাধিক্যের জন্য হার্ট বড় হ'য়ে যায় এবং এপেক্স বিট স্থানচ্যুত হ'য়ে মধ্য রেখা থেকে অনেকটা দূরে নিচের দিকে অবস্থিত থাকতে দেখা যায়।

হার্ট সাউণ্ডস (Heart Sounds) **:** স্টেথোস্কোপ দ্বারা হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করলে, অ্যায়োটিক সেকেণ্ড সাউণ্ড-এর শব্দ উচ্চ গ্রামে শুনতে পাওয়া যায়। পালমনারী এরিয়াতে সিস্টোলিক মারমার পাওয়া যায়। কখনও কখনও রোগের অগ্রগতির সঙ্গে অ্যায়োটিক রিগারজিটেসন হ'য়ে থাকে যার জন্য অ্যায়োটিক এরিয়াতে ডায়াস্টোলিক মারমারও পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ড স্ফিতী বর্দ্ধমান অবস্থায় কখনও কখনও চতুর্থ হার্ট সাউণ্ড পাওয়া যেতে পারে। যখন হার্ট ফেলিওর সূচনা হ'য়ে যায় তখন বুক ধরফরানির কথা অনুযোগ করতে থাকে এবং তৃতীয় হার্ট সাউণ্ড শুনতে পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে পালস পরীক্ষায় পাল্‌সাস অলটারনাস (**Palsus alternus**) এর উপস্থিতি অনুভব করা যায়। এর আরও পরে মাইট্রাল রিগারজিটেসন শুরু হ'য়ে যায় এবং মাইট্রাল এরিয়াতেও মারমার শুনতে পাওয়া যায়।

চক্ষুর ফানডাস (Fundus of Eye) **:** রোগীর অবস্থার স্তর অনুযায়ী অপথ্যালমোস্কোপিক পরীক্ষায় প্রথম থেকে চতুর্থ পর্য্যায় পর্যন্ত রেটিনোপ্যাথীর লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়।

চেষ্ট রেডিওগ্রাফী : এই রোগ নির্ণয়ে চেষ্ট রেডিওগ্রাফী একটি বলিষ্ট তথ্যানুসন্ধান পদ্ধতি। বুকের এক্স-রে ছবিতে বাম অলিন্দের স্ফিতীর দরুণ হৃৎপিণ্ডের আড়াআড়ি মাপ (**Transverse diameter**) বড় দেখা যায় (স্বাভাবিক আড়াআড়ি মাপ ৮—৯ সেন্টিমিটার[১])। বেস থেকে এপেক্সের মাপ (**Base to apex diameter**) ১২ সেন্টিমিটার (ইউরোপিয়েনদের ক্ষেত্রে)। বাম নিলয়ের বৃদ্ধির জন্য রেডিওগ্রাফীতে হার্ট বুটের মত দেখায়। কার্ডিওথোরাসিক অনুপাত (**Cardiothoracic ratio**) বেড়ে যায়। স্বাভাবিক কার্ডিওথোরাসিক অনুপাত ৫০% এর কম[২]।

১। S. N. Sahana, Human Anatomy, 3rd Edition, Central Educational Enterprises, Calcutta.

২। Peter Carson, Cardiac diagnosis, International Student edition, MCGRAW—HILL KOGAKUSHA LTD, 1969.

ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (ECG) : বর্তমান যুগে ইসিজি পদ্ধতি হৃৎপিণ্ড রোগের প্রকৃতি ও গুরুত্ব নির্ণয়ে একটি মূল্যবান হাতিয়ার। রক্তচাপাধিক্যের দরুণ হৃৎপিণ্ড রোগে এই পদ্ধতি প্রয়োগে রোগের গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি যা আগে আমাদের অনুমান করা ছাড়া সরাসরি হার্টের অবস্থা বোঝার কোন উপায় ছিল না। হাইপারটেনসিভ রোগে কি রকম পরিবর্তন ইসিজিতে দেখা যায় তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করছি। তবে এই আলোচনা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন উপভোগ করতে পারবে সে তুলনায় সাধারণের পক্ষে রস গ্রহণ করা কঠিন হ'তে পারে।

মাইল্ড হাইপারটেনসন : যারা মাইল্ড হাইপারটেনসনে ভুগছেন তাঁদের ক্ষেত্রে ইসিজি-তে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় না। কিন্তু ইসিজি-তে কোন পরিবর্তন দেখা না গেলেও যারা হাইপারটেনসনে ভুগছেন তাঁদের সন্তুষ্টির কোন অবকাশ নাই কারণ অসাবধানতার প্রতিকূল আচার-আচরণ রোগ বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে।

যখন হাইপারটেনসনের জন্য বাম নিলয় বেশ স্ফীত হ'য়ে পড়ে (**Left Ventrieular Hypertrophy**) তখন বাম চেষ্ট লিড্‌সের আর ওয়েভ (**R-wave**) এর ভোলটেজ মাত্রা বেশি থাকে এবং এই ওয়েভের উর্দ্ধগতি দীর্ঘ দেখায়। দক্ষিণ চেষ্ট লিড্‌সেরও ভোলটেজ মাত্রা বেশি থাকে। রোগ আরও বৃদ্ধি পেলে বাম চেষ্ট লিড্‌সের টি-ওয়েভ (**T-wave**)-এর আকারের পরিবর্তন হ'য়ে ডোমের মত আকারটি সোজা হ'য়ে যায় এবং আরও পরে এস-টি সেগমেণ্ট (**ST-segment**) দেবে থাকে ও টি-ওয়েভ উল্টোমুখো (**Inversion**) হ'য়ে থাকে। হৃৎপিণ্ডের অ্যাক্‌সিস (**Axis**) ডানদিকে হেলে থাকে।

একোকার্ডিওগ্রাম (Echocardiogram) : অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এস্প্যালাজানী (**Spallazani**)[১] বলেছিলেন অন্ধ বাদুররা শুধুই যে উড়তে পারে তা নয় পরন্তু তারা কার্যত দেখতেও পারে। ঐ উক্তির যথার্থতা তখন ঠিক বোঝা যায় নাই। বিংশ শতাব্দীতে বাদুরদের ঐ দক্ষতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। এখন আমরা জানি বাদুররা আলট্রাসাউণ্ড সৃষ্টি করে এবং সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি অনুসরণ ক'রে চলাচলের দিকটি নির্ণয় করে নেয়। (শব্দ কম্পন

১। **Peter Carson, Cardiac Diagnosis, P. 114, MCGRAW—HILL, KOGAKUSHA LTD, TOKYO, 1963.**

প্রতি সেকেণ্ডে ২০ বারের নিচে এবং ২০০০০-এর উর্দ্ধে হ'লে তাকে আলট্রাসাউণ্ড বলা হয়[১])। ঐ সূত্র কাজে লাগিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণা দ্বারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বর্তমানে আলট্রাসোনিক প্রযুক্তি বিদ্যা অধিগত করা সম্ভব হওয়ায় হৃৎপিণ্ডের রোগ নির্ণয়ে, বিশেষ ক'রে মাইট্রাল ও পেরিকার্ডিয়াল ইফিউসন রোগে এবং নিলয়ের কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে। কার্য্যকারিতার দিক থেকে এটা প্রায় রাডারের মত কাজ করে। তবে এখনও এই পদ্ধতিকে পুরোপুরি কাজে লাগান সম্ভব হচ্ছে না এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পূর্ণভাবে দূরীকরণ করা সম্ভব হয় নাই। ট্রান্সডুসারের সাহায্যে শব্দকম্পন, যার গতিমাত্রা ২ মিলিয়ন সাইকলস প্রতি সেকেণ্ড[২], হৃৎপিণ্ডের সামনের বক্ষে বসিয়ে কার্য্য সম্পাদন করা হয়। প্রতি শব্দ হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন জায়গা থেকে আবার ঐ ট্রান্সডুসারে ফিরে আসে। অসিলোস্কোপ পর্দায় ঐ বিভিন্ন শব্দ তরঙ্গ, যা হার্টের বিভিন্ন স্থান থেকে যথা নিলয়ের দেওয়াল, ভালব ও দুটি নিলয়ের পার্টিসান দেওয়াল থেকে, যাদের ভিন্ন ভিন্ন পুরুত্ব, টান্সডুসারে নিয়ে আসে এবং অসিলোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণাত্মক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।

ব্যালিস্টোকার্ডিওগ্রাম (Ballistocardiogram) :

এটি একটি পদ্ধতি যার দ্বারা হৃৎপিণ্ড যখন ধমনীর মাধ্যমে রক্তকে সমগ্র শরীরে প্রেরণ করে তখন সমস্ত শরীরটায় যে কম্পন হয় সেই কম্পনকে যন্ত্রের সাহায্যে ধরা ও রেখার মাধ্যমে নথিভুক্ত করা। অনেকেই বলে থাকেন যে এই পদ্ধতি দ্বারা কার্ডিয়াক আউটপুট ও অন্যান্য বহু রক্ত চলাচল সম্বন্ধীয় বিষয়বস্তু জানা যায়।

এপেক্সকার্ডিওগ্রাম (Apexcardiogram) :

এটি একটি অন্য রকমের পদ্ধতি যার দ্বারা কার্ডিয়াক এপেক্সের স্থানীয়ভাবে যে শব্দের সৃষ্টি হয় অর্থাৎ প্রথম হৃদ্ধ্বনি (First Heart Sound), দ্বিতীয় হৃদ্ধ্বনি (Second Heart Sound), বুকের দেওয়ালের কম্পন, সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে হার্ট কতটা দোলে ইত্যাদি বিষয় সমূহের ঘটনাবলী আমাদের জানিয়ে দেয়।

১। S. N. Sahana, Naibedya Sankalan, Manas Sahana, 1984

২। Peter Carson, Cardiac Diagnosis, International Student Ed., MCGRAW—HILL, KOGAKUSHA Ltd, 1969

ফোনোকার্ডিওগ্রামের সহিত এপেক্সকার্ডিওগ্রাম একত্রে ব্যবহার করে মাইটাল স্টেনোসিস রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এই পদ্ধতি দ্বারা আমরা অলিন্দের সংকোচনের স্বরূপ যা বামদিকের চতুর্থ হৃদ্‌ধ্বনি (**Fourth Heart Sound**) সৃষ্টি করে তা বোঝা যায়।

ফোনোকার্ডিওগ্রাম (Phonocardiogram) :

আমরা স্টেথোস্কোপ দ্বারা হৃদ্‌ধ্বনি (**Heart Sound**) ও মারমার শুনতে অভ্যস্ত। কিন্তু যথেষ্ট অভিজ্ঞতা না থাকলে অনেক সময় কোনটা ডায়াস্টোলিক মারমার, কোনটা তৃতীয় হৃদ্‌ধ্বনি বোঝা অনেকের পক্ষেই কঠিন হ'য়ে থাকে। মাইক্রোফোন ও ফ্রিকোয়েনসি ফিল্টার বুকের উপর সুবিধা মত জায়গায় বসিয়ে হৃদ্‌ধ্বনি, মারমারের অস্তিত্ব ও সময় কাগজে লিপিবদ্ধ করার সুযোগ হয়েছে এবং এর দ্বারা সঠিক রোগ নির্ণয়ে যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে।

যুগুলার ফ্লেবোগ্রাম (Jugular Phlebogram) :

ই-সি-জি-র ব্যবহার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে যুগুলার ফ্লেবোগ্রাম-এর চলন বহুলাংশে কমে গেছে। বিশৃঙ্খলাপূর্ণ গতির (**Cardiac Arrhythmia**) হদিস এই যুগুলার ফ্লেবোগ্রাম থেকে আগে আমরা জানতে পারতাম। এখন ই-সি-জি-এর দৌলতে হৃদপিণ্ড গতির বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে আরও ভালভাবে আমরা জানতে পারছি তাই আজকাল যুগুলার ফ্লেবোগ্রামের গুরুত্ব অনেক কমে গেছে। এই বিষয়ে পদ্ধতিগত বিষয় আগেই আলোচনা করা হ'য়েছে (১৪৩ পাতায় দেখ)।

ভেক্টর কার্ডিওগ্রাম (Vector Cardiogram) :

ভেক্টর হচ্ছে একটি শক্তি যা পরিমাপ করা যায় এবং এই শক্তি একটি দিক অনুসরণ ক'রে প্রসারিত হয়। অসিলোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে যে ইলেকট্রো-কার্ডিওগ্রাফী করা হয় তাকে ভেক্টর কার্ডিওগ্রাম বলা হয়। এই প্রযুক্তিবিদ্যা দ্বারা যে বৈদ্যুতিক শক্তিকে নথিভুক্ত করা হয় এবং যা কতকগুলি ওঠা-নামা লাইন দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হয় সেই বৈদ্যুতিক শক্তিকেই লুপের আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে হোরাইজনটাল ও ফ্রনটাল প্লেনের ভেকর লুপ বার করে নিতে হয়। এর থেকে কিউ-আর-এস (**QRS**) কমপ্লেক্স ভালভাবে বোঝা যায় এবং লুপের আকারে বৈদ্যুতিক শক্তির (**Electrical Force**) গতির দিকটি থাকে ভেকর লুপ বলে বোঝা যায়।

দক্ষিণ নিলয়ের স্ফীতি, হৃৎপিণ্ডের পশ্চাৎ তলের ইনফার্কসন ও দক্ষিণ বাণ্ডল ব্রাঞ্চ ব্লক প্রভৃতি বিষয়গুলি জানা যায়। ই-সি-জি অপেক্ষা ভেক্টরকার্ডিওগ্রামে নিলয়ের ডিপোলারাইজেসনের বিষয় আরও ভালভাবে জানা যায়।

কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেসন (Cardiac Catheterization) :

ভাগ্যের পরিহাস আর কাকে বলে, যে মানুষটি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, কোন জীবজন্তু কাহাকেও কোন কষ্ট না দিয়ে এই মূল্যবান প্রযুক্তিবিদ্যা জানিয়ে গেলেন, প্রথমে তাঁকে কোন স্বীকৃতিই দেওয়া হয় নাই। এই মূল্যবান প্রযুক্তি বিদ্যা প্রথমে জন্তু-জানোয়ারদের ক্ষেত্রে আরোপ করা হ'য়েছিল এবং বহুদিন ধরে চলে আসছিল। যে মানুষটি এই পথের প্রযুক্তিবিদ্যাটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম অবলম্বন করেছিলেন তাঁর কথা স্মরণ না করলে আমাদের আজকের সাফল্যে, যার দ্বারা বহু জনের প্রাণ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে, আমাদের দিক থেকে গুরুতর ত্রুটি থেকে যাবে।

১৯২৯ সালে **ফরসম্যান (Forssmann)**[১]-ই সেই ব্যক্তি যিনি মানুষের হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে ক্যাথিটার সংযোজন করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়েই তিনি এই গবেষণামূলক পরীক্ষা তাঁর নিজ শরীরের উপবাহুর (**Forearm**) একটি শিরার ভিতর দিয়ে ক্যাথিটারটি নিজের হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে প্রেরণ করেছিলেন এবং এক্স-রে দ্বারা তাঁর কৃতকার্য্যতা প্রমাণ করেছিলেন। মানবিকতার সুমহান দৃষ্টান্ত এর থেকে আর কি হ'তে পারে।

বিগত বিশ বৎসরে হৃৎপিণ্ডের রোগ নির্ণয়ে যে অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে তা কার্ডিয়াক ক্যাথিটারাইজেসন পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলেই সম্ভব হ'য়েছে। বর্তমানে বহু রকম প্রযুক্তিবিদ্যা আবিষ্কৃত হয়েছে যার ফলে আরও নিবিড় ভাবে হৃৎপিণ্ডের চারটি গহ্বরে, মহাধমনী ও মহাশিরায় ক্যাথিটার সংযোগ করতে সক্ষম হচ্ছি এবং ঐ ঐ স্থানের রক্তের চাপ মাপতে ও রক্তের নমুনা গ্রহণ করতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না এবং ঐ বিভিন্ন স্থানের রক্তের অক্সিজেন সংপৃক্তি (**Oxygen Saturation**) ও আরও বহুবিধ বিষয় জানতে সক্ষম হচ্ছি। রেডিও-ওপেক (**Radio Opaque**) পদার্থ ও রঞ্জক দ্রব্যের সংযোজন ঐ সমস্ত স্থানে করা সম্ভব হচ্ছে এবং অ্যানাজিওগ্রাফী (**Angiography**), ও রঞ্জক দ্রব্যের তরলীকরণ, বিস্তার ও নিষ্কাশন প্রভৃতি বহুবিধ তথ্য জানতে পারছি।

১। Peter Carson, Cardiac Diagnosis, International Student Edition, MCGRAW—HILL, KOGAKUSHA Ltd, 1969

আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা ঃ

রক্ত, প্রস্রাব, পায়খানা প্রভৃতি পরীক্ষা করাও দরকার কারণ এই পরীক্ষা থেকে আরও অনেক তথ্য জানা যায় যা চিকিৎসায় সাহায্য করতে পারে।

রক্ত পরীক্ষা ঃ যে সমস্ত লোক হাইপারটেনসনে ভুগছেন তাদের রক্তে **ইউরিয়া** কত আছে জানা দরকার (রক্তে স্বাভাবিক ইউরিয়ার পরিমান ২০-৪০ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে)। বহু ক্ষেত্রে রক্তে বেশি ইউরিয়ার পরিমান বৃক্কের রোগ থাকার জন্য হ'তে পারে, আবার হাইপারটেনসন থেকেও হ'তে পারে। হাইপারটেনসনই যেখানে রক্তে ইউরিয়া আধিক্যের কারণ সেসব ক্ষেত্রে রক্তের চাপ চিকিৎসার দ্বারা স্বাভাবিক স্তরে আনলে রক্তে ইউরিয়ার পরিমান কমে যায়। যে সব ক্ষেত্রে রক্তে ইউরিয়া ৮০ মিলিগ্রাম/১০০ মিলি-লিটার এই স্তরে বা উর্দ্ধে থাকে সে সব ক্ষেত্রে বৃক্কের অসুখ রয়েছে বুঝতে হবে এবং সেইমত অনুসন্ধান চালাতে হবে যথা পায়ালোগ্রাফী (**Pyelography**), বৃক্কের বায়পসি প্রভৃতি অনুসন্ধান করতে হবে।

রক্তে সিরাম পটাসিয়ামের স্বাভাবিক স্তর ২০ মিলিগ্রাম প্রতি ১০০ মিলি-লিটার রক্তে। এসেনসিয়াল হাইপারটেনসনে সিরাম পটাসিয়াম কমে যায়, বিশেষ করে ম্যালিগনানট হাইপারটেনসনের ক্ষেত্রে। চিকিৎসার জন্য রোগী বেশ কিছু-দিন ধরে প্রস্রাব বৃদ্ধির ঔষধ ব্যবহার করলেও রক্তে পটাসিয়াম কম হয়ে যেতে পারে। যে সব ক্ষেত্রে প্রস্রাব বৃদ্ধির ঔষধ ব্যবহার করা হয়নি অথচ রক্তে সিরাম পটাসিয়াম বেশ কম, সে সব ক্ষেত্রে প্রাথমিক অ্যালডসটেরোনিজম (**Primary Aldosteronism**) রোগে রোগী ভুগছেন কিনা সে কথা চিন্তা করতে হবে এবং সেই মত অনুসন্ধান করতে হবে।

রক্তে **সোডিয়াম ও বাইকারবনেটের** পরিমানও জানতে হবে। স্বাভাবিক সিরাম সোডিয়াম হচ্ছে ১৪২ **mEq/1**

প্লাজমায় **লিপিড** কি পরিমান আছে জেনে নিতে হবে। প্লাজমায় স্বাভাবিক লিপিডের স্তর নিম্নে উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

মুক্ত কোলেসটেরল (**Free Cholesterol**)	৪০-৬০	মিলিগ্রাম	প্রতি	১০০	**ml.**
কোলেসটেরল এসটার্স (**Cholesterol esters**)	১১০-১৯০	"	"	"	"
ফসফোলাইপিডস (**Phospholipids**)	১৬০-২০০	"	"	"	"
ট্রাইগ্লিসারাইডস (**Neutral fat**)	১৪০-২২৫	"	"	"	"

প্রস্রাব পরীক্ষা ঃ মাইলড ও এসেনসিয়েল হাইপারটেনসনের ক্ষেত্রে প্রস্রাবে কোন দোষ সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। ম্যালিগনানট হাইপারটেনসনের ক্ষেত্রে প্রস্রাবে অ্যালবুমেন, হায়ালিন ও গ্রানুলার কাসট পাওয়া যায়।

রোগ নির্ণয়

যখন কোন রোগী ডাক্তারের কাছে চিকিৎসার জন্য কোন অনুযোগ নিয়ে আসেন বা রক্ত চাপাধিক্যে ভুগছেন এমন রোগী চিকিৎসার জন্য আসেন এবং পরীক্ষা ক'রে যদি দেখা যায় বাস্তবিকই রোগী হাইপারটেনসনে ভুগছেন, তখন চিকিৎসকের প্রথম ও প্রধান কাজ হবে হাইপারটেনসনের স্বরূপ নির্ণয় করা অর্থাৎ রোগটি সেকেণ্ডারী না প্রাইমারী হাইপারটেনসন এবং এই হাইপারটেনসন সাময়িক না দীর্ঘস্থায়ী। রোগীর বয়স, পারিবারিক ইতিহাস, পেশা, খাদ্যের অভ্যাস, নেশার অভ্যাস, জীবনগতির ধারা, স্ত্রী বা পুরুষ, ওজন, আকার ও অয়তন প্রভৃতি বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিবেচনা করতে হবে কারণ হাইপার-টেনসনের প্রকৃতি উপরিউক্ত বিষয়গুলির উপর কোন-না কোন ভাবে সম্বন্ধযুক্ত।

হাইপারটেনসনের সঙ্গে কখনও কখনও করনারী ধমনীর রোগ সহাবস্থান করে এবং রোগীর অনুযোগ ও লক্ষণ ঐ কারণের জন্যও হ'তে পারে। বুকে ব্যথা এবং ই-সি-জিতে মায়োকার্ডিয়েল ইনফার্কসন বা ইসকিমিয়ার লক্ষণ থাকলে করনারী ধমনীর রোগ রয়েছে বুঝতে হবে।

পরীক্ষা ক'রে যে সমস্ত ক্ষেত্রে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ সর্বদাই ১১০ **mm Hg**-এর নিচে এবং ১০৫-এর উর্দ্ধে থাকতে দেখা যায় এবং দেখা যায় যে হার্ট ফেলিওরের লক্ষণ রয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে শুধুই হাইপারটেনসন ঐ অবস্থার কারণ একথা না ভাবাই উচিৎ। অন্য কিছু রোগ সঙ্গে রয়েছে এইটাই বোঝা উচিৎ এবং ঐ সাথী রোগটিকে চিনতে হবে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা যা আগে আমি আলোচনা করেছি।

আমরা জানি একশত জন হাইপারটেনসন রোগীর মধ্যে ৯৫ জনই এসেনসিয়েল হাইপারটেনসনে ভোগেন এবং মাত্র বাকি পাঁচ জন সেকেণ্ডারী হাইপারটেনসনে ভোগেন। তাই একজন অল্প বয়স্ক লোক যখন দেখা যায় হাইপারটেনসনে ভুগছে তখন তার ঐ হাইপারটেনসন অন্য কোন কারণের জন্য হচ্ছে—এটাই চিন্তা করা স্বাভাবিক হবে। উপযুক্ত অনুসন্ধান দ্বারা সেই কারণটি নির্ণয় করতে হবে এবং অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পলিসিসটিক রোগ : এই রোগ যখন বৃক্ককে আক্রমণ করে সে ক্ষেত্রেও হাইপারটেনসন হয়ে থাকে। এই রোগে বৃক্ক বেশ বড় হয়ে যায় এবং হাতের অনুভূতি দ্বারা বোঝা যায় এবং সরাসরি পেটের এক্স-রে করলেও বোঝা যায়। পারিবারিক ইতিহাস ঘাঁটিলে কারো-না-কারো এই রোগ হয়েছিল তা জানা যেতে পারে। তাছাড়া বৃক্কের এক্স-রে, পায়ালোগ্রাফী, প্রস্রাব পরীক্ষা ইত্যাদি আমাদের ঐ রোগের হদিস দিতে পারে।

নূতন (Acute) নেফ্রাইটিস রোগ : এই রোগেও হাইপারটেনসন থাকে— কিন্তু রোগটির উৎপত্তি, রোগীর অনুযোগ ও লক্ষণ এমনিই পরিষ্কার যে রোগ চিনতে কোন অসুবিধা হয় না।

পুরাতন (Chronic) নেফ্রাইটিস রোগ : এই ক্ষেত্রে এই হাইপারটেনসনকে আলাদা ভাবে চেনা খুবই কঠিন যদি না নূতন আক্রমণের ইতিহাস পাওয়া যায়। অবশ্য বৃক্কের কাযাকারিতা (**Renal function test**) সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে রোগ নির্ণয় সহজ হয়ে যায়।

পুরাতন পায়েলোনেফ্রাইটিস (Chronic pyelonephritis) : এই ক্ষেত্রে ইতিহাস আমাদের সাহায্য করবে এবং প্রস্রাব পরীক্ষায় পাস সেল ও জীবাণুর আধিক্য ও প্রস্রাব কালচার রোগের হদিস জানিয়ে দেবে।

রেনাল ধমনীর কোন রোগ : এই রোগ থাকলেও হাইপারটেনসনের উপস্থিতি দেখা যায়। অল্প বয়সী রোগী হ'লে রেনাল ধমনীর বৈকল্য রয়েছে বা থাকতে পারে তা অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। বয়স্করাও এরোগের আক্রমণে ভুগতে পারেন। তাদের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে রোগী অনেক দিন থেকেই হাইপারটেনসনে ভুগছেন কিন্তু হঠাৎ ক'রে রক্তচাপ খুব বেড়ে গেছে—এই অবস্থায় রেনাল ধমনীর বৈকল্যের কথা চিন্তা করতে হবে। রেনাল ধমনীর অ্যানজিওগ্রাফী রোগটি নির্ণয় করে দেবে।

কুসিংস সিনড্রোম : কুসিংস সিনড্রোম ও হাইপারটেনসন একই শরীরে সহযাত্রী হতে পারে। মেয়েরাই বেশির ভাগ এই রোগে আক্রান্ত হন। রোগিণী খুবই মোটা, মুখটি চাঁদের মত গোল (**Moon face**), পুরুষদের মত গায়ে লোমে ভর্তি ; মাসিকের ইতিহাস নিলে জানা যাবে যে মাসিক অনেকদিন থেকেই বন্ধ আছে। গায়ে এখানে সেখানে পারপল রঙের রেখা দেখা যায়। প্রস্রাব পরীক্ষায় চিনির উপস্থিতি এবং ১৭-কেটোস্টেরয়ড বেড়িয়ে যাচ্ছে ধরা যাবে। উপরিউক্ত লক্ষণগুলি হাইপারটেনসনের কারণটি দেখিয়ে দেবে।

প্রাথমিক অ্যালডসটেরোনিজম (Primary Aldosteronism) : এই রোগে হাইপারটেনসন সর্বদাই থাকে। রোগীর অনুযোগ ও রক্ত পরীক্ষা দ্বারা রোগ নির্ণয় সহজ হয়ে যাবে। রোগীর প্রধান অনুযোগ পেশীর দুর্বলতা অর্থাৎ দু-পা হাঁটলেই পা ভার হ'য়ে যায় এবং রোগী খুবই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে এবং এতই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে যে আর হাঁটতেই পারে না ; মাথা ধরা, বারে বারে প্রস্রাব যাওয়া প্রভৃতি অনুযোগ রোগী বারে বারেই করতে থাকে। রক্ত পরীক্ষা করলে দেখা যাবে পটাসিয়াম কম রয়েছে এবং উচ্চ মাত্রায় সোডিয়াম রয়েছে। উপরিউক্ত অনুযোগের ইতিহাস এবং রক্ত পরীক্ষায় হাইপোক্যালিমিয়ার উপস্থিতি রোগ নির্ণয় করে দেবে।

ফিয়োক্রমোসাইটোমা (ক্রোমাফিন টিস্যুর উপবৃদ্ধি) : এই রোগে ভুগছেন এমন রোগীর বিশেষ অনুযোগ হ'ল হটাৎ হটাৎ গুরুতর শিরঃপীড়া, সঙ্গে বুকে ধরফরানী ও অতিরিক্ত ঘাম এবং এই সময় রক্তচাপ মাপলে দেখা যাবে রক্তচাপ ঘুবই বেশি। যে সময় রোগী ভাল থাকে রক্তচাপ স্বাভাবিক বা একটু বেশি ছাড়া অন্য কোন লক্ষণ থাকে না। রোগ নির্ণয় করা অনেক সময় কঠিন হ'য়ে যায় কিন্তু ক্যাটিকোলামাইনস বা এর বিপাকীয় বস্তুর মাত্রা রক্তে কেমন আছে দেখলে দেখা যাবে ঐ বস্তু দুটির মাত্রা রক্তে খুব বেশি রয়েছে এবং রোগ নির্ণয় হ'য়ে যায়।

পরফাইরিয়া রোগ : মাঝে মাঝে এই রোগ নূতন করে আক্রমণ করে, রক্তচাপ বেশিই থাকে সঙ্গে পেটে ব্যাথা, খেঁচুনী ও স্নায়ু ঘটিত নানা রকম অনুযোগ থাকে। কখনও কখনও মনে হয় রোগী হাইপারটেনসিভ এনসেফ্যালো-প্যাথি রোগে ভুগছে কিন্তু পরফোবিলিনোজেনের জন্য প্রস্রাব পরীক্ষা করালে ঐ বস্তুটি যদি প্রস্রাবে পাওয়া যায় রোগ নির্ণয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

প্রি-এক্লামসিয়া ও এক্লামসিয়া : এই রোগ শুধু গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে হ'য়ে থাকে। গর্ভাবস্থায় শেষের তিন মাসের সময় যে সব মায়েদের ওজন বেশি হ'য়ে যায়, হাত-পা ফোলে, মাথা ধরে ও প্রস্রাবে অ্যালবুমেন পাওয়া যায় এবং রক্তচাপ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে তাঁরা এই রোগে ভুগছেন ধরে নেওয়া যায়।

মহাধমনীর কোআর্কটেসন : এই রোগেও রক্তচাপাধিক্য দেখা যায়। ফিমোর‍্যাল পালস্ (Femoral pulse) এই ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে হদিস দিয়ে থাকে। ফিমোর‍্যাল পালস্ ও রেডিয়াল পালস্ এক সঙ্গে অনুভব করে তুলনা করলে দেখা যাবে ফিমোর‍্যাল পালস্ একটু দেরিতে অনুভব করা যাচ্ছে এবং

পাল্‌সের স্ফীতি খুবই ক্ষীণ। সঠিক ভাবে রোগটিকে চিনতে আমাদের তিনটি জিনিসের উপর নজর দিতে হবে যথা :

(১) মহাধমনী গোলার্দ্ধের সংকীর্ণতার জন্য, যে জায়গা সংকীর্ণ হয়েছে সেই জায়গার ঠিক আগে মহাধমনী গোলার্দ্ধ থেকে যে ধমনী উঠেছে এবং সংকীর্ণ জায়গার নিচে থেকে যে ধমনী উঠেছে তাদের মধ্যে সংযোগকারী ধমনীগুলির স্ফীতি (collateral vessels) একটি কোআর্কটেসনের লক্ষণ।

(২) এক্স-রে ফিল্‌মে বুকের পাঁজড়ার হাড়ে খাঁজ হয়ে যাওয়া (Rib notching) আর একটি লক্ষণ।

(৩) অ্যায়োটোগ্রাফী করলে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না কারণ সংকীর্ণ স্থানটি পরিষ্কার দেখা যায়।

রক্তচাধিক্য ও তার প্রতিকার

প্রাক ঔষধ প্রয়োগ আলোচনা :

হৃৎপিণ্ডে, বৃক্কে ও মস্তিষ্কে রক্তচাপাধিক্যের যে বিষম প্রতিক্রিয়া আমরা আগেই পর্য্যালোচনা করেছি তার থেকে আমরা এই শিক্ষা লাভ করেছি যে রক্তচাপাধিক্য রোগ আছে কিনা বা আসছে কিনা তা মধ্যে মধ্যেই যাচাই করে দেখে নিতে হবে, বিশেষ করে ৪০ বৎসরের উর্দ্ধে যাদের বয়স। কারণ দীর্ঘ দিন এই রোগ চলতে থাকলেও রোগীর কোন অনুযোগ থাকে না। যখন প্রথম ধরা পড়ে তখন বেশ কিছু লোক হয় স্ট্রোকে বা ইনফার্কসনে আক্রান্ত হয়েছে বা হার্ট ফেলিওরের লক্ষণ নিয়ে রোগী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছেন। তাই এই প্রতারক রোগটি সম্বন্ধে আমাদের সকলকেই সচেতন হ'তে হবে। সকল চিকিৎসককে নির্বিচারে সমস্ত রোগীরই, যারা তাঁদের কাছে চিকিৎসার জন্য আসবেন, রক্ত চাপ মেপে দেখতে হবে, অবশ্য শিশুদের ক্ষেত্রে ও অল্প বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসক তাঁর বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ ক'রে রক্তচাপ মেপে দেখার প্রয়োজন আছে কিনা তা ঠিক করবেন।

এখন প্রশ্ন হ'ল রক্তচাপাধিক্য রয়েছে অথচ কোন অনুযোগ নাই এমন ব্যক্তির আমরা চিকিৎসা করব কি করব না? ভেটারেন অ্যাডমিনিসট্রেসন[১]-এর পাঁচ

১। Sir Ronald Bodley Scott, Price's Text of the Practice of Medicine The English Language Book Society and Oxford University Press, 1982. ELBS Twelfth Edition, Reprint 1982.

বৎসরের গবেষণামূলক তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পেরেছি, নির্দিষ্ট জন-গোষ্ঠীর মধ্যে যাদের ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০—১১৫ **mm. Hg** রয়েছে তাদের চিকিৎসা করলে এবং সম সংখ্যক জন গোষ্ঠীর উপরিউক্ত রক্তচাপাধিক্যে চিকিৎসা না করলে ফলাফলে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যাদের চিকিৎসা করা না হয় তাদের মধ্যে প্রায় ⅓ অংশ নানা রূপ রক্তচাপাধিক্য জনিত বৈকল্যের শিকার হয়ে পড়েন। তুলনা মূলকভাবে যাদের চিকিৎসা করা হয় তাদের রক্তচাপাধিক্য জনিত বৈকল্যের সংখ্যা অনেক কম। ঐ গবেষণা থেকে আরও জানা যায় যে যাদের ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১১০—১১৫ তাদের চিকিৎসার দ্বারা আরও ভাল ফল পাওয়া যায় কিন্তু যাদের ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯০—১১০ **mm. Hg**-এর মধ্য থাকে চিকিৎসার দ্বারা তাদের কতটা উপকার করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

উপরিউক্ত গবেষণামূলক তথ্যের ভিত্তিতে ডায়াস্টোলিক রক্ত-চাপাধিক্যে কোন অনুযোগ থাকুক বা না-থাকুক চিকিৎসা করাতে হবে।

কোন ব্যক্তি বিশেষকে একবার পরীক্ষা করে রক্তচাপাধিক্য রয়েছে জেনেই সেই ব্যক্তি রক্তচাপাধিক্যে ভুগছেন, একথা ভাবা উচিৎ হবে না। একই ব্যক্তিকে অন্ততঃ তিন-চার বার, তিন-চার সপ্তাহে পরীক্ষা করে প্রতিবারই যদি উচ্চ ডায়াস্টোলিক রক্তচাপাধিক্য রয়েছে দেখা যায় তখন সেই ব্যক্তি রক্তচাপাধিক্যে ভুগছেন, একথা ধরে নেওয়া যায়। রোগীকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে তাঁর চিকিৎসা দরকার এবং নিয়মিত রক্তচাপ দেখিয়ে অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

চিকিৎসার জন্য বহুসংখ্যক রক্তচাপ কমানর ঔষধ রয়েছে এবং নিত্য নূতন ঔষধ সংযোজনও হচ্ছে। এই বিশাল ওষধি গোষ্ঠীর মধ্যে চিকিৎসক মাত্র কয়েকটিকে বেছে নেবেন যাদের বহুল ব্যবহারে ওষধির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে চিকিৎসক নিজে সম্পুর্ণ ওয়াকিবহাল মাত্র সেই কটি ঔষধ ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

যাদের রক্তচাপাধিক্যের জন্য চিকিৎসা চলছে, তাদের ক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য হবে রক্তচাপকে স্বাভাবিক স্তরে নিয়ে আসা।

বেশি রক্তচাপে যারা ভুগছেন তাদের রক্তচাপ আস্তে আস্তে কমিয়ে আনা উচিৎ। হঠাৎ ক'রে ঔষধের ক্রিয়ায় রক্তচাপকে খুব বেশি কমিয়ে দেওয়া উচিৎ হবে না। রক্তচাপ খুব কমে গেলে মস্তিষ্ক, বৃক্ক ও করনারী ধমনীতে প্রয়োজন মত রক্তচাপ নাও থাকতে পারে যার ফলে নানারূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব নয়।

অল্প রক্তচাপাধিক্যের ক্ষেত্রে কার্যকরী রক্তচাপাধিক্য কমানর ঔষধ প্রয়োগ করার আগে অল্প প্রশান্তিদায়ক ঔষধ (**Tranquilizer**) ব্যবহার করা উচিৎ। আহারে সংযম, কম লবণ ব্যবহার ও প্রশান্তিদায়ক ঔষধ ব্যবহারে, ফল যদি ভাল পাওয়া যায় ঔষধ ব্যবহার না করাই উচিৎ। অবশ্য চিকিৎসক নিজের বিবেচনা অনুযায়ী যা করা প্রয়োজন তাই করবেন।

উপরের আলোচনায়, কিছু তথ্য, কিছু মতামত, কিছু অভিজ্ঞতার টুকিটাকি সন্নিবেশিত করা হয়েছে, কিন্তু যিনি চিকিৎসক তিনি নিজের বিবেচনা মত রোগীর যাতে ভাল হয় তাই করবেন।

রক্তচাপাধিক্য রোগের ঔষধ
(Antihypertensive Drugs)

রক্তচাপাধিক্য দমনের জন্য ঔষধগুলির ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বিভিন্ন ঔষধ আমাদের শরীরের বিশেষ কতকগুলি টিস্যুর উপর কাজ ক'রে রক্তচাপাধিক্যকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। রক্তচাপাধিক্যের প্রধান কারণ প্রান্তীয় ধমনীর বাধা, রক্তের ভলিউম বেশি, ধমনী দেওয়ালের গঠনসজ্জায় পরিবর্তনের জন্য স্থিতিস্থাপকতার হ্রাস (**Loss of Elasticity**)। আমরা জানি প্রান্তীয় ধমনী দেওয়ালে যে অরেখিত পেশী রয়েছে সেই পেশী সংকোচিত প্রসারিত হ'য়ে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এই পেশী স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের সিমপ্যাথেটিক নার্ভের ক্রিয়া দ্বারা সংকোচিত-প্রসারিত হ'য়ে থাকে। আবার কতকগুলি ঔষধ সরাসরি ঐ পেশীর উপর কাজ ক'রে তাদের প্রসারিত ক'রে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। অন্য কতকগুলি ঔষধ বৃক্কের উপর কাজ ক'রে রক্তের সোডিয়াম ও জলীয় অংশকে নিষ্কাশন করিয়ে রক্তের ভলিউম কমিয়ে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

উপরিউক্ত রক্তচাপাধিক্যের অধিযন্ত্রবাদের (**Mechanism** পরিপ্রেক্ষিতে সিমপ্যাথেটিকের উপর গবেষণার আকর্ষণ বহু গবেষককেই শুরু থেকেই আকৃষ্ট করে যার ফলস্বরূপ সিমপ্যাথেটিকের উপর অনেক কাজ হয়েছে এবং বিবিধ ঔষধ সামগ্রী হাতিয়াররূপে আমাদের সংগ্রহের ভাঁড়ারে সঞ্চিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। সিমপ্যাথেটিক নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় সংগঠন এবং প্রান্তীয় সংগঠনের বিভিন্ন অংশ যথা সিমপ্যাথেটিক গ্যাংলিয়ন এবং বিভিন্ন নার্ভপ্রান্তের রিসেপটর অঙ্গগুলি সব মিলে যে বিস্তৃত সিমপ্যাথেটিক নার্ভ পরিসেবন ব্যবস্থা

সমগ্র টিস্যুর সহিত সংযোগ রক্ষা ক'রে রেখেছে তারই বিভিন্ন অংশে বেছে বেছে ঐ ঔষধগুলি ক্রিয়া করে ও রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। অতএব ঐ ঔষধগুলির ক্রিয়া কাণ্ড বোঝার জন্য সিমপ্যাথেটিক নার্ভতন্ত্রের মূল পরিসেবার কাঠামো আমাদের জেনে নিতে হবে। নিম্নে খুব অল্প কথায় সিমপ্যাথেটিক নার্ভের টিস্যু পরিসেবনের মূল তত্ত্বটি জ্ঞাত করা হচ্ছে :

সিমপ্যাথেটিক সংগঠন :

ঐচ্ছিক নার্ভতন্ত্রের মত স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় সংগঠন রয়েছে।

সিমপ্যাথেটিক কেন্দ্রীয় সংগঠন : উপর থেকে নিচে, কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলি যথাক্রমে গুরু মস্তিষ্কের (১) এরিয়া-৬, (২) হাইপোথ্যালামাস, (৩) মেডালা ও (৪) সুষুম্নাকাণ্ড।

সিমপ্যাথেটিক প্রান্তীয় সংগঠন : প্রান্তীয় সংগঠনের কাঠামো হ'ল সিমপ্যাথেটিক ট্রাঙ্ক ও গ্যাংলিয়ন, বা দূর প্রান্তীয় গ্যাংলিয়ন এবং প্রি-গ্যাংলিয়নিক এবং পোষ্ট-গ্যাংলিয়নিক ফাইবারস। ঐ সকল স্থানগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত স্নায়ুতন্তু দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

সিমপ্যাথেটিকের বহির্মুখী পথ : সুষুম্নাকাণ্ডের বহির্মুখী শৃঙ্গ (**Lateral horn**) থেকে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ উৎপত্তি হয়ে সম্মুখমুখী শৃঙ্গ (**Anterior horn**) ভেদ করে সুষুম্না নার্ভের (**Spinal nerve**) অ্যানটিরিয়র রুটের মাধ্যমে বাহিরে আসে এবং সিমপ্যাথেটিক ট্রাঙ্ক-গ্যাংলিয়নে বা দূর প্রান্তীয় গ্যাংলিয়নে শেষ হয় এবং গ্যাংলিয়ন থেকে নূতন সিমপ্যাথেটিক নার্ভতন্তু সরাসরি বা ঐচ্ছিক নার্ভের মাধ্যমে টিস্যুকে সিমপ্যাথেটিক বহির্মুখী নার্ভ বিভব সরবরাহ করে।

সিমপ্যাথেটিকের অন্তর্মুখী পথ (**Sympathetic afferent pathway**) **:** বিভিন্ন অঙ্গ থেকে রিসেপটরের মাধ্যমে বিভিন্ন সংজ্ঞা বহন ক'রে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ ফাইবারস (**Sympathetic afferents**) স্বয়ংক্রিয় বহির্মুখী নার্ভের সঙ্গে একযোগে সুষুম্নাকাণ্ডের কাছাকাছি গিয়ে পসটিরিয়র রুট গ্যাংলিয়ন ও পসটিরিয়র রুটের মাধ্যমে সুষুম্নাকাণ্ডের সেই সেগমেণ্টে যায় যেখান থেকে বহির্মুখী নার্ভ উৎপত্তি হয়েছিল। এই ইমপাল্‌স সংজ্ঞা উচ্চ স্তরে পৌছায় না। সুষুম্নাকাণ্ডের যে সেগমেণ্টে বা যে সকল সেগমেণ্টে যায় সেই সেগমেণ্টে বা সেগমেণ্টগুলির সোমাটিক নার্ভ দ্বারা প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মাধ্যমে সংজ্ঞাজ্ঞাপক অনুভুতি চর্মের উপর প্রকাশ করে থাকে।

প্রি গ্যাংলিয়নক ও পোষ্ট গ্যাংলিয়নক ফাইবারস : সুষুম্নাকাণ্ড থেকে যে সিমপ্যাথেটিক নার্ভতন্তু গ্যাংলিয়নে যুক্ত হয় তাদের **প্রি-গ্যাংলিয়নিক ফাইবার** বলে এবং এদের মেডালারী আবরণ (Medullary sheath) থাকে (Medullated nerve) কিন্তু গ্যাংলিয়ন থেকে যে নার্ভগুলি টিস্যুতে যায় তাদের **পোষ্ট-গ্যাংলিয়নিক ফাইবার** বলে এবং এদের মেডালারী আবরণ থাকে না (Non-medullated nerve)।

ঐচ্ছিক নার্ভের সঙ্গে সিমপ্যাথেটিক নার্ভের তফাৎ হ'ল, ঐচ্ছিক নার্ভ সুষুম্না কাণ্ড থেকে বেরিয়ে সরাসরি টিস্যুতে চলে যায় কিন্তু স্বয়ংক্রিয় নার্ভ সুষুম্না কাণ্ড থেকে বেরিয়ে বাহিরে গ্যাংলিয়নে শেষ হয় এবং গ্যাংলিয়ন থেকে নূতন নার্ভ ফাইবার উঠে সেগুলি কেবল মাত্র টিস্যুতে যায় এবং এদের প্রি-গ্যাংলিয়নিক ফাইবারগুলি মেডুলেটেড কিন্তু পোষ্ট-গ্যাংলিয়নিক ফাইবারগুলি নন-মেডুলেটেড। সকল ঐচ্ছিক নার্ভই মেডুলেটেড নার্ভ।

সিমপ্যাথেটিক নার্ভ কেমন ক'রে কাজ করে :

সিমপ্যাথেটিক নার্ভকে বা সিমপ্যাথেটিক কেন্দ্রকে কোনভাবে উত্তেজিত করলে বা কোনভাবে উত্তেজিত হ'লে সিমপ্যাথেটিক নার্ভ দিয়ে নার্ভ বিভব প্রবাহিত হয় এবং সেই নার্ভ বিভব যখন সিমপ্যাথেটিক পোষ্ট-গ্যাংলিয়নিক নার্ভ প্রান্তে উপস্থিত হয় তখন, স্থান বিশেষে, দু-রকমের রাসায়নিক পদার্থ উন্মুক্ত হয় যথা নর অ্যাড্রিনেলিন, অ্যাসিটিলকোলিন।

অ্যাড্রিনার্জিক ও কোলিনার্জিক নার্ভ : যে সমস্ত নার্ভ প্রান্ত থেকে নরঅ্যাড্রিলেলিন নির্গত হয় তাদের **অ্যাড্রিনার্জিক ফাইবার** বলা হয় এবং যে সমস্ত নার্ভ প্রান্ত থেকে অ্যাসিটিলকোলিন নির্গত হয় তাদের **কোলিনার্জিক ফাইবার** বা **নার্ভ** বলা হয়। বেশির ভাগ সিমপ্যাথেটিক ফাইবারস যারা অরেখিত পেশীকে, ও চামড়ার স্বেদ গ্রন্থিকে (Sweat glands) সরবরাহ করে তারা কোলিনার্জিক ফাইবার। বাকি সব সিমপ্যাথেটিক নার্ভ প্রান্তগুলিকে অ্যাড্রিনার্জিক ফাইবার বলা হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে নরঅ্যাড্রিনেলিন ও অ্যাসিটিলকোলিন এই দুটি রাসায়নিক পদার্থই, ক্ষেত্র বিশেষে, মাধ্যম, যাদের দ্বারা সিমপ্যাথেটিক নার্ভ অঙ্গগুলিকে যথা অরেখিত পেশী, কার্ডিয়াক পেশী, রক্তবাহ, ক্ষরণীয় স্বেদ গ্রন্থি সমূহকে কর্মমুখর করে ও তাদের কর্মের পরিবর্তন ঘটায়।

আমরা জানি অ্যাড্রিনাল গ্রন্থির মেডালা অ্যাড্রিনেলিন নামক রাসায়নিক পদার্থ ক্ষরণ করে এবং অ্যাড্রিনেলিন রক্তে বাহিত হয় এবং রক্তের মাধ্যমে সকল টিস্থর সংস্পর্শে আসে। এর কার্য্যাবলী নরঅ্যাড্রিনেলিনেরই মত।

সিমপ্যাথেটিকের উপর গবেষণা ও ঔষধের ক্রমবিকাশ ঃ

রক্তচাপাধিক্য নিবারণের জন্য ঔষধ আবিষ্কারের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে বিগত ত্রিশ বৎসর বা তারও অধিক সময়ের মধ্যে বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সংস্থায় যে সব উদ্যম নেওয়া হ'য়েছে তার বেশির ভাগই সিমপ্যাথেটিকের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফসল হিসাবে আমরা নানান ধরনের ঔষধ পেয়েছি। আবিষ্কারের পদ যাত্রায় প্রথমেই আমরা যে ওষধি পেলাম তার নাম **হেক্সা-মেথোনিয়াম** (Hexamethonium)। এটি একটি **গ্যাংলিয়ন ব্লকিং ঔষধ**। তার পর আবিষ্কৃত হল **গোয়ানেথিডিন ও বেথানিডিন** (Guanethidine and Bethanidine)। এই ঔষধগুলি **পোষ্ট-গ্যাংলিয়নিক ফাইবারের** উপর কাজ ক'রে নর-অ্যাড্রিনেলিনকে নার্ভ প্রান্ত থেকে মুক্ত হ'তে দেয় না। এর পর গবেষকদের চিন্তাধারা সিমপ্যাথেটিক রিসেপটারের উপর পড়ল এবং আমরা পেয়ে গেলাম **অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপটার ব্লকিং ঔষধ** এবং তার সঙ্গে জানতে পারলাম যে দু-রকমের রিসেপটার রয়েছে যারা **আলফা ও বেটা রিসেপটার** নামে পরিচিত এবং এদের মধ্যে বেটা রিসেপটারের উপর যে সব ঔষধ কাজ করে অর্থাৎ এদের ব্লক করে, যথা **প্রোপানোলোল** (Propanolol) **অক্সিপ্রেনোলোল** (Oxyprenold) **অ্যালপ্রিনোলোল** (Alprenolol) ইত্যাদি বেটা-'ব্লকার ঔষধগুলি পেয়ে গেলাম। বৈজ্ঞানিকরা আরও এগিয়ে চললেন এবং আমাদের জানিয়ে দিলেন যে বেটা রিসেপটার এক রকমের নয়—দু-রকমের রয়েছে যথা **বেটা-১** ও **বেটা-২**। তাঁরা আরো জানিয়ে দিলেন যে বেটা-১ রিসেপটারগুলির স্বাভাবিক কাজ হ'ল রক্তে যে ক্যাটিকোলামাইন (Adrenalin Noradrenalin) রয়েছে তাদের মাধ্যমে উত্তেজিত হওয়া এবং হৃৎপিণ্ডের সংকোচন শক্তি ও গতি বাড়িয়ে দেওয়া। বেটা-২ রিসেপটারগুলি অনুরূপভাবেই উত্তেজিত হয় এবং রক্তবাহ ও ব্রনকিয়েল পেশীকে শিথিল (Vasodilator and Bronchodilation) করে দেয়। এই রিসেপটারগুলি ব্লক হয়ে গেলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হ'য়ে থাকে। আমরা আরও জানতে পারলাম যে কতকগুলি ঔষধ শুধু হৃৎপিণ্ডের বেটা-১

রিসেপটারগুলিকে যে সকল ঔষধ ব্লক করে, সেই ঔষধগুলি হচ্ছে **মেটো-প্রোলোল** (Metoprolol) ও **অ্যাটিলোল** (Atenol) এবং এই ঔষধগুলি **কার্ডিওসিলেকটিভ** (Cardioselective) **বেটা-১ ব্লকার** নামে পরিচিত এবং এদের ব্রনকিয়েল পেশীর উপর বিশেষ কোন কাজ নাই। অতএব এই ঔষধগুলি অ্যাস্থমা রোগ থাকলেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

এতক্ষণ আমরা দেখতে পেয়েছি গবেষকরা তাঁদের দৃষ্টি রেখেছিলেন প্রান্তীয় সিমপ্যাথেটিক নার্ভ তন্ত্রের (Peripherel Sympathetic Nervous System) উপর। এর পর তাঁরা দৃষ্টি ছিলেন কেন্দ্রীয় সিমপ্যাথেটিক নার্ভ তন্ত্রের উপর। তাঁরা **আলফা মিথাইল ডোপা** (a-methyl dopa) নামক ঔষধ আবিষ্কার করলেন। এদের কাজ হ'ল কেন্দ্রীয় **আলফা অ্যাড্রিনার্জিক রিসেপটার-গুলির** উত্তেজনা শক্তি কমিয়ে দেয় কারণ আলফা মিথাইলডোপা শরীরের মধ্যে বিপাক হ'য়ে আলফা-মিথাইল-নরঅ্যাড্রিনেলিনে রূপান্তরিত হয় এবং যে সকল টিস্থ অ্যাড্রিনার্জিক নার্ভ দ্বারা সেবিত সেই সব টিস্থর নরঅ্যাড্রিনেলিনের স্থান দখল করে নেয়। ফলে কেন্দ্রীয় অ্যাড্রিনার্জিক নার্ভ বিভব (Nerve impulse) প্রবাহ কমে যায়। প্রান্তীয় রিসেপটারগুলির নরঅ্যাড্রিনেলিন ভাঁড়ার কমে যাওয়ার জন্য ব্যারোরিফ্লেক্স অধিযন্ত্রবাদ কার্য্য পদ্ধতি সহজতর হয় এবং কেন্দ্রীয় নার্ভ সেণ্টারের (Vasomotor Centre) মাধ্যমে রক্তচাপকে প্রশমিত রাখে। এই ঔষধগুলি সরাসরি প্রান্তীয় ধমনীর অরেক্ষিত পেশীর উপরও কাজ করে যার ফলে ঐ অরেখিত পেশীর নরঅ্যাড্রিনেলিন ভাঁড়ার কমে যাওয়ার জন্য প্রতিক্রিয়া শক্তি কমে যায়।

রক্তচাপাধিক্য রোগের ঔষধ ও প্রয়োগ

আগেই আমরা রক্তচাপাধিক্য রোগের ঔষধ আবিষ্কারের ইতিহাস ও কোথায় কেমন ক'রে কাজ করে সে বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বিবিধ ঔষধের শ্রেণী বিন্যাস সহ নাম, প্রয়োগ মাত্রা ও প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

যে সব ঔষধ প্রান্তীয় সিমপ্যাথেটিকের উপর কাজ করে

গ্যাংলিয়ন ব্লকিং ঔষধ :

হেক্সামেথোনিয়াম (**Hexamethenium**) **:** নিউজিল্যাণ্ডে স্মিরক ও তার সহযোগীরা ম্যালিগনাণ্ট রক্তচাপাধিক্যে এই ঔষধ ব্যবহার করে যে অত্যাশ্চর্য্য ফল পেয়েছিলেন তা একদিন চিকিৎসা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং সিমপ্যাথেটিকের দিকে ঔষধ অনুসন্ধানের দিগন্তটি সকলের সামনে উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। এর পর সিমপ্যাথেটিকের উপর কাজ করে অনেক ভাল ভাল কম প্রতিক্রিগাশীল ঔষধ আবিষ্কার হয়েছে যার ফলে হেক্সামেথোনিয়াম আজকে শুধু ঐতিহাসিক নজির হয়েই রয়ে গেছে।

অ্যাড্রিনার্জিক ব্লকিং ঔষধ ঃ

গোয়ানেথিডিন ও বেথানিডিন (**Guanethidin and Bethanidin**) এই ঔষধ দুটি এই পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু ঔষধগুলি এতই প্রতিক্রিয়াশীল যে এদের ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এই ঔষধগুলি নার্ভপ্রান্তের ক্যাটিকোলা-মাইনের ভাঁড়ার ও গ্রহণ শক্তি কমিয়ে দেয়। এই ঔষধগুলি শক্তিশালী হওয়া সত্বেও এদের ব্যবহার বন্ধ হয়ে রয়েছে কারণ মাথা তুলে দাঁড়ালেই রক্তচাপ অত্যন্ত কমিয়ে দেয় (**Postural Hypotension**) যার ফলে রোগী অনেক সময় মাথা ঘুরে পড়ে যায়।

গোয়ানেথিডিন ঃ প্রস্তুত কারকের দেওয়া নাম ঃ ইজমেলিন (**ISMESIN**)।

মাত্রা ঃ ১০-২৫ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট। প্রথমে ১০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট নিত্য একটি, তারপর দরকার হলে, সপ্তাহ অন্তর, মাত্রা আরও ১০ মিলিগ্রাম বাড়ান যেতে পারে কিন্তু প্রথম ব্যবহারে যদি হঠাৎ করে রক্তচাপ কমে যায় এই ঔষধ ব্যবহার না করাই ভাল।

বেথানিডিন ঃ প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম ঃ এসবাট্যাল (**ESBATAL**)

মাত্রা ঃ ১০ ও ৫০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট পাওয়া যায়। প্রথমে ১০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট প্রত্যহ তিনটি পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে। কখনও ২০০ মিলিগ্রামের বেশি দেওয়া যাবে না। অল্প মাত্রায় শুরু করা ভাল। বৃক্কের ও হার্টের রোগ থাকলে ব্যবহার করা উচিত হবে না।

আলফা-অ্যাড্রিনো-রিসেপটার ব্লকিং ঔষধ (**Alfa-Adrenoreceptor Blocking agents**) **:**

ফেনটোলামাইন (Phentolamine) **ও ডাইবেনামাইন** (Dibenamine)। ঔষধগুলি আলফা রিসেপটর ব্লকিং ঔষধ। বর্তমানে এই ঔষধগুলি ফিয়োক্রমোসাইটোমা (**Phaecnromocytoma**) রোগ ছাড়া রক্তচাপাধিক্যের ক্ষেত্রে আর ব্যবহার করা হয় না।

বেটা-অ্যাড্রিনো-রিসেপটর ব্লকিং ঔষধ :

প্রোপ্রোনোলোল এই গ্রুপের ঔষধ কিন্তু বেটা-১ ও বেটা-২ দুরকম রিসেপটারকেই ব্লক করে দেয়। আমরা জানি **বেটা-রিসেটারগুলি** হৃৎপিণ্ডে থাকে এবং নীরোগ অবস্থায় অ্যাড্রিনেলিন ও নরঅ্যাড্রিনেলিনের দ্বারা উত্তেজিত হ'য়ে হৃৎপিণ্ড গতি (**Chronotopic**) ও সংকোচন শক্তি (**Inotropic**) বাড়িয়ে দেয়। বেটা-২ রিসেপটারগুলি ব্রনক্রিয়েল পেশী (**Bronchial muscle**) ও রক্তবাহের অরেখিত পেশীকে (**Smooth muscle of blood vessels**) অ্যাড্রিনেলিনের মাধ্যমে শিথিল ক'রে রাখে যাতে করে শ্বাস-প্রশ্বাস সরলভাবে চলতে পারে। প্রোপ্রানোলোল উভয় রিসেপটারকেই ব্লক করে দেয়, ফলে বেটা-১ রিসেপটার ব্লকের জন্য হৃদপিণ্ড গতি ও সংকোচন শক্তি কমে যায়—হৃৎপিণ্ডকে কম কাজ করতে হয় ফলে হৃৎপিণ্ডের অক্সিজেন চাহিদা কমে যায় এবং অ্যানজাইনার ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়। অল্প মাত্রায় এই ঔষধ দীর্ঘদিন ব্যবহারে রক্তে রেনিনের পরিমাণও কমিয়ে দিয়ে রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু বেটা-২ রিসেপটারও ব্লক হওয়ার দরুন ব্রনক্রিয়েল পেশী সংকোচিত হ'য়ে যায় যার ফলে অ্যাস্থমা রোগ যাদের আছে তাদের কষ্ট বেড়ে যায়। সেজন্য অ্যাস্থমা রোগ যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। রেনাল ও প্রাথমিক হাইপারটেনসনে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম : ইণ্ডির্যাল (**Indiral**)-১০, ৪০, ৮০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট, সিপলার (**Ciplar**), বেটানল (**Betanol**) ইত্যাদি—১০, ৪০ ও ৮০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেট।

মাত্রা : রোগীর প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী ৪০ থেকে ৩২০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত নিত্য দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে কম মাত্রা প্রয়োগ ক'রে প্রয়োজন অনুযায়ী মাত্রা বাড়ান দরকার।

প্রতিক্রিয়া : হাঁপানী, হার্ট ফেলিওর, ক্লান্তি-অবসাদ, বিঘ্নিত নিদ্রা, হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাওয়া, রক্তে চিনি বৃদ্ধি প্রভৃতি অঘটন ঘটাতে পারে।

বেটা ১ রিসেপটার ব্লকিং ঔষধ Cardioselective) :

মেটোপ্রলোল : এই ঔষধ কেবলমাত্র হৃৎপিণ্ডের বেট-১ রিসেপটারকে ব্লক করে এই জন্য এটি একটি কার্ডিওসিলেকটিভ (**Cardioselective**) অ্যাড্রিনো-রিসেপটার-ব্লকিং ঔষধ। হাইপারটেনসনে, অ্যানজাইনায় এবং বিশেষ ক'রে প্রাথমিক হাইপারটেনসনে, থায়াজাইডের সঙ্গে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম : মেটোপ্রোলল-(অষ্ট্রা), বেটালক (**Betaloc**), লোপ্রেসর (**Lopresor**) ইত্যাদি।

মাত্রা : ৫০ ও ১০০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেটে পাওয়া যায়। হাইপারটেনসন ও অ্যানজাইনা পেকটোরিসের ক্ষেত্রে ১০০—২০০ মিলিগ্রাম দৈনিক মাত্রায় তিন ভাগে ভাগ করে দেওয়া হ'য়ে থাকে।

নিষেধ : গর্ভাবস্থায়, হার্ট ব্লকে ও হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ নিষিদ্ধ।

যে সব ঔষধ কেন্দ্রীয় সিমপ্যাথেটিকের উপর কাজ করে

আলফা-মিথাইল-ডোপা : এই ঔষধ যা গ্রহণের পর শরীরে বিপাক হয়ে আলফা-মিথাইল-নর-অ্যাড্রিনেলিন হয় এবং যে সমস্ত টিস্যু সিমপ্যাথেটিক নার্ভ দ্বারা পরিসেবিত হয় সেইসব জায়গা ঐ আলফা-মিথাইল-নরঅ্যাড্রিনেলিন দখল করে নেয় যার ফলে নরঅ্যাড্রিনেলিনকে ঐ টিস্যুর উপর কাজ করতে দেয় না। এই কারণে সিমপ্যাথেটিকের উত্তেজনা শক্তি কমে যায় এবং প্রান্তীয় রক্তবাহগুলি শিথিল হয়ে যায় এবং রক্তচাপ কমে যায়।
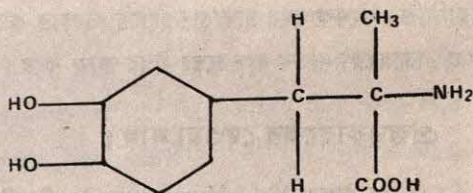
মিথাইল ডোপা (METHYL DOPA)

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম : অ্যামিডো (**Amedo-Sunil Synchem Ltd**), অ্যালডোমেট, এমডোপা প্রভৃতি।

মাত্রা : ২৫০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট দিনে তিনবার বা দুবার খেতে হয়। সাধারণতঃ খাওয়ার চার ঘণ্টা বাদেই কাজ শুরু হ'য়ে যায় এবং রক্তচাপ কমতে

শুরু করে এবং কাজ প্রায় ২৪ ঘণ্টা থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী ৫০০ মিলিগ্রাম দৈনিক তিনবার পর্য্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। যদি এই মাত্রায়ও কাজ ভাল না হয় তখন এর সঙ্গে থায়াজাইড গ্রুপের যে কোন একটি ঔষধ যুক্ত করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

প্রতিক্রিয়া ঃ নিজস্ব অভিজ্ঞতায় ব্যবহার করে দেখেছি সুনীল সিনকেম লিমিটেড **(Sunil Synchem Ltd)** কোম্পানীর অ্যামিডো ঔষধের প্রতিক্রিয়া খুবই কম বা হয় না বললেই চলে। যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ দেখা যায় তা হ'ল অনিদ্রা, ঝিমুনিভাব, স্ত্রী সহবাসের শক্তি হ্রাস এবং আর. বি. সি. ধ্বংসজনিত এক প্রকার রক্তশূন্যতা।

ক্লোনিডিন ঃ

এটি একটি অত্যন্ত শক্তিশালী রক্তচাপাধিক্য কমানর ঔষধ। এই ঔষধ মেডালার ভ্যাসোমটর সেণ্টারের আলফা অ্যাড্রিনার্জিক ইণ্টারনিউরণের উপর কাজ করে যার ফলে কেন্দ্রীয় অ্যাড্রিনার্জিক বহির্মুখী সিমপ্যাথেটিক বিভব (**Impulse**) প্রবাহ কম হ'য়ে যায় এবং ব্যারোরিফ্লেকস অধিযন্ত্রবাদ রক্তচাপ কমাতে কার্য্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। ক্লোনিডিনের দ্বিতীয় বিশেষ কাজ— ধমনী পেশীর সংকোচন-প্রসারণ প্রতিক্রিয়াশীলতাকে দমিত করা। এই কারণেই ক্লোনিডিন অনেক সময় মাইগ্রেন রোগে ব্যবহার ক'রে সুফল পাওয়া যায়। খুব অল্প মাত্রায় ক্লোনিডিন নার্ভতন্ত্রের উপর কাজ করে।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম ঃ

(১) হাইপারডাইন (**Hyperdyne**)—**S. G. Pharmaceuticals.** ১০০ **mcg. tab.**

(২) ক্লোথ্যালটন (**Clothalton**)—**S. G. Pharmaceutical**—ট্যাবলেট (**Clonidine 100 mcg.+Clorthalidone 15 Mg.**)

(৩) ক্যাটাপ্রেস (**Catapress**)—**German Remedies**—১০০ **mcg.** ট্যাবলেট।

(৪) ক্যাটাপ্রেস ডাইউ (**Catapres Diu**)—**German Remedies— Clonidine hcl. 100 mcg.+Chlorthalidone 15 mg.**—ঠিক ক্লোথ্যালটনের মত।

(৫) আরকামিন (Arkamin)-Unichem-Clonidine hcl. 100 mcg. ট্যাবলেট।

(৬) আরকামিন-এইচ (Arkamin-H)—Unichem-Clonidine 100 mcg. + Hydrochlorothiazide 20 mg. ট্যাবলেট।

মাত্রা: প্রথমে একটি ক'রে ১০০ mcg. ট্যাবলেট, দু-বেলা দুটি এবং তার পর প্রয়োজনানুযায়ী মাত্রা বাড়ান যেতে পারে কিন্তু কখনই ১০০০ mcg. মাত্রার উর্দ্ধে যাবে না।

প্রতিক্রিয়া: অনিদ্রা, ঝিমুনিভাব, শরীর রসস্ত হওয়া, স্ত্রী সঙ্গমে অহীনা। অতি মাত্রায় মনভঙ্গ (Mental depression) কোন কোন ক্ষেত্রে হ'তে পারে।

সাবধানতা: কখনই হঠাৎ ক'রে এই ঔষধ বন্ধ করা উচিৎ নয়। হঠাৎ ক'রে বন্ধ করলে অতিমাত্রায় রক্তচাপ বেড়ে যায়। বন্ধ করার প্রয়োজন হ'লে, আস্তে আস্তে মাত্রা কমিয়ে এনে তবে বন্ধ করা যাবে।

রিসারপাইন ও রিসারপাইনের যোগিক:

রিসারপাইন একটি রাওয়লফিয়া অ্যালকালয়ড (Rauwolfia Alkaloid) এবং রক্তচাপ কমানর একটি কার্য্যকরী ঔষধ। এই ভেষজটি প্রান্তীয় ধমনীকে প্রসারণের মাধ্যমে রক্তচাপাধিক্য কমিয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা বলেন এই ঔষধ কেন্দ্রীয় ও প্রান্তীয় সিমপ্যাথেটিক নিউরণের ক্যাটিকোলামাইনের ভাঁড়ার কমিয়ে দেয় অর্থাৎ সিমপ্যাথেটিক নার্ভ যে বস্তুর বলে রক্তবাহের অরেখিত পেশীর সংকোচন ঘটিয়ে থাকে সেই বস্তুটিকে কমিয়ে দিয়ে, দমিয়ে দিয়ে, রক্তচাপকে নিয়ন্ত্রণে আনে। সব রকম হাইপারটেনসন, এক্লামসিয়া, হাইপারটেনসিভ এনসে-ফ্যালোপ্যাথি প্রভৃতি অবস্থায়, বিশেষ ক'রে প্রস্রাবকারক ঔষধের সঙ্গে এটি একটি অত্যন্ত কার্য্যকরী ঔষধ। অন্য ঔষধের সঙ্গে যৌগিক ভাবেও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম

(১) **অ্যাডেলফেন** (Adelphane-ciba)—Reserpine o. 1 mg. + Dihydrallazine Sulph. 10 mg. ট্যাবলেট।

(২) **অ্যাডেলফেনএসিড্রেক্স** (Adelphaneesidrex-ciba)—Reserpine 0 1 mg + Dihydrallazine Sulph. 10 mg. + Hydrochlorothiazide 10 mg. ট্যাবলেট।

(৩) **সারপাসিল** (Serpasil-ciba)—Reserpine 0·25 mg. and 1 mg. ট্যাবলেট। ইনজেকসন 1 mg/ml এবং ২·৫ mg ml.

(৪) **হাইথ্যালটন-আর** (Hythalton-R.S.G. Pharma)—Chlorthalidone 50 mg. + Reserpine 0·25 mg. ট্যাবলেট।

(৫) **জেনোফেন** (Genophane-Geno) – Reserpine 0·1 mg. + Dihydrallazide Sulph 10 mg. ট্যাবলেট।

(৬) **অ্যালট্রিপ** (Altrip – Alembic)—Reserpinc 0·1 mg. + Dihydrallazine Sulph 10 mg. + Hydrochlorothiazide 10 mg.—ট্যাবলেট।

(৭) **সারপ্যালজিনো** (Seapalgino—Geno)—Reserpine 0·1 mg. + Dihydrallazine Sulph 10 mg. + Hydrochlorothiazide 10 mg.– ট্যাবলেট।

মাত্রা : অ্যাডেলফেন ট্যাবলেট একটি ক'রে তিনবার, দরকার মত আরও বাড়ান যেতে পারে—নিত্য ৬টির বেশি কখনও নয়। **অ্যাডেলফেন-এসিড্রেক্স** একটি ক'রে দিনে ২ বার বা ৩ বার। **হাইথ্যালটন-আর** প্রত্যহ একটি ক'রে ট্যাবলেট। প্রয়োজনে দুটি করেও দেওয়া যেতে পারে। **জেনোফেন** একটি থেকে দুটি ট্যাবলেট নিত্য দুবার থেকে তিনবার দেওয়া যেতে পারে। **অ্যালট্রিপ**—এক থেকে দুটি ট্যাবলেট নিত্য দুই থেকে তিনবার যেতে পারে। **সারপ্যালজিনো**—এক থেকে দুটি ট্যাবলেট নিত্য দুই থেকে তিনবার দেওয়া যেতে পারে।

প্রতিক্রিয়া : রিসারপাইনের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে নাক সেঁটে ধরা, পেট খারাপ, শ্লথগতি পাল্‌স (**Bradicardia**), বিমর্ষভাব ও শরীরের টিস্যুতে জলীয় পদার্থের আধিক্য যার ফলে হাত-পা, মুখ ফোলা দেখাতে পারে। দীর্ঘদিন এই ঔষধ ব্যবহারে পুরুষদের কারো কারো ধ্বজভঙ্গ রোগ হ'তে পারে। যে সমস্ত রিসারপাইন ঔষধ ক্লোনিডিনের যৌগিকে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ চট্ করে ছাড়া উচিৎ হবে না।

রক্তবাহ প্রসারক বা ভ্যাসোডাইলেটরস (**Vasodilators**) **:**

হাইড্রালাজাইন (**Hydrallazine**) **:**

এটি একটি পরিচিত ঔষধ যা এককালে প্রচুর ব্যরহার করা হয়েছে। এই ঔষধ প্রান্তীয় ধমনীর অরেখিত পেশীর উপর সরাসরি কাজ ক'রে তাদের শিথিল

করে দেয়। যার ফলে প্রান্তীয় ধমনীগুলি প্রসারিত হয়, প্রান্তীয় ধমনীর বাধা অপসারণ করে এবং এর ফল স্বরূপ রক্তচাপ কমে যায় কিন্তু কার্ডিয়াক আউটপুট ও বৃক্কের ভিতর রক্ত প্রবাহ বেড়ে যায়।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম ঃ অ্যাপ্রিসোলিন (Apresoline), ট্যাবলেট আকারে ২৫ ও ৫০ মি. গ্রা. ট্যাবলেট পাওয়া যায়।

মাত্রা ঃ প্রয়োজন অনুযারী ২৫ থেকে ২০০ মি. গ্রা. পর্য্যন্ত প্রত্যহ দেওয়া যেতে পারে। সাধারণতঃ ২৫ মি. গ্রা. ট্যাবলেট প্রত্যহ তিনবার দেওয়া হ'য়ে থাকে। সুউচ্চ রক্তচাপাধিক্যের ক্ষেত্রে ৫ থেকে ২০ মি. গ্রা. শিরার মাধ্যমে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যার।

প্রতিক্রিয়া ঃ সারা শরীরে লুপাস এরিথেমেটোসাস-এর মত প্রতিক্রিয়া সব থেকে খারাপ প্রতিক্রিয়া। তবে ২০০ মি. গ্রা. থেকে কম মাত্রায় প্রত্যহ ব্যবহার করলে কদাচিত ঐ প্রতিক্রিরা হয়ে থাকে। বুক ধরফরানি আর একটি উপসর্গ, তবে বেটা ব্লকারের সঙ্গে ব্যবহার করলে মাত্রাও কম লাগে এবং বুক ধরফরানি এড়ান সম্ভব। কোন রোগীর করনারী ধমনীর ব্যাধি থাকলে এই ঔষধ ব্যবহার না করলেই ভাল। অনেক ভাল কম প্রতিক্রিয়াশীল ঔষধ আবিষ্কার হওয়ার ফলে এই ঔষধের প্রচলন কমে গেছে।

শিরা-ধমনী রক্তবাহ প্রসারক ঔষধ (**Drug that dilates both arteries and veins**)

প্রাজোসিন (**Prazosin**) **ঃ**

এটি একটি ভিন্ন ধরণের ঔষধ যা কার্য্যকরী অথচ হাইড্রালাজাইনের থেকে কম প্রতিক্রিয়াশীল। এই ঔষধ ধমনী ও শিরা উভয় রক্তবাহকেই প্রসারিত করে। প্রাজোসিন অরেখিত পেশীকোষের ফসফোডাইএস্টারের উপর কাজ করে যার ফলে কোষ অভ্যন্তরে আবর্তনশীল (**cyclic**) এডিনোসিন মনোফসফেটকে কমিয়ে দেয়।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম ঃ হাইপোভেস (**Hypovase**)। ২ মি. গ্রা. ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়।

মাত্রা ঃ প্রত্যহ ৬ থেকে ২০ মিলিগ্রাম পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। প্রথম মাত্রাই অনেক সময় রক্তচাপ এত কমিয়ে দেয় যে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে সিনকোপের আক্রমণ হ'তে পারে। সেজন্য শুরুতে খুব অল্প মাত্রায় দিতে হয় এবং রাত্রে

শোবার আগে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। সাধারণতঃ প্রারম্ভিক ব্যবহারিক মাত্রা ০·৫ মিলিগ্রাম দৈনিক তিনবার পর্য্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। পরে এই মাত্রা প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়ান যেতে পারে এবং বাড়ালেও উপসর্গ তেমন হ'তে দেখা যায় না।

প্রতিক্রিয়া : দাড়ালেই মাথা ঘুরে যায় (**Postulal Hypotension**)।

ডায়াজক্সাইড (Diazoxide) **:**

এটি রক্তচাপাধিক্যের সঙ্কট অবস্থায় একটি কার্য্যকরী ঔষধ এবং শিরার মাধ্যমে ১৫০ মিলিগ্রাম মাত্রায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এক থেকে দু-মিনিটের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যায়।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম : ইউডেমাইন (**Eudemine**)।

মাত্রা : ১৫০ মিলিগ্রাম শিরার মাধ্যমে।

প্রতিক্রিয়া : গা বমি বমি ভাব, বুক ধরফরানি ও ডায়াবেটিস।

ডাইউরেটিকস (Diuretics) **:**

প্রস্রাব বৃদ্ধিকারক ঔষধগুলিকে ডাইউরেটিকস বলে। রক্ত চাপ কমানর জন্য যে সব ডাইউরেটিকস ব্যবহার করা হয় সেগুলি রেনাল টিবিউলের নানান জায়গায় কাজ করে সোডিয়ামের বিশোষণ বন্ধ ক'রে প্রস্রাবের সঙ্গে সোডিয়াম ও জলকে বেশি মাত্রায় নিষ্কাশন করিয়ে দেয়। এর ফলে প্লাজ্মা ভলিউম কমে যায় ও রক্তচাপাধিক্য নিয়ন্ত্রণে আসে।

থায়াজাইডস : এই জাতের রাসায়নিক পদার্থগুলি রেনাল টিবিউলের নানান জায়গায় কাজ ক'রে মুত্রাধিক্য ঘটিয়ে থাকে। তবে প্রান্তীয় রেনাল কনভোলিউটেড টিবিউলের (**Distal Convoluted tubules**) উপর এরা সর্বাধিক কার্য্যকরী। নানা নামে এই জাতের ঔষধগুলি একই প্রক্রয়ায় কাজ করে শুধু তফাৎ হ'ল, কার্য্যকারিতা ও তার স্থায়ীত্ব। সাধারণতঃ এই জাতের ঔষধগুলি ১২—২৪ ঘণ্টা কার্য্যকরী থাকে। এদের মধ্যে ক্লোরথ্যালিডোন ও পলিথায়জাইড ঔষধগুলি ৪৮ ঘণ্টা বা আরও বেশি সময় পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকে। নিম্নে থায়াজাইড গ্রুপের ঔষধের রাসায়নিক নাম, প্রস্তুকারকের দেওয়া নাম ও মাত্রা এবং এদের প্রয়োগ ও প্রতিক্রিয়া চার্ট ক'রে দেওয়া হ'ল **:**

রাসায়নিক নাম	প্রস্তুত কারকের দেওয়া নাম ও মাত্রা	প্রয়োগ	প্রতিক্রিয়া
হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড (Hydrochlorothia-zide)	এসিড্রেক্স (Esidrex) হাইড্রোস্যালিউরিক (Hydrosaluric) ডাইরেমা (Direma) ২৫ ও ৫০ মিঃ গ্রাঃ ট্যাবলেট	প্রত্যহ একটি বা দুটি প্রয়োজন অনুযায়ী।	বহুমূত্র রোগ গেঁটে বাত, রক্তে শ্বেত কণিকার অভাব, অনুচক্রিকার স্বল্পতা, বমি বমি ভাব, ধ্বজভঙ্গ, পেট ব্যথা, গাত্র-চর্মে দানাকার জিনিসের উৎপত্তি।
ক্লোরথায়াজাইড (Chlorthiazide)	স্যালুরিক (Saluric) ডাইরিল (Diuril) ৫০০ মিঃ গ্রাঃ ট্যাবলেট	প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী প্রত্যহ একটি বা দুটি করে	
ক্লোরথ্যালিডোন (Chlorthalidone)	হাইথ্যালটোন (Hythal-ton) ১০০mg tab হাইগ্রোটন (Hygroton) ৫০ মিঃ গ্রাঃ ট্যাবলেট।	½ ট্যাবলেট একদিন ছাড়া প্রত্যহ একটি করে বা একদিন ছাড়া একটি করে	
পলিথায়াজাইড (Polythiazide)	(১) নেফ্রিল (Nephril) 1 মিঃ গ্রাঃ ট্যাবলেট (2) নেফ্রিল-আর (Nephril-R=Poly-thiazide 1mg + Reserpine 0·25mg)	২-৫ ট্যাবলেট সপ্তাহে একবার	
সাইক্লোপেনথায়াজাইড (Cyclopenthiazide)	ন্যাভিড্রেক্স (Navidrex) ০·৫ mg. tab	0·5-1mg নিত্য প্রথমে তারপর 0·25 mg নিত্য	
বেনড্রোফ্লুয়াজাইড (Bendrofluazide)	নিয়োনেক্লেক্স (Nconaclex), ৫ মিলি-গ্রাম ট্যাবলেট	প্রত্যহ একটি	
ট্রাইঅ্যামটেরিন + বেঞ্জুথায়াজাইড (Triamterin + Benzthiazide)	ডাইটাইড ট্যাবলেট Dytide) (Triamterin 50 mg Benzthiazide 25 mg)	প্রত্যহ ২টি ট্যাবলেট	
ক্লোরথ্যালিডন	হাইথ্যালটন ১০০ মিলি-গ্রাম ট্যাবলেট	হাইপারটেনসনে একদিন ছাড়া ছাড়া আধ খানা ট্যাবলেট একবার	

লুপ ডাইউরেটিকস (Loop Diuretics) :

এই ঔষধগুলি প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রস্রাবের সহিত নিষ্কাশণ করায় যার ফলে প্রচুর পরিমাণে প্রস্রাব হ'য়ে থাকে। এইজন্য এই ঔষধগুলি অত্যন্ত শক্তিশালী প্রস্রাবকারক এবং এদের মধ্যে ল্যাসিক্স (**Lasix**) নামক ঔষধটি হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে, রক্তচাপাধিক্যের সঙ্কটকালে ইনজেকসন মাধ্যমে একটি কার্য্যকরী জীবনদায়ী ব্যবস্থা। লুপ ডাইউরেটিকস হেনলির লুপে ব্যাপক-ভাবে, বিশেষ ক'রে লুপের উর্দ্ধগামী শাখায়, কাজ করে। তিন রকমের ঔষধ লুপ ডাইউরেটিকসের অন্তর্ভুক্ত যথা ফ্রুসেমাইড গ্রুপ, এথাক্রিনিক এসিড ও বুমেটানাইড। নিম্নে এই ঔষধগুলির রাসায়নিক নাম, প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম, কি কি ভাবে পাওয়া যায়, মাত্রা, য়োগ ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ে আলোচনা করা হইল :

(A) **ফ্রুসেমাইড (Frusemide) :** এই জাতীয় ঔষধের প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম—ল্যাসিক্স (**Lasix**), ফ্রুসিনেক্স (**Frusinex**), স্যলিনেক্স (**Salinex**) ইত্যাদি।

ঐ ঔষধগুলির মধ্যে হেক্সটের (**HoeCHST**) ল্যাসিক্স বহুল প্রচলিত এবং ৪০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট ও ২০ মিলিগ্রামের ইনজেকসন ২ মিলিলিটারে পাওয়া যায়। ২০ মিলিগ্রাম থেকে ১০০ মিলিগ্রাম নিত্য প্রয়োজন অনুসারে একটি মাত্রায় বা একদিন ছাড়া ছাড়া একটি মাত্রায় দেওয়া যায়। হার্ট ফেলিওর, ও হাইপারটেনসিভ এনসেফ্যালোপ্যাথি রোগে ল্যাসিক্স ইনজেকসন শিরার বা পেশীর মাধ্যমে প্রয়োগ একটি কার্যকরী ব্যবস্থা। নেফ্রোসিস ও শরীরের নানা স্থানে জল জমলে যেমন পেটে, বুকে জল জমলে, এই ঔষধ প্রয়োগে সুফল পাওয়া যায়।

ফ্রুসিনেক ১০০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেটে পাওয়া যায়। মাত্রা ল্যাসিক্সের মত। বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ১—৩ মিলিগ্রাম প্রতি কেজি ওজনের হিসাবে মাত্রা ঠিক করতে হবে।

স্যালিনেক্স ৪০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেটে পাওয়া যায়। মাত্রা, প্রয়োগ সব একই রকম।

(B) **এথাক্রিনিক এসিড** (Ethacrynic Acid) : যে সমস্ত হার্ট ফেলিওরের ক্ষেত্রে অন্যরকম ডাইউরেটিকস কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে না সেই সব ক্ষেত্রে এবং সবরকম হার্ট ফেলিওর, হাইপারটেনসনের সঙ্কটকালে

ফুসফুসে জল জমা অবস্থায় (**Pulmonary oedema**) এই ঔষধ অত্যন্ত কার্যকরী।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম—**এডিক্রিন** (Edecrin)। ৫০ মিলিগ্রাম ট্যাবলেটে পাওয়া যায়। ৫০ মিলিগ্রামের একটি ট্যাবলেট নিত্য একবারই যথেষ্ঠ তবে দরকার হলে দু-বারও দেওয়া যেতে পারে। এই ঔষধ ব্যবহার করলে সঙ্গে পটাসিয়াম ক্লোরাইড মিক্সচার ব্যবহার করা একান্ত দরকার।

(C) **বুমেটানাইড** (Bumetanide)**:** এই ঔষধ এথাক্রিন এসিডের মতই কাজ করে।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম বুমেট (**Bumet**)। এক মিলিগ্রাম ট্যাবলেটে পাওয়া যায়। এক থেকে চার মিলিগ্রাম ট্যাবলেট নিত্য দেওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে যে সমস্ত ফোলারোগে অন্য ঔষধ বিশেষ কাজ করে না। ছোট ছেলেদের বেলায় ০·০৩ থেকে ০·০৬ মিঃ গ্রাঃ প্রতি কেজি শরীর ওজনের হিসাবে মিলিগ্রামে মাত্রা ঠিক করে নিতে হবে।

প্রতিক্রিয়া ও সাবধানতা: যে সমস্ত রোগী ডিজিটেলিস ব্যবহার করছেন, তাদের ক্ষেত্রে এই লুপ ডাইডরেটিক ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং প্রয়োগ মাত্রা কম করে দিতে হবে। লিভার ও কিডনী রোগেও অল্পমাত্রায় এই ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে নচেৎ বেশি মাত্রা প্রয়োগে হাইপোক্যালিমিয়া ঘটতে পারে। অনেকদিন ব্যবহারে বাত, গেঁটে বাত, বহুমূত্র রোগ প্রভৃতি ঘটাতে পারে। বহুদিন এই ঔষধ ব্যবহার করতে হলে পটাসিয়াম ক্লোরাইড প্রয়োগ করতে হবে নচেৎ হাইপোক্যালিমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(C) অ্যালডেসটেরোন প্রতিরোধকারী ও সমপর্য্যায়ের ঔষধ (Aldesterone Antagonist)

এই গ্রুপের ঔষধগুলি রেনাল টিবিউলের প্রান্তীয় কনভোলিউটেড টিবিউলের (**Distal convoluted tubeles**) উপর কাজ করে এবং অ্যালডেসটেরনকে দমিত করে সোডিয়াম ও জল আত্মস্থ (**absoption**) হ'তে দেয় না কিন্তু সোডিয়ামের বদলে কিছু পটাসিয়াম নিষ্কাশন করিয়ে দেয়। এর ফলে প্রস্রাব বৃদ্ধি পায়। হার্ট ফেলিওর-এর ক্ষেত্রে ডিজিটেলিসের সঙ্গে ব্যবহারে এটি একটি অত্যন্ত কার্য্যকরী ঔষধ।

এই গ্রুপের ঔষধগুলির নাম—(i) **স্পাইরোনোল্যাকটোন** (Spironoloctone)—প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম, **অ্যালড্যাকটোন** (Aldactone)

রেনাল টিবিউলের কার্য্যাবলী

২৫ ও ১০০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট, (ii) **অ্যামিলোরাইড** (Amiloride) ও **ট্রাইয়ামটেরিন** (Triamterene), প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম যথাক্রমে

মিডামর (Midamor) ৫ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট ও **ডাইট্যাক** (Dytac) ৫০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট আকারে পাওয়া যায়।

অ্যালড্যাকটোন নিত্য ১০০ মিলিগ্রাম মাত্রায় দেওয়া যায়। ডিজিটেলিসের সঙ্গে বা থায়াজাইডের সঙ্গে এটি একটি শক্তিশালী প্রস্রাবকারক। **পটাসিয়াম দেওয়া নিষিদ্ধ কারণ হার্টের উপর আঘাত আসতে পারে।**

মিডামর : ৫ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট, নিত্য একটি করে দেওয়া হয়। অত্যন্ত কার্য্যকরী প্রস্রাবকারক ঔষধ।

Dytac (Triamterene) **:** ঠিক অ্যালডেসটেরোন অ্যান্টাগনিষ্ট নয় কিন্তু এর এবং উপরিউক্ত মিডামরের কাজ প্রায় একই রকম। নিত্য প্রায় ১০০ থেকে ২০০ মিলিগ্রাম ব্যবহার করা যেতে পারে। থায়াজাইড-এর সঙ্গে ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয় কারণ এই ঔষধগুলি এককভাবে ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায় না।

প্রতিক্রিয়া : অ্যালড্যাকটোন ব্যবহারে গাইনিকোম্যাসটিয়া রোগের আক্রমণ হতে প্রায়ই দেখা যায়। কখনও কখনও হাইপ্যালকিয়া হ'তে পারে।

ক্যালসিয়াম ব্লকিং ঔষধ :

পেশী কোষে সংকোচনের জন্য ক্যালসিয়াম একটি অত্যাবশ্যকীয় খনিজ পদার্থ। এই খনিজ পদার্থটি পেশীর সারকোটিবিউলার সিস্টেমের (**Sarcotubular System**) মধ্য দিয়ে পেশী কোষে যাতায়াত করে। কতকগুলি ঔষধ ক্যালসিয়ামের যাতায়াত পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, বিশেষ ক'রে রক্তবাহের অরেখিত পেশীর উপর। এর ফলে রক্তবাহ পেশীর সংকোচন শক্তি কমিয়ে দেয় এবং ধমনীর প্রান্তীয় বাধা দূরীভূত করে, যার জন্য রক্তচাপাধিক্য নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নিফেদিপিন (**Nifedipine**) এই রকমের একটি ঔষধ এবং আমাদের ভাঁড়ারে এটি একটি নূতন সংযোজন। এই নূতন ঔষধটির পরিচয় এবং কর্ম পদ্ধতি জানার জন্য অনেকেরই আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক, তাই নিম্নে এই ঔষধটি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি যা অনেকের 'জানার' আগ্রহ মেটাতে সহায়ক হবে :

নিফেদেপিন ডিহাইড্রোপাইরিডিন (**Dehydropyridine**) নামক ভেষজ থেকে আহৃত এবং ঔষধটির রাসায়নিক গঠন নিম্নে দেওয়া হ'ল। এই ঔষধের

কার্য্য পরিধি বিস্তৃত এবং হৃৎপিণ্ড থেকে আরম্ভ করে সমগ্র ধমনী তন্ত্রের উপর
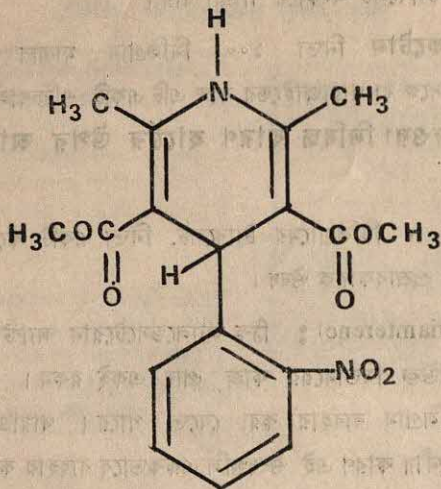
নিফেডেপিনের রাসায়নিক গঠন

আধিপত্য বজায় রেখে হৃদরোগে ও রক্তচাপাধিক্যের ক্ষেত্রে এটি একটি কার্য্যকরী ঔষধ।

কোন্ কোন্ রোগে নিফেদেপিন একটি কার্যকরী ঔষধ :

(১) ভ্যাসোস্প্যাসটিক অ্যানজাইনা (**Vasospastic Angina**)

(২) স্থায়ী শ্রমঘটিত অ্যানজাইনা (**Stable Angina of effort**)।

(৩) প্রাথমিক রক্তচাপাধিক্য (**Essential hypertension**)।

(৪) প্রান্তীয় ধমনী বৈকল্য (**Peripheral vascular disorders**)।

নিফেদেপিন কোথায় কি করে :

(১) নিফেদেপিন করনারী ধমনীর শাখা-প্রশাখাকে প্রসারিত করে।

(২) সাব এণ্ডোকার্ডিয়েল টিস্যুতে প্লাজ্‌মার ব্যাপন বৃদ্ধি করে।

(৩) পাশাপাশি অন্য ধমনীর সঙ্গে করনারী ধমনীর সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করে (**Improves collateral circulation of heart**)

(৪) উপরিউক্ত কারণের নিট ফল, হৃদপিণ্ড পেশীতে অক্সিজেন সরবরাহ বৃদ্ধি, চাহিদা পূরণ ও অ্যানজাইনা প্রতিরোধ জোরদার হওয়া।

(৫) প্রান্তীয় ধমনী শিথিল হ'য়ে যায়, যার ফলে প্রান্তীয় বাধা দূরীভূত হয় এবং রক্তচাপাধিক্য (সিস্টোলিক ও ডায়াস্টোলিক) কমে যায়।

(৬) অক্সিজেন সরবরাহের প্রাচুর্য্যে নিলয়ের নিক্ষেপণ শক্তি বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ডায়াস্টোলিক ভলিউম চাপ অপেক্ষাকৃত কম হয় (**Reduced after load**)।

(৭) নিফেদেপিন ব্যবহারে হৃদগতি ও ইমপাল্‌স সঞ্চালন গতি বৃদ্ধি পায়।

নিফেদেপিন কেমন ক'রে কাজ করে ঃ

জীবিত কোষে অবিরত যে জৈব প্রক্রিয়া চলছে তার জন্য ক্যালসিয়াম আয়নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উৎসেচক প্রতিক্রিয়াতে, উত্তেজক কোষকে কর্মমুখর করতে, উত্তেজনা-সংকোচন সংযুক্তি প্রক্রিয়ায়, ক্রিয়াবিভব (Action potential) সৃষ্টির জন্য, পেশী সংকোচনের জন্য, শক্তি সঞ্চয় ও ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে ক্যালসিয়াম অপরিহার্য্য। রক্তবাহের দেওয়ালে যে পেশী কোষ রয়েছে তাদের আবরণীর (সারকোলেমা) মধ্য দিয়ে ক্যালসিয়াম আয়ন যাতায়াত ক'রে রক্তবাহ পেশীর সংকোচন-প্রসারণ ঘটিয়ে রক্তবাহ নালীর ব্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে। কতকগুলি ঔষধ যথা ক্যাডিলা কম্পানীর দেপিন (নিফেদেপিন—Nifedepine), করভ্যাস, এই ক্যালসিয়াম অনুর কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, এইজন্য এই ঔষধগুলিকে **ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার** বা **ক্যালসিয়াম অ্যাণ্টাগনিষ্ট** বলে।

ক্যালসিয়াম চ্যানেল (Calcium Channel) ঃ 'ক্যালসিয়াম চ্যানেল' নামটা শুনলেই মনে হয় যেন একটা নালী যার ভিতর দিয়ে ক্যালসিয়াম যাতায়াত করে। প্রকৃতপক্ষে এটি নালী নহে, কিন্তু নালীর উদ্দেশ্য সাধন করে। কোষ আবরণী (Sarcolemma) একটি ত্রি-স্তরের আবরণী যার ভিতরের ও বাহিরের স্তর দুটি প্রোটিন দ্বারা সংগঠিত এবং এই স্তরের মধ্যবর্তী স্তরটি লিপিড দিয়ে সংগঠিত। প্রোটিনের বড় মলিকিউল উপরিউক্ত মধ্যবর্তী লিপিড স্তরে পৌছে তদন্তকারী নির্বাচকের ভূমিকা পালন করে এবং বেছে বেছে ক্যালসিয়াম আয়নকে নির্বাচন ক'রে কোষের ভিতরে প্রবেশের অধিকার দেয়। এই বড় প্রোটিন মলিকিউলকেই **ক্যালসিয়াম চ্যানেল** বলা হয়। মনে করা হয় এই মলিকিউলগুলির নির্বাচনকারী ফিলটার থাকে যাদের **সিলেকটিভিটি ফিলটার** (Selectivity filter) বলা হয়, যারা কেবল মাত্র কতকগুলি বিশেষ

অনুকে ভিতরে প্রবেশাধিকার দেশ। আরও মনে করা হয় এদের **ভোলটেজ সেনসরও** থাকে যারা কোষে লো-ভোলটেজ অবস্থা বুঝতে পারে এবং এই লো-ভোলটেজ অবস্থার সময়ই অনুগুলিকে প্রবেশ করার জন্য গেট খুলে দেয়। এই জন্য এই প্রোটিনগুলিকে **স্লো-Ca^{++} চ্যানেলও** (Slow ca^{++} Channel)
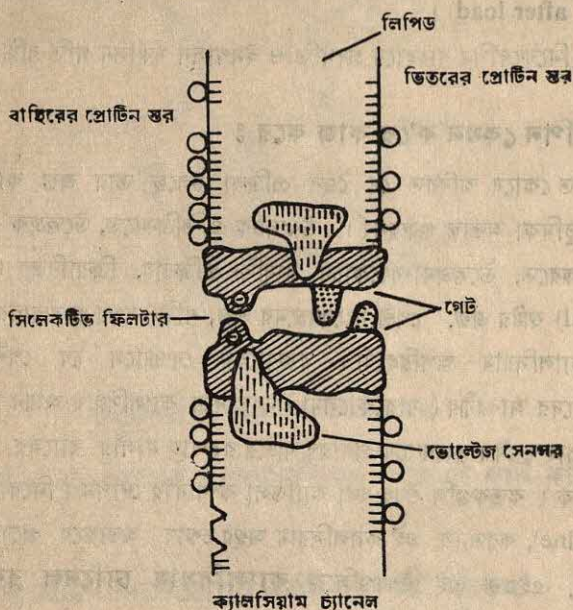
ক্যালসিয়াম চ্যানেল

বলা হয়। আবার কোষের ভিতরটি যখন ইলেট্রোনেগেটিভ হয়ে যায় তখন আবার প্রবেশ গেট বন্ধ হয়ে যায়। এটা আরও মনে করা হয় যে সারকোলেমায় কতকগুলি রিসেপটর থাকে যারা ক্যালসিয়াম চ্যানেলগুলির কার্য্য নিয়ন্ত্রণ করে। হৃৎপিণ্ডে বেটা-রিসেপটরগুলি এবং রক্তবাহের আলফা এর্ডিনাজিক রিসেপটরগুলি উত্তেজিত হ'লে অনেকগুলি স্লো-ক্যালসিয়াম চ্যানেল দিয়ে একসঙ্গে ক্যালসিয়াম কোষ অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সুযোগের সৃষ্টি হয়। এইজন্য এই স্লো-ক্যালসিয়াম-চ্যানেলগুলিকে, যারা রিসেপটরের মাধ্যমে কর্ম্মমুখর হয়, তাদের **রিসেপটর অপারেটেড চ্যানেল** (Receptor operated Channel = ROC) বলা হয়। নিম্নে এই অধিযন্ত্রবাদের একটি চিত্র দেওয়া হইল।

প্রস্তুতকারকের দেওয়া নাম ও মাত্রা ঃ

দেপিন (Cadila) 10 মিঃ গ্রাঃ ক্যাপসুল, দিনে দুটি বা তিনটি। **করভাস,**

মায়োগার্ড, ক্যালব্লক ঔষধগুলিও নিফেদেপিন। ঐগুলির প্রয়োগ বিধিও একই প্রকার।

সাবধানতা ও বাধানিষেধ ঃ

(১) নিফেদেপিন কখনও কখনও হাইপোটেনসন ঘটাতে পারে যার জন্য মাঝে মাঝেই রক্তচাপ দেখিয়ে নিতে হবে।

(২) শুরুতে কখনও কখনও বা মাত্রা বাড়াবার সময় অ্যানজাইনার ব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে।

(৩) বেটা ব্লকারের সঙ্গে নিফেদেপিন ব্যবহার করলে বেটাব্লকার ঔষধ হঠাৎ ছাড়া যাবে না, আস্তে আস্তে মাত্রা কমিয়ে কমিয়ে তবে ছাড়তে পারা যাবে।

অ্যাকটিন মায়োসিন ফিলামেন্টের পেশী সংকোচনের ও শিথিলতার সময় অবস্থা।

(৪) গর্ভবতী নারীদের ক্ষেত্রে নিফেদেপিন ব্যবহার না করাই ভাল।

(৫) ডিগকসিনের (**Digoxin**) সঙ্গে নিফেদেপিন ব্যবহার করলে ডিগকসিনের মাত্রা কম করতে হবে।
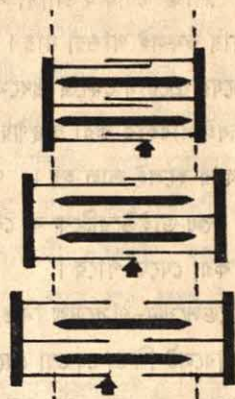
প্রতিক্রিয়া ঃ নিফেদেপিনের প্রতিক্রিয়া, মাথাঘোরা, দুর্বলতা, বমি বমি ভাব, পা ফোলা, বুক ধরফরানি, রক্তচাপ কমে যাওয়া প্রভৃতি। কখনও কখনও অ্যানজাইনার ব্যথা বেড়ে যেতে পারে।

চিকিৎসার সার কথা

একটি বিষয় সকলকে মনে রাখতে হবে যে রক্তচাপাধিক্যের ক্ষেত্রে যেখানে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১০৫ **mm.Hg.**-এর উপরে সেখানে চিকিৎসা করান একান্ত দরকার এবং বারে বারে রক্তচাপ পরীক্ষা করাতে হবে ও সারা জীবন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে।

অপেক্ষাকৃত কম বয়সের রোগীর ক্ষেত্রে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ৯৫ **mm.Hg** পার হলেই উপসর্গ এড়াবার জন্য চিকিৎসা করাতে হবে।

মধ্য বয়স্কদের ক্ষেত্রে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ ১০০ mm.Hg. পার হলেই চিকিৎসা করান দরকার।

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অন্য রোগ না থাকলে স্বাভাবিক স্তরের উর্দ্ধে রক্তচাপ যেখানে রোগীর শরীরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যথা অনিদ্রা, বুক ধরফরানি, সহজেই ক্লান্তি বোধ ইত্যাদি, সাময়িক হ'লেও হালকা প্রশান্তিদায়ক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসায় সুফলই পাওয়া যায়।

ঔষধের প্রয়োগ ক্ষেত্রে প্রথমে একটি ঔষধ যার বিশেষ প্রতিক্রিয়া নাই বা কম, সেই ঔষধই ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। এই ঔষধ হয় একটা ডাইউরেটিক বা একটা বেটা ব্লকার হলেই ভাল হয়। থায়াজাইড যে কোন একটি ব্যবহার করা যেতে পারে। শুধু ডাইউরেটিকে বা বেটা ব্লকারে কাজ না হ'লে, দুটি ঔষধ একত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

অ্যাডেলফেন-এসিড্রেক্স নিত্য একটি ক'রে বা অ্যাডেলফেন একটি ও ল্যাসিক্স একটি ট্যাবলেট নিত্য দেওয়া যেতে পারে। যদি দুটি ঔষধ একত্রে দেওয়ার পরও কোন কাজ না হয়, সে সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সিমপ্যাথেটিকের উপর কাজ করে এমন ঔষধ যথা মিথাইডোপা (AMEDO—SUNIL SYNCHEM LTD) ঐ দুটি ঔষধের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে। এতেও যদি রক্তচাপাধিক্য নিয়ন্ত্রণে না আসে, ক্লোনিডিন গ্রুপের (clothalton) পৃথকভাবে অর্থাৎ উপরের ঔষধগুলি বর্জন ক'রে নূতন ভাবে চিকিৎসা শুরু করে দেখতে হবে। এতেও যদি রক্ত-চাপাধিক্য নিয়ন্ত্রণে না আসে তখন ভেবে দেখতে হবে অন্য কোন রোগ আছে কিনা—যার উপসর্গ রোগীর রক্তচাপাধিক্য ঘটাচ্ছে।

রক্তচাপাধিক্যের সঙ্কটকালে, যেমন হাইপারটেনসিভ এনফ্যালোপ্যাথি, বাম নিলয়ের ফেলিওর (Left ventricular failure) প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ দরকার এবং রোগীকে কোন কার্ডিয়াক সেণ্টারের সুযোগ গ্রহণ করা উচিৎ।

বিশেষজ্ঞের বা কার্ডিয়াক সেণ্টারের সুযোগ পাওয়া না গেলে লুপ ডাইউরেটিক ল্যাসিক্স ২০ মিলিগ্রাম পেশীতে বা শিরায় ইনজেকসন করা যেতে পারে বা অবস্থা অনুযায়ী সারপ্যাসিল এক মিলিগ্রাম বা ২·৫ মিলিগ্রাম পেশীতে ইনজেকসনও করা যেতে পারে।

লেবেটালোল (Labetalal) ২৫ মিলিগ্রাম বা ডায়াজক্সাইড (Diazoxide) ১৫০ মিলিগ্রাম শিরার মাধ্যমে ইনজেকসন করা যেতে পারে। তবে এই চিকিৎসা হাসপাতালে হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগে প্রতিরোধ ব্যবস্থা

কথামুখ :

আমরা কোন শত্রু আমাদের আক্রমণ করতে আসছে দেখতে পেলে বা জানতে পারলে কিছু-না-কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি, ফলাফল যাই হউক। রক্তচাপাধিক্য রোগ এমন একটি শত্রু, যে-শত্রুটি আমাদের অলক্ষে, অজান্তে, গোপনে, কখন যে কিরূপ ধরে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে তার কোন হদিসই আমরা পাই না। আবার এই রোগটি এমনিই ভয়ঙ্কর ও ক্রূর প্রকৃতির যে তলে তলে হৃৎপিণ্ড ও ধমনী-তন্ত্রে ঘুণ ধরিয়ে দেয় অথচ রোগীকে কিছুই জানতে দেয় না। রোগী যখন জানতে পারে তখন পরিস্থিতি খুবই ঘোরাল হয়ে পড়ে, এবং রোগীর তখন জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। তাই রোগটিকে আমাদের জানতে হবে, গতি প্রকৃতি চিনতে হবে, মায়াবিনী রাক্ষসীর মত কোন্ প্রচ্ছন্ন রূপ ধরে এই রোগটি আমাদের দেহাঙ্গনে প্রবেশ করে তার স্বরূপ উৎঘাটন করে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

বহু গবেষক-মনীষী, বহুদিনের নিরলস প্রচেষ্টায় বহুরূপী এই রোগটির সম্বন্ধে নানা বিষয়ের উপর যে আলোকপাত করেছেন, তাতে সব না হলেও, সুন্দর একটি চিত্র আমাদের দেখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। এখন আমরা দেখব কোন্ রন্ধ্র পথ ধরে, কি ভাবে, কোন মূর্তিতে আমাদের দেহাভ্যন্তরে এই রোগটির বীজ প্রবেশ করে।

শ্বাসের মাধ্যমে বাঁচার জন্য বায়ু আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, নানান রকম খাদ্য আমাদের গ্রহণ করতেই হবে বাঁচার জন্য। বংশগতির সূত্র অনুসারে জন্মাবার লগ্নেই মাতা-পিতার বা দূর বংশধরের সম্পদ, ভালই হউক আর মন্দই হউক, সঙ্গে করে আমরা নিয়েই আসি। আবার আমাদের শরীরের মধ্যেই বিপাকীয় বস্তু, ভাল বা মন্দ, সঙ্গেই নিয়ে চলেছি। এইরূপ বিভিন্ন পথে, কোথা থেকে কোন্ বস্তু এসে বা সৃষ্টি হয়ে, রক্তচাপাধিক্য রোগের বীজগুলি অঙ্কুরিত করে এবং ক্রমবর্দ্ধনান হয়ে কেমন ক'রে মহীরুহে বিকাশ লাভ করে তার অল্প কিছু আমরা জানি কিন্তু বেশির ভাগই জানি না। যেটুকু জানি তাই নিয়ে নিয়ে কিছু আলোচনা করছি।

বংশগতি ও রক্তচাপাধিক্য :

গবেষণা থেকে আমরা জানতে পেরেছি বংশগতি প্রভাব রক্তচাপাধিক্য ঘটানোর একটি বিশেষ কারণ—একথা এখন সর্বজন স্বীকৃত। যাদের বংশগতিতে এই রোগের অস্তিত্ব রয়েছে বা ছিল, তুলনামূলক ভাবে যাদের বংশগতিতে এই

রোগ নাই তাদের থেকে প্রথমোক্তদের এই রোগ (রক্তচাপাধিক্য রোগ) বহুগুণ বেশি ঘটতে দেখা যায়। কেউ কেউ বলেন এটি একটি তেজী (Dominant) জিন ঘটিত ব্যাধি। আবার কেউ কেউ বলেন রক্তচাপাধিক্য রোগটি একটি বহু-জিন ঘটিত ব্যাধি।

যাদের বংশগতিতে রক্তচাপাধিক্য রোগ আছে তাদের কি করতে হবে:

বংশগতিতে যাদের রক্তচাপাধিক্যের ইতিহাস রয়েছে তাদের বৎসরে অন্ততঃ একবার নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করিয়ে দেখাতে হবে। রক্তচাপের গতি উর্দ্ধ-মুখী হলেই চিকিৎসকের পরামর্শ মত চলতে হবে। খাদ্য বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। **চর্বি জাতীয় খাদ্য** সীমার মধ্যে রাখতে হবে অর্থাৎ **মোট ক্যালরীর ২৮ ভাগের বেশি হবে না**। **গুরু ভোজন** কখনই বাঞ্ছনীয় নয়। **প্রত্যহ চলাফেরায়** নিয়ম করে অভ্যস্ত হ'তে হবে। **ধূমপান** অভ্যাস করা উচিৎ হবে না। অভ্যাস থাকলে ত্যাগ করতে হবে। **মেজাজ** ঠিক রাখার জন্য অনুশীলন মাধ্যমে মানসিক সংযম অভ্যাস করতে হবে। **আবেগ প্রবণতা** যথা অহেতুক ভয়, উদ্বেগ, বিচার বুদ্ধি প্রয়োগে দমিত রাখতে হবে। **দৈহিক ওজন**, বয়স ও শরীরের দৈর্ঘতা অনুযায়ী, ঠিক রাখতে হবে। **কম লবণ গ্রহণ** ছেলেবেলা থেকেই অভ্যাস করতে হবে।

বিপাকীয় প্রতিক্রিয়া ও রক্তচাপাধিক্য:

আমাদের শরীরের বিভিন্ন টিস্থতে যে সদা সর্বদা বিপাকীয় ক্রিয়া হয়ে চলেছে তার থেকে কোন দূষিত পদার্থ দীর্ঘদিনের প্রতিক্রিয়ায় এই রক্তচাপাধিক্য রোগ আসে কিনা সে বিষয়ে আমরা আজও কিছু সঠিক ভাবে জানতে পারিনি। তবে গর্ভবতী নারীদের এক্লামসিয়া (Eclampsia) রোগে যে রক্তচাপাধিক্য হয়ে থাকে সে বিষয়ে সঠিক কিছু জানা না থাকলেও অনেকে মনে করেন লিপিড গঠনে ত্রুটির জন্য প্রষ্টাগ্ল্যানডিনের সৃষ্টি ঠিকমত হ'তে পারে না[১], যার জন্য রক্ত-চাপাধিক্য হয়ে থাকে, কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রষ্টাগ্ল্যানডিন অ্যানজিওটেনসিন —II কে অকেজো করে দেয় যার ফলে রক্তবাহ সংকোচিত হ'তে পারে না এবং বেশি রক্তচাপ হ'তে পারে না। এই কারণেই কেউ কেউ মনে করেন বিপাকীয় ত্রুটি থেকে রক্তচাপাধিক্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

১। Dr. D. C. Cutta, Text Book of obstrics, New Central Book Agency, First Edition, Calcutta.

বিপাকীয় ক্রিয়া স্বাভাবিক রাখতে কি করতে হবে :

আহারে সংযম ও নিত্য **নিয়মিত ব্যায়াম,** বিপাকীয় ক্রিয়ার সাহায্য করে এবং দূষিত বিপাকীয় বস্তু সৃষ্টিতে বিঘ্ন ঘটিয়ে স্বাভাবিকতার পরিবেশ বজায় রাখতে পারে। **অতি ভোজন** অবশ্য বর্জনীয়। **সুষম খাদ্য** গ্রহণ প্রয়োজনীয়। **ব্যায়াম বিপাকীয় দূষণ ধৌত করার জন্য একটি বলিষ্ঠ প্রক্রিয়া**। এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

HEIGHT (CENTIMETERS), WEIGHT (KILOGRAMS) FOR INDIAN MALES

HEIGHT	AGE IN YEARS						
	20	25	30	35	40	45	50
CM	KG	KG	KG	KG	KG	KG	KG
148	42·7	44·2	46·2	47·6	48·8	50·0	50·9
150	43·6	44·9	46·9	48·5	49·7	50·8	51·5
153	45·4	47·0	49·0	50·4	51·7	52·3	53·5
155	46·3	48·1	49·9	51·5	52·7	53·5	54·2
158	48·6	50·0	52·0	53·5	54·5	55·7	56·3
160	49·7	51·1	53·1	54·7	55·6	56·7	57·4
163	51·1	52·7	54·9	56·3	57·6	58·5	59·4
165	53·1	54·7	56·9	58·5	59·7	60·6	62·0
168	54·0	56·3	58·1	60·1	61·5	62·4	63·7
170	56·5	57·9	60·3	62·2	63·7	64·7	65·8
173	58·1	60·1	62·2	64·0	65·8	67·0	68·3
175	60·1	62·2	64·2	66·0	68·1	69·7	71·0
178	61·9	64·0	66·3	68·5	70·6	71·9	72·4
180	64·0	66·2	68·5	71·0	73·3	74·4	75·1
183	66·0	68·5	71·0	73·3	75·6	77·1	77·8

With kind permission from Dr. J. J. Cursetji of Oriental Life Insurance Co., and Oxford University Press, Delhi.

HEIGHT (CENTIMETERS). WEIGHT (KILOGRAMS) FOR INDIANFEMALES

HEIGHT	AGE IN YEARS						
	20	25	30	35	40	45	50
CM	KG	KG	KG	KG	KG	KG	K
148	38·6	41·0	42·6	44·0	45·1	46·3	47·1
150	40·3	41·6	43·5	44·8	46·0	47·0	47·7
153	41·9	42·8	45·3	46·6	47·9	48·4	49·5
155	42·8	43·5	46·2	47·7	48·8	49·5	50·1
158	44·9	46·3	48·1	49·5	50·4	51·6	52·1
160	46·0	47·3	49·1	50·6	51·5	52·4	53·0
163	47·3	48·8	50·8	52·1	52·2	54·1	54·9
165	49·1	50·6	52·6	54·1	55·3	56·0	57·3
168	50·0	52·1	53·8	55·6	56·8	57·7	59·0

With kind permission from Dr. J. J. Cursetji of Oriental Life Insurance Co., and Oxford University Press, Delhi.

খাদ্য ও ওজন :

যাদের ওজন বেশি, হৃদরোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা হিসাবে তাদের ওজন কমিয়ে স্বাভাবিকতায় আনতে হবে। এই সঙ্গে বয়স ও উচ্চতা অনুযায়ী একটি চার্ট দেওয়া হ'ল।

ঐ চার্ট অনুযায়ী আপনার ওজন কত হওয়া উচিত জেনে নিন এবং মোট ক্যালরি আপনি খাদ্যের মাধ্যমে নিত্য যা গ্রহণ করেন তা একটু একটু ক'রে নিত্য কমিয়ে আপনার ওজনকে স্বাভাবিকতায় নিয়ে আসুন। নিম্নে কোন্ খাদ্যে কত ক্যালরি পাওয়া যায় এবং কার কত ক্যালরি দরকার তা দেওয়া হ'ল :

কোন্ খাদ্যে কিরকম ক্যালরি পাওয়া যায় :

১ গ্রাম প্রোটিন খাদ্য—৪·১ ক্যালরি
১ „ কারবোহাইড্রেট—৪·১ „
১ „ চর্বি —৯·৩ „

সুস্থ অবস্থায় কার কত ক্যালরি প্রয়োজন :

পুরুষ
- যারা বসেই থাকেন বা বসে বসে কাজ করে ২৪০০ ক্যালরি (Sedentary worker)
- যারা হাল্‌কা কাজ করেন (Moderate worker) ২৮০০ ক্যালরি
- যারা ভারি কাজ করেন (Heavy worker) ৩৯০০ ক্যালরি

নারী
- যারা বসেই থাকেন বা বসে বসে কাজ করেন (Sedentary worker)—১৯০০ ক্যালরি
- যারা হাল্‌কা কাজ করেন (Moderate worker)—২২০০ ক্যালরি
- যারা ভারি কাজ করেন (Heavy worker)—৩০০০ ক্যালরি

খাদ্য ও রক্তচাপাধিক্য ঃ

ভারতের জনগোষ্ঠী যেমন বৈচিত্রময় তাদের খাদ্য গ্রহণের অভ্যাসও তেমনি বৈচিত্রময়। এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বেশিরভাগই নিরামিষাশী, এবং আমিষ ভোজীর সংখ্যাও প্রচুর এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যেই খাদ্যাভ্যাসও বৈচিত্রময়। ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি উন্নত দেশের বেশির ভাগ লোকই আমিষ ভোজী এবং তুলনা মূলক ভাবে ঐ সব দেশের লোকেদের মধ্যে কার্ডিয়াভাসকুলার রোগও বেশি ঘটিতে দেখা যায়। আমিষ ভোজী ও নিরামিষ ভোজী জনগোষ্ঠীর মধ্যে রক্তচাপাধিক্যের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা' বা সুষ্ঠু বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করে বৃহৎ আকারে কোন গবেষণা হয়েছে কিনা, আমার ধারণা নাই। প্রচুর গবেষণার মাধ্যমেই কেবল এই বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

চর্বি জাতীয় খাদ্য ও রক্তচাপাধিক্য ঃ

গবেষণার দ্বারা একটা বিষয় প্রমাণিত হয়েছে যে চর্বি জাতীয় খাদ্য অতি মাত্রায় গ্রহণ করলে এবং শ্রমবিমুখ জীবন যাপন করলে ধমনী দেওয়ালে অ্যাথিরোমেটাস পরিবর্তন হতে দেখা যায় যার ফলে, রক্তচাপ বাড়ে এবং ধমনীর নানান বৈকল্য দেখা যায়। তবে এটাও দেখা গেছে, কোন কোন শ্রেণীর লোকেরা অধিক মাত্রায় চর্বি গ্রহণ করে এবং শ্রমও প্রচুর করে কিন্তু ঐ সব লোকেদের মধ্যে হৃৎপিণ্ড-রক্তবাহের রোগ তেমন হ'তে দেখা যায় না।

জীব-জন্তুদের ক্ষেত্রে গবেষণায় দেখা গেছে, এদের প্রচুর পারিমাণে

কোলেসটেরল খাওয়ালে, রক্তে কোলেসটেরল বাড়ে এবং ধমনী রোগেরও সৃষ্টি হয়।

মানুষের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে চর্বি জাতীয় বস্তু বেশি মাত্রায় গ্রহণ করলে রক্তে কোলেসটেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড ও অন্য রকমের চর্বি জাতীয় বস্তুর বৃদ্ধি পায় এবং রক্তচাপাধিক্য, করনারী, রেনাল ও মস্তিষ্ক ধমনীর অ্যাথিরোমেটাস রোগ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক উপসর্গ ঘটতে দেখা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়।

পূর্ব আফ্রিকায় এক শ্রেণীর উপজাতি বাস করে যাদের **মাসাই উপজাতি** বলে। এই মাসাই উপজাতিদের প্রধান খাদ্য প্রচুর চর্বিযুক্ত মাংস। এই উপজাতির লোকেরা গড়ে নিত্য ৩০০০ ক্যালরির খাদ্য গ্রহণ করে এবং ঐ ৩০০০ ক্যালরির শত করা ৬৬ ভাগ চর্বি জাতীয় খাদ্যের মাধ্যমে তারা গ্রহণ করে এবং এর মধ্যে কোলেসটেরল প্রায় ৫০০-২০০০ মিঃ গ্রাঃ থাকে।[১] এদের মধ্যে করনারী ধমনীর কোন রোগ হয় না বললেই চলে। এর প্রধান কারণ এরা কঠোর পরিশ্রমী।

তুলনা মূলক ভাবে আমেরিকার জনগোষ্ঠী অধিক মাত্রায় কোলেসটেরল ও স্যাচুরেটেড চর্বি (জান্তব চর্বি, মাখন, চিজ ইত্যাদি) গ্রহণ করে। গড়ে এরা যে খাদ্য গ্রহণ করে তার সমগ্র ক্যালরি মুল্যের ৪০% এর অধিক চর্বি জাতীয় খাদ্য বস্তু থেকে গ্রহণ করে এবং এদের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ব্যাধির আক্রমণ অধিক মাত্রায় দেখা যায়।

অন্য দিকে শুধুই আনস্যাচুরেটেড চর্বি (সরিষার তৈল, বাদাম, তিল, নারিকেল তৈল ইত্যাদি) গ্রহণ করাও ঠিক নয়। জাপানীরা ও সুইডেনের লোকেরা অতিমাত্রায় আনস্যাচুরেটেড চর্বি গ্রহণ করে থাকে যার ফলে, এই সব দেশের লোকেদের মধ্যে পাকস্থলীর ক্যানসার বেশি ঘটতে দেখা যায়। জন্তুদের ক্ষেত্রে আনস্যাচুরেটেড চর্বি বেশি খাওয়ালে যকৃতের সিরোসিস রোগ ঘটতে দেখা যায়।

১। Biss. K. et at. 1971, Some unique biologic characteristics of Masai of East Africa, New Engl. J. Med. 284, 694 : Referred by F. P. Antia, clinical Dietetics and Nutrition, Oxford University press, Delhi, Second EDT. Third reprint, 1984.

খাদ্য হিসাবে কোলেসটেরল ও তার বিচার-বিশ্লেষণঃ চর্বি জাতীয় খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, এখন কোলেস্টেরল সম্বন্ধে দু-একটি কথা পাঠকদের জানানোর বাসনা ত্যাগ করতে পারছি না। কিছু শিক্ষিত রোগীদের কাছ থেকে 'অ্যানিম্যাল ফ্যাট-কোলেস্টেরল আতঙ্কের' যে বিচার বিশ্লেষণ প্রায়ই শুনে থাকি তা-থেকে বোঝা যায় তাঁরা মনে করেন 'কোলেস্টেরল' যেন হৃদরোগ সৃষ্টির জন্য যত নষ্টের গোড়া এবং খাদ্য থেকে এই বস্তুটিকে সম্পূর্ণ বাদ দিলেই যেন হৃদরোগের আক্রমণ থেকে বাঁচা যায়। এর কারণ, আমার মনে হয়, 'কোলেস্টেরল-হৃদরোগ' এই প্রচার এমনিই তুঙ্গে উঠে রয়েছে যে কোলেস্টেরলকে কেমন করে খাদ্য থেকে বাদ দেওয়া যায় তার জন্য ভাবনার যেন শেষ নাই। অবশ্য এটা সত্য যে কোলেস্টেরল অধিক মাত্রায় গ্রহণে কর্ম বিমুখ ব্যক্তি বিশেষের হৃদরোগ হ'তে পারে কিন্তু খাদ্য থেকে কোলেস্টেরল একেবারে বাদ দেওয়া উচিৎ নয়। খাদ্যর মাধ্যমে কোলেস্টেরল না খেলে আমাদের শরীর (লিভার, ক্ষুদ্র অন্ত্র) বেশি মাত্রায় কোলেস্টেরল প্রস্তুত করবে (Endogenous cholesterol)।

সাধারণের অবগতির জন্য জানাতে চাই **জীবন ধারণের জন্য কোলেস্টেরল একান্ত প্রয়োজন, কোলেস্টেরল ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। স্টেরয়ড হরমোন ও বাইল সল্ট প্রস্তুত করার জন্য কোলেস্টেরল একটি অত্যাবশ্যকীয় কাঁচামাল**। কোলেস্টেরল আমরা খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ ক'রে থাকি (Exogenous) আবার আমাদের যকৃৎ ও ক্ষুদ্র অন্ত্র, বিশেষ করে ইলিয়াম, অ্যাসিটেট (Acetate) থেকে কোলেস্টেরল প্রস্তুত ক'রে থাকে (Endogenous)।

৫০ থেকে ৫৯ বৎসর বয়সের একজন ইউরোপীয়ের ক্ষেত্রে রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক পরিমান প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে ১৬০ থেকে ৩৩০ মিলিগ্রাম থাকে এবং আমাদের ক্ষেত্রে ১৫০ থেকে ২৫০ মিলিগ্রাম থাকে।

ট্রাইগ্লিসারাইডের রক্তে স্বাভাবিক স্তর, প্রতি ১০০ মিলি লিটার রক্তে ১৪০—১৯০ মিলিগ্রাম এবং কোলেস্টেরলের মত দুই ভাবে (Exogenous and Endogenous) আমাদের রক্তে এসে থাকে।

যকৃৎ কারবোহাইড্রেট থেকে এবং রক্তে চলমান ফ্যাটি এসিড থেকে এনডোজেনাস ট্রাইগ্লিসারইড তৈয়ার করে। ক্ষুদ্র অন্ত্রও অনুরূপভাবে ট্রাইগ্লিসারাইড প্রস্তুত করে। অতএব বেশি কারবোহাইড্রেট খাওয়ারও বিপদ আছে।

আমাদের প্লাজমায় স্বাভাবিক কত পরিমান লিপিড থাকে তা জানার আগ্রহ পূরণের জন্য নিচে একটি তালিকা দেওয়া হইল :

প্লাজমায় বিভিন্ন লিপিডের গড় পরিমাণ প্রতি ১০০ ML-এ[১]

(খাওয়ার পর ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যে)

সমগ্র লিপিড (**Total Lipid**)	৫০০ মিঃ গ্রাঃ (গড়)
মুক্ত কোলেসটেরল (**Free cholesterol**)	৪০-৬০ ,, ,,
কোলেসটেরল এসটারস (**Cholesterol Esters**)	১১০-১৯০ ,, ,,
ট্রাইগ্লিসারাইড (নিউট্রাল চর্বি)	১৪০-২২৫ ,, ,,
ফসফোলিপিডস (**Phopholipids**)	১৬০-২০০ ,, ,,

কোন্ খাদ্যে ক পরিমাণ কেলেসটেরল থাকে :

আমরা সাধারণ খাদ্য যা গ্রহণ করি তাদের মাধ্যমে আমরা কতটা কোলেসটেরল ও চর্বি (**Neutral fat**) গ্রহণ করি তা অনুমান করার জন্য নিম্নে একটি তালিকা সংযোজন করা হইল :

খাদ্যের তালিকা ও প্রতি ১০০ গ্রামে কত কোলেসটেরল ও চর্বি থাকে :

খাদ্যের নাম	**কোলেসটেরলের পরিমাণ** (মিলিগ্রামে প্রতি ১০০ গ্রামে)	**চর্বির পরিমাণ** (মিলিগ্রামে প্রতি ১০০ গ্রামে)
মাথার ঘিলু (**Brain**)	২০০০	
টাটকা ডিমের কুসুম (**Yellow of fresh egg**)	১৫০০	
ডিমে (**Egg**)	৫০০	১৩৬০
মেটুলি (**Liver**)	৩০০	৩০০০
মাখন (**Butter**)	২৫০	৮১০০
দুধের সর বা ননীতে (**cream**)	১২০	
ভেড়া বা ছাগলের চর্বি (**Goats or sheeps fat**)	৯৫	
ভেড়া ও ছাগলের মাংসে (**Goats or sheeps meet**)	৭০	১৩৫০০
মুরগীর মাংসে (**Hen's meat**)	৬০	৬০০
খাঁটী দুধে (**pure milk**)	১১	৪১০০

১। **F. P. Antia, clinical Dietetics and Nutrition, Oxford university Press 'Delhi, second Edition, Third reprint, 1984.**

হৃদরোগকে প্রতিরোধ করতে আপনি কতটা চর্বি খেতে পারেন সে বিষয়ে আলোচনা করবার আগে খাদ্যের মাধ্যমে দু-রকমের চর্বি, (১) স্যাচুরেটেড চর্বি (Saturated fat) (২) আনস্যাচুরেটেড চর্বি (unsaturrted fat), আমরা গ্রহণ করে থাকি তাদের চিহ্নিত করণের জন্য সকলকে জ্ঞাত করছি :

(১) **স্যাচুরেটেড চর্বি** (Saturated Fat) : কোন খাদ্যগুলিতে স্যাচুরেটেড চর্বি থাকে নিম্নে দেওয়া হ'ল :

(i) অ্যানিম্যাল সূত্র থেকে পাওয়া স্যাচুরেটেড চর্বি :

(a) ঘি, মাখন, সর।

(b) মাংসের চর্বি।

(c) ডিমের কুসুম।

(ii) উদ্ভিদ সূত্র থেকে পাওয়া স্যাচুরেটেড চর্বি :

(a) নারিকেল তেল।

(b) পাম তেল।

(c) হাইড্রোজেনেড উদ্ভিদ তেল যথা ভেজিটেবল ঘি—ডালডা, কুসুম।

(d) মারজারিন (বাদাম তেল অথবা তুলা বীজের তেলকে হাইড্রো-জেনেসন করে পাওয়া যায়)।

(২) **আনস্যাচুরেটেড চর্বি** (Unsaturated Fat)

(i) অ্যানিম্যাল সূত্র থেকে পাওয়া

(a) হ্যালিবাট লিভারের তেল।

(b) কড লিভার তেল।

(c) সার্ক লিভার তেল।

(d) তিমি মাছের তেল।

(ii) উদ্ভিদ সূত্র থেকে পাওয়া আনস্যাচুরেটেড চর্বি

(a) সরষের তেল।

(b) বাদাম তেল।

(c) তুলা বীজের তেল।

(d) অলিভ তেল (Olive oil)।

(e) সূর্য্যমুখীর তেল।

(f) তিলের তেল।
(g) সয়াবিনের তেল।
(h) জলপাইয়ের তেল।

কোন্ কোন্ তেলের রক্তে কোলেস্টেরলের উপর কোন প্রভাব নাই :

(১) বাদাম তেল।
(২) সরিষার তেল।
(৩) জলপাইয়ের তেল।

কোন্ কোন্ তেল রক্তে কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে :

(১) সয়াবিনের তেল।
(২) সূর্য্যমুখীর তেল।
(৩) তিলের তেল।
(৪) তুলাবীজের তেল।

উপরোক্ত তেলগুলি কেমন করে কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে :

উপরে উল্লিখিত তেলগুলির মধ্যে সিটোস্টেরল (**Sitosterol**) নামে একটি ভেজিটেবল স্টেরল থাকে (কোলেস্টেরল একটি অ্যানিম্যাল স্টেরল)। যখন উপরোক্ত তেল আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি সিটোস্টেরল পুষ্টি নালী থেকে আত্মস্থ (**Abosorption**) হয় না কারণ এই ভেজিটেবল স্টেরলটি খাদ্যের কোলেস্টেরলের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে একটি কমপাউণ্ডে পরিণত হয় যেটি আত্মস্থ হ'তে পারে না যার ফলে রক্তের কোলেস্টেরল ধীরে ধীরে কমতে থাকে। উপরোক্ত কারণে সিটোস্টেরল ৫-১০ গ্রাম দু-তিন ভাগে ভাগ ক'রে নিত্য, বহুদিন ধরে, ব্যবহার করার উপদেশ অনেকে দিয়ে থাকেন।

রক্ত চাপাধিক্যে ও হৃদরোগে কতটা চর্বি খেতে পারেন :

রক্তচাপাধিক্যে বা হৃদরোগে ভুগছেন এমন লোক তাঁর সমগ্র খাদ্যের মোট ক্যালরি মূল্যের ২৮ ভাগের কম ক্যালরির চর্বি জাতীয় খাদ্য দ্বারা পূরণ করবেন এবং এই চর্বি জাতীয় খাদ্যের মধ্যে স্যাচুরেটেড ও আনস্যাচুরেটেড উভয় প্রকার চর্বিই থাকতে হবে। সাধারণতঃ ১০ ভাগ স্যাচুরেটেড এবং ১০ ভাগ

আনস্যাচুরেটেড চর্বি[১] গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কোলেসটেরল নিত্য ৩০০ মিলিগ্রামের কম খেতে হবে। যেহেতু জন্তুর প্রোটিন থেকে বেশি পরিমাণ কোলেসটেরল পাওয়া যায় সেই হেতু জন্তুর প্রোটিন কম খেতে হবে এবং সেই কম অংশ ভাল ভেজিটেবল প্রোটিন দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে।

সোডিয়াম ও রক্তচাপাধিক্য :

রক্তচাপাধিক্য হ'লেই সব চিকিৎসকই রোগীকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন যে নুন কম খাবেন। এক জন সাধারণ লোকও তাঁর পরিচিত কোন বন্ধু রক্তে-চাপাধিক্যে ভুগছেন জানলে উপদেশ দিয়ে থাকেন—নুন কম খাবেন। কেন সকলে নুন কম খেতে বলেন সে বিষয়ে রোগীর কিছু জানার দরকার আছে, কারণ না জানলে বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে রোগীর সহযোগিতা পাওয়া যাবে না।

কিড্‌নী সুস্থ থাকলে বেশি নুন খেলেও ভয়ের কোন কারণ নাই কারণ সুস্থ কিড্‌নী প্রস্রাবের মাধ্যমে বেশি নুনকে নিষ্কাশন করে দেয়। যারা রক্তচাপাধিক্যে ভুগছেন তাঁদের কিড্‌নী অনেক সময় ঠিক থাকে না। বেশি নুন খেলে রক্তচাপ বাড়ে এবং টিসুতেও নুনের পরিমান বেড়ে যায়। এবং এই জন্য টিসুতে জলও জমে যায়। টিসুতে বেশি সোডিয়াম থাকার জন্য কোষের বাহিরে অভিস্রাবণ (Osmosis) শক্তি বেড়ে যায়, ফলে কোষের ভিতরের জলীয় অংশ কোষের বাহিরে চলে আসে যার জন্য কোষগুলি শুষ্কতা দোষে (Dehydration) দূষণীয় হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না। হাত, পা, মুখ ফোলা ফোলা দেখায়। রক্তে ইউরিয়া বেড়ে যায় এবং আরও অনেক গুরুতর প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা যায়।

উপরিউক্ত কারণে রক্তচাপাধিক্যে যারা ভুগছেন তাদের কম নুন খেতে বলা হয় এবং এমন খাদ্য খেতে বলা হয় যাতে সোডিয়ামের পরিমাণ কম থাকে। নিম্নে কোন্ কোন্ খাদ্যে সোডিয়াম বেশি থাকে এবং কোন্ খাদ্য কম থাকে তার একটি তালিকা দেওয়া হইল :

১। Americal Heart Association, Referred by Poleman and Capra, Nutrition, Essentials and Diet Therapy, Fifth Edition, 1984. W. B. Saunders Company, Philadelphia, London.

খাদ্য তালিকা যাতে সোডিয়াম কম কিম্বা বেশি থাকে

খাদ্য যাতে সোডিয়াম কম থাকে	খাদ্য যাতে সোডিয়াম বেশি থাকে
দানা জাতীয় খাদ্য : চাল, গম, বজরা, যোয়ার, মেজ। নুন-না-দেওয়া চাপাটি ও পাঁউরুটি।	**শুকনো খাদ্য :** নুন-দেওয়া বিস্কুট, শুকনো ফল, পেষ্ট্রিজ।
চর্বি জাতীয় খাদ্য : তেল, মাখন, ঘি, দুধের সর ইত্যাদি।	**আমিষ খাদ্য :** সমুদ্রের মাছ, মাছ, মুরগী, পাঁটা, খাসি ও ভেড়ার মাংস, ডিম।
ফল জাতীয় খাদ্য : আঙ্গুর, বেদানা, কমলালেবু, আপেল, শসা, পাতিলেবু ইত্যাদি।	**দুগ্ধজাত খাদ্য :** নুন-দেওয়া মাখন, দুধ, চিজ।
নাট জাতীয় খাদ্য : নুন-না-দেওয়া চিনেবাদাম, কাজু-বাদাম, কাটবাদাম ইত্যাদি।	**নাটস :** যে কোন নুন দেওয়া নাটস।
চিনি জাতীয় খাদ্য : মধু, নুন-না-দেওয়া জেলি, জ্যাম।	
সব্জি : বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, আলু, মটরশুঁটি, বিট, লেটুস, টম্যাটো, পেঁয়াজ।	
জল : ডিসটিল্ড জল (Distilled water)।	**জল :** সফট জল (Soft water)।

কে(ম)পনারের ভাত পথ্য (Kempner's Rice Diet) **:**

রক্তচাপাধিক্য যখন খুবই উর্দ্ধমুখী বা রোগীর হার্ট ফেলিওর অবস্থা চলছে, কে(ম)পনার (Kempner), **'ভাত-ফল-চিনি'** সমন্বয়ে এক পথ্যের ব্যবস্থাপত্র সুপারিশ করেছেন এবং গবেষণার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে রক্তচাপাধিক্যের ক্ষেত্রে এটি একটি অত্যন্ত কার্যকরী ব্যবস্থা। তিনি যে ব্যবস্থা-পত্র দিয়েছেন সেটি

একটি **কম সোডিয়াম-কম প্রোটিন ও কম চর্বি খাদ্যের নমুনা** যার ক্যালরি মূল্য ২০০০ ক্যালরিজ। নিম্নে খাদ্যটির তালিকা দেওয়া হইল :

কেম্পনারের 'ভাত-ফল-চিনির' পথ্য[১]

২৫০-৩৫০ গ্রাম চালের ভাত		প্রত্যহ
চিনি	১০০-৫০০ গ্রাম	
ফলের রস	৭০০-১০০০ মিলিলিটার	
জল	খাওয়াবন্ধ—পরিবর্তে ফলের রস	
কলা	একটি	
ভিটামিন-এ (Vitamin-A)	৫০০০ ইউনিট	
ভিটামিন-ডি (Vitamin-D)	১০০০ "	
থিয়ামিন ক্লোরইড (Thiamine chloride)	৫ মিলিগ্রাম	
রিবোফ্লেভিন (Riboflavine)	৫ "	
নিয়াসিনামাইড (Niacinamide)	২৫ "	
ক্যালসিয়াম প্যানটোথিনেট (Cal. pantothenate)	২ মি.গ্রা.	

ঐ খাদ্য ২০০০ ক্যালরির শক্তি দিয়ে থাকে এবং কয়েকদিন ব্যবহারে খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায়। ঐ খাদ্যে চর্বি ৫ গ্রা., ২০ গ্রা. প্রোটিন, ২০০ মিলিগ্রাম ক্লোরাইড ও ১৫০ মিলিগ্রাম সোডিয়াম থাকে।

ধুমপান :

ধুমপান করতে কেন বারণ করা হয় : নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য ধুমপান করা উচিত নয় :

(১) গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে, যারা করনারী ধমনী রোগে ভুগছেন, ধুমপান[২] তাদের মায়োকার্ডিয়ামে অক্সিজেন গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, ফলে অ্যানজাইনা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(২) যাঁরা অতিমাত্রায় ধুমপান করেন তাঁরা, যাঁরা ধুমপান করেন না তাদের

১। Kempner, W. (1948), Treatment of Hypertensive vascular disease with rice diet, Amer. J. Med., 4, 545. Referred by F. P. Antia, Clinical Dietetics and Nutrition, Second Edt. Oxford University Press, Delhi, Third impression, 1984,

২। SELTZER, C.C. (1970) Effects of cigaratte smoking on coronary heart disease. Where do we stand now ? Arch. Environm, Hlth, 20, 418.

থেকে, তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যায় অ্যাথিরোমেটাস ও মায়োকার্ডিয়ামের ইনফার্কসন রোগে আক্রান্ত হন।

(৩) অতিমাত্রায় ধুমপায়ীদের রক্তে বেটা ও প্রি-বেটা (**Beta and Pre-beta**) লাইপোপ্রোটিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

(৪) মহিলা ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রে, সিরাম কোলেসটেরল ও ফসফোলিপিড পুরুষদের থেকে বেশি থাকতে দেখা যায়।

(৫) গবেষণায় জানা গেছে, অ্যাথিরোসক্লেরোটিক হৃদরোগ অধুমপায়ীদের থেকে ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রে প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যায় ঘটতে দেখা যায় এবং ধুমপায়ী রোগী যাঁরা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কসনে আক্রান্ত হন এবং অধুমপায়ী যাঁরা ঐ একই রোগে আক্রান্ত হন, তুলনামূলকভাবে ধুমপায়ীদের মৃত্যু সংখ্যা প্রায় আড়াই-গুণ বেশি হ'তে দেখা যায়[১]।

(৬) ধুমপানে যাঁরা অনুরক্ত তাঁদের রক্তে অনুচক্রিকাগুলির আসঞ্জন (**Adhesion**) প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে ফলে থ্রমবোসিস ও এম্বলিজম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

(৭) অল্প বয়সীদের ক্ষেত্রে ধুমপান আরও ক্ষতিকারক।

(৮) হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীরা যাঁরা ধুমপানে অভ্যস্ত, তাঁরা যদি ধুমপান ছেড়ে দেন, হৃৎপিণ্ডের উপর ভবিষ্যতে আরও বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বহুলাংশে কমে যায়।

ব্যায়াম (Exercise) **:**

যারা শুধুই বসে বসে কাজ করেন তাদের ক্ষেত্রে হৃদরোগ বেশি হ'য়ে থাকে। নিয়মিত ব্যায়াম করলে হৃৎপিণ্ডের করনারী ধমনীর ধামনিক জালকগুলি বিস্তৃতি লাভ করে এবং নিজেদের মধ্যে ও অন্য সূত্র থেকে আসা ধামনিক জালকের সহিত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি লাভ করে[২] যার ফলে হৃৎপিণ্ড অধিকতর অক্সিজেন ও পুষ্টি লাভে সমর্থ হয় এবং স্বাভাবিক প্রতিরোধ শক্তি বেড়ে যায়।

১। **DOLL, R., and HILL, A. B. (1964) Mortality in relation to smoking ten years observations of British doctors, Brit. Med, J, 1, 1399, 1460. Both referred by ANTIA, F. P., Clinical Dietetics and Nutrition, 2nd, Ed., Third reprint 1984, Oxford University Press, Delhi.**

২। **F. P. Antia, Clinical Dietetics and Nutrition, Oxford University Press, M/S R. Dayal, New Delhi-2.**

হৃদরোগ থেকে আরোগ্যলাভ করার পর নিয়মিত, পর্য্যায়ক্রমে ব্যায়াম, হৃৎপিণ্ডের কার্য্যকারিতার উন্নতিসাধন ক'রে থাকে। ব্যায়াম যথা, অল্প অল্প ক'রে ধীরে ধীরে ক্রমবর্দ্ধমান চলাফেরা, যন্ত্র ছাড়া হাত-পা সঞ্চালন, গলফ খেলা ইত্যাদি হৃদরোগ আক্রমণের পর সুস্থ অবস্থায় শারীরিক সুস্থতার উন্নতিসাধন করে। **ব্যায়াম ততটুকু করতে হবে যতটুকু করলে রোগী বা ব্যক্তি হাঁপিয়ে না পড়েন বা ক্লান্তি বোধ না করেন। পরিশেষে পুনরায় জোর দিয়ে বলতে চাচ্ছি যে নিয়ন্ত্রণাধীন নিয়মিত ব্যায়াম করনারী ধমনী রোগ প্রতিরোধে একটি কার্য্যকরী হাতিয়ার।**

মানসিক উদ্বেগ :

যে সমস্ত ব্যক্তিকে পেশার জন্য সর্বদা উদ্বেগপূর্ণ জীবন যাত্রার বশবর্ত্তী হ'তে হয় যথা ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা, উড়োজাহাজ চালক, অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে যুদ্ধে নিযুক্ত সৈনিক, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের হৃদরোগ বেশি হয়ে থাকে। বর্তমান যুগে প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যে কর্মব্যস্ত উদ্বেগপূর্ণ জীবন যাপন করতে মানুষকে বাধ্য করছে সেই মানসিক উদ্বেগ হৃদরোগের আক্রমনকে বৃদ্ধির পথে নিয়ে চলেছে—এই সিদ্ধান্তই অনেকে করে থাকেন।

হৃদরোগের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হলে মানসিক উদ্বেগ কমাতেই হবে, মেজাজ ঠিক রাখতে হবে, ঝগড়া ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে চলতে হবে। অনুশীলন দ্বারা চিত্তসংযম অভ্যাস করতে হবে।

পানীয় জল :

সফট জল (soft water), যে-জলের পি এইচ মূল্য কম এবং যার মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনিসিয়াম কম থাকে, যারা সেই জল ব্যবহার করেন তাদের মধ্যে ইনফার্কসন আক্রমণ হওয়ার পর বিশৃঙ্খল হৃৎপিণ্ড গতি (Cardiac Arrthythonias) বেশি ঘটতে দেখা যায়। অপর দিকে যে সব ব্যক্তি **হার্ড জল** (Hard water) পান করেন, যে জলে ক্যালসিয়াম অধিক মাত্রায় থাকে, তাদের মধ্যে হৃদরোগের আক্রমণ হতে মৃত্যু সংখ্যা কম ঘটতে দেখা যায়।

১। Crawford, M. D., Gardner M. S. and Morris, J. N. (1968), Mortality and hardness of local water-Supplies, Lancet, i, 827. Referred by : F. P. Antira, Clinical Dietetics and Nutrition Oxford University press, Delhi, 2nd edition Third Repriting 1984, P. 53০.

সমস্ত সভ্য সমাজে সফট জলই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃৎ হয়ে আসছে এবং এই ব্যবস্থা পাল্টানো প্রায় অসম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু জীবাণুমুক্ত জল গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

পরিবেশ দূষণ ও রক্তচাপাধিক্য :

এটা দেখা গেছে যে প্রতিদিন আমরা ২২০০ বার শ্বাস গ্রহণ করি এবং এই শ্বাসের মাধ্যমে প্রত্যহ আমরা ১৬ কেজি বায়ু গ্রহণ করে থাকি।[১] শহরে নানা রকমের কলকারখানা, নানাবিধ যন্ত্রযান, বায়ুকে সর্বদা দূষিত করে চলেছে, আর শহরবাসীরা সেই দূষিত বায়ুই সর্বদা গ্রহণ করে চলে। এই সমস্ত শহরে বায়ুর সঙ্গে মিশে থাকে ধোঁয়া, ধুলা, কার্বন মনক্সাইড, কার্বনডায়াক্সাইড, সালফার, ক্যাডমিয়াম, সিলিকন প্রভৃতি দূষণীয় বস্তু। ঐ দূষণীয় বস্তুগুলি বা নির্দিষ্ট কোন বস্তু কার্ডিওভ্যাসকুলার সিস্টেমের উপর কোন বৈকল্যের সৃষ্টি করে কিনা তা নির্দিষ্টভাবে প্রমানিত না হ'লেও ক্যাডমিয়াম ও সালফার দূষিত বায়ুকে, পরিসাংখ্যিক দৃষ্টিকোন থেকে, হৃৎপিণ্ড বৈকল্যের কারণ হিসাবে কেউ কেউ চিহ্নিত করেন। এটুকু আমরা জানি শহরের লোকেদের থেকে, যারা সর্বদাই ঐ দূষিত বায়ু সেবন করছেন, গ্রামের লোকেরা যারা বহুলাংশে নির্মল বায়ু সেবন করেন, তাদের কার্ডিওভ্যাসকুলার রোগ কমই ঘটে থাকে।

পরিবেশ দূষণ এড়াতে কি করতে হবে :

বায়ু দূষণ নিবারণে সরকার ও জনসাধারণ যুক্ত প্রচেষ্টায় কলকারখানা, যন্ত্রযান প্রভৃতি বায়ু দূষণের উৎসগুলির উপর যথা বিহিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আরোপ ক'রে বায়ুকে নির্মল রাখতে সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। লোক শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সম্ভাব্য পরিবেশ দূষণকারী কারখানাগুলি ও বাসস্থান, দূর ব্যবধানে তফাৎ রাখা বাঞ্ছনীয়। বৃক্ষ ছেদন বন্ধ রাখতে হবে। বৃক্ষ রোপন করে পরিকল্পনা অনুযায়ী বনসৃজন অবশ্য করণীয়। সামর্থ যাদের অন্তরায় নয় তারা সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন শহর থেকে দূরে নির্মল পরিবেশে কালযাপন করা সু-স্বাস্থের পক্ষে একটি অনুকূল অভ্যাস।

১। Chakravarty-Ghosh-Sahana, Human Physiology, 2nd Edition 1984-85, New Book Stall, Calcutta.

রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগ প্রতিরোধের সারকথা

(১) বংশগতিতে রক্তচাপাধিক্য রোগ থাকলে, শরীরের ওজন ঠিক রাখতে হবে। চর্বিজাতীয় খাদ্য গ্রহণ সীমার মধ্যে রাখতে হবে (মোট ক্যালরির ২৮ ভাগের নিচে)। খাদ্যে সংযম ও নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস করতে হবে এবং ধুমপান করা ও বেশি লবণ গ্রহণ করা কখনই উচিৎ হবে না।

(২) স্যাচুরেটেড ও আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট উভয় প্রকার ফ্যাটই সীমার মধ্যে রেখে গ্রহণ করতে হবে।

(৩) কাঁচা আনাজ, শাকসব্জী, ফল, চাল, ডাল, গম, মাঠাতোলা দুধ, চর্বিহীন মাংস, ছোট ও মাঝারি সাইজের মাছ প্রভৃতি প্রধান বস্তুগুলি খাদ্য তালিকায় রাখতে হবে এবং এইগুলিই প্রধান খাদ্য হ'তে হবে।

(৪) এক সঙ্গে বেশি না খেয়ে চার-পাঁচ দফায় অল্প অল্প ক'রে খাদ্য গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

(৫) প্রয়োজনীয় পরিমানের বেশি খাদ্য গ্রহণ উচিৎ হবে না। বেশি পরিমাণে দানা জাতীয় খাদ্য (Carbohydrate) গ্রহণও বাঞ্ছনীয় নয়।

(৬) ধুমপান করা স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকারক।

(৭) শরীর রক্ষার জন্য ব্যায়াম একান্ত দরকার।

(৮) প্রয়োজন মত লবণ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ সর্বদা বর্জনীয়।

(৯) উদ্বেগপূর্ণ কর্মব্যস্ততা এড়ানো সম্ভব না হ'লে কিছু সময় উদ্বেগহীন হালকা পরিবেশে চিত্তবিনোদনে কাটান উচিৎ।

(১০) মেজাজ, আবেগ প্রভৃতি চিত্ত চাঞ্চল্য, অনুশীলন ক'রে সংযমের অভ্যাস বাঞ্ছনীয়।

ডঃ এস, এন, সাহানা। এম, বি, বি, এস, পি এইচ্, ডি.।
লেখক

- ১৯৫০ সালে এম্, বি, বি, এস।
- ১৯৬৪ সালে অ্যানাটমিতে (মেডিসিন) পি, এইচ্, ডি, ডিগ্রি লাভ।
- ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশনের সদস্য।
- প্রাক্তন সহঃ সভাপতি, ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, হাওড়া শাখা।
- শারীর সংস্থানের উপর ১৯৬২ সালে "সাহানার হিউম্যান অ্যানাটমি" নামিত সর্বপ্রথম পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য সারা ভারতে সমাদৃত।
- প্র্যাকটিক্যাল অ্যানাটমির প্রথম ভাগ প্রকাশিত (১৯৮৫) ও দ্বিতীয় ভাগ যন্ত্রস্থ।
- মডার্ন হিউম্যান ফিজিওলজি গ্রন্থের (১৯৮৪) অন্যতম রচয়িতা।
- "নৈবেদ্য সংকলন" নামিত গল্প, কবিতা, ছড়া, গান (স্বরলিপিসহ), বিজ্ঞানের টুকিটাকি সমেত সাহিত্যের রচয়িতা (১৩৯১)।
- কলিকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে অ্যানাটমি বিভাগের প্রধানরূপে অবসর গ্রহণ।